ফেরাউনের দেশে ইখওয়ান

আহমদ রায়েফ

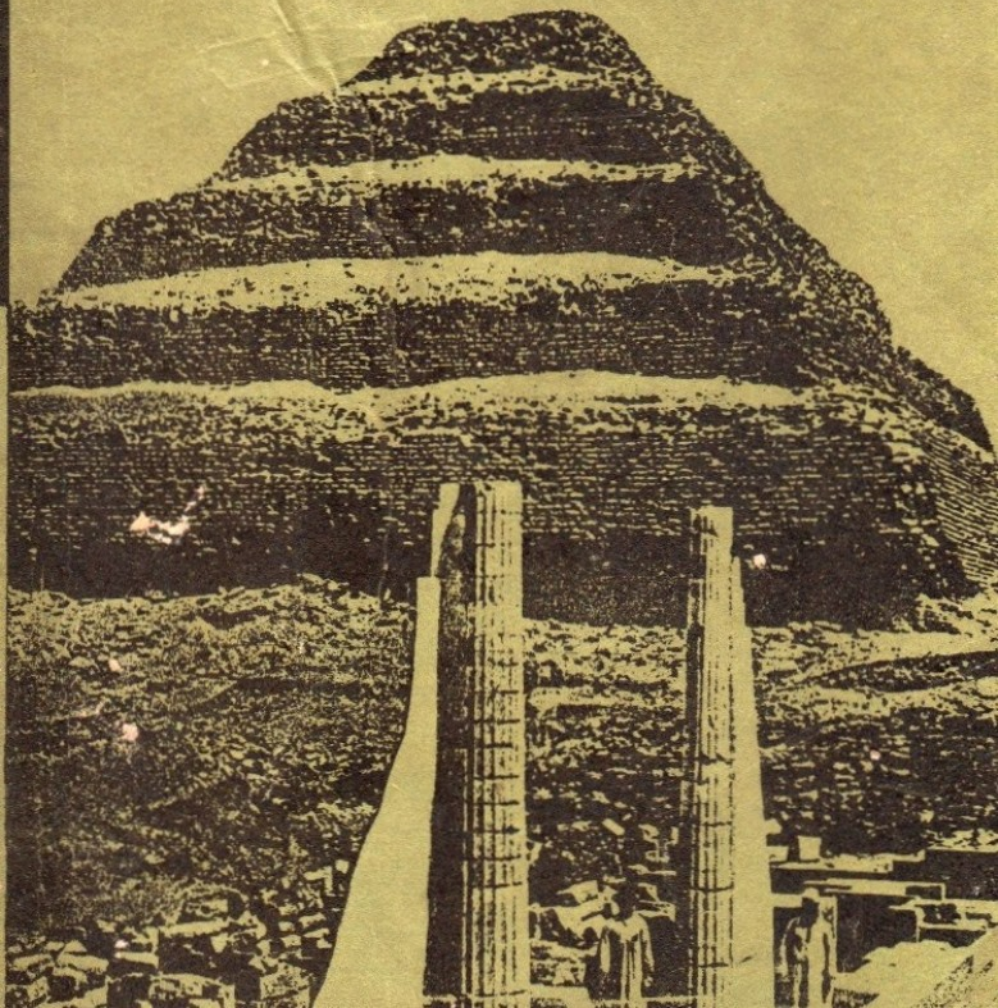

ফিরাউনের দেশে ইখওয়ান

আহম্মদ রায়েফ

ভাষান্তরে গোলাম সোবহান সিদ্দিকী

সিন্দাবাদ প্রকাশনী
SHINDABAD PROKASHONI

সর্বস্বত্ব অনুবাদক কর্তৃক সংরক্ষিত

www.pathagar.com

প্রকাশক

মুঃ আবদুস সালাম রেজা—

সিন্দাবাদ প্রকাশনী—

১৩, পুস্তক বিপনী—

বায়তুল মোকারম ঢাকা—২

প্রথম সংস্করণ ঃ ডিসেম্বর—৮৬

মূল্য ঃ সাদা ঃ ৪০,০০

নিউজ ঃ ২৬,০০

মুদ্রণে ঃ—রাশেদীন প্রিন্টিং ওয়ার্কস্

২৪, শিরিশদাস লেন, বাংলা বাজার ঢাকা—১

www.pathagar.com

উৎসর্গ

বাংলাদেশে ইসলামী আন্দোলনের
শহীদী কাফেলার উদ্দেশ্যে

www.pathagar.com

প্রকাশকের কথা

বইটিতে সুদূর অতিতে মিশরের ফিরাউনি তন্ত্রের শাষকগণ যেমন মিশরে শৈরতন্ত্র, একনায়কতন্ত্র, অত্যচার, জুলুম ও নির্যাতনের ষ্টিম রোলার চালায় ও খোদায়ী দাবী করার কারণে যেমন সারা পৃথিবীতে ফিরাউন হিসাবে পরিচিত ও নিন্দিত, ঠিক তেমনিই সেই ফিরাউনের দেশ মিশরে আধুনিক ফিরাউন কর্নেল জামাল নাসেরও "আনা ইছাতুললিল আরব"। আমরা আরব জাতীর গৌরব। জাতীয়তাবাদী আন্দোলন থেকে শুরু করে, খোদায়ী দাবীদার ফিরাউনের মূর্তি তৈরী করে তার পদতলে পবিত্র কোরান তৌরাত ও ইঞ্জিল রেখে গোটা মানব জাতীর ধর্মীয় মতামতকে পদদলিত করে, এমনকি তার দেশে জাহেলিয়াত, সমাজতন্ত্র ও খোদাদ্রহিতার যে ছয়লাব বয়েছিল, সে ধ্বংসের হাত থেকে রক্ষাকারী একমাত্র ইসলামী সংগঠন ইখওয়ানুল মুসলেমুনের উপরও জামাল নাসের জুলুম নির্যাতন করে আদি ফিরউনরেও হার মানিয়ে দিয়ে ছিল, তারই একটি সংক্ষিপ্ত বর্ণনা এবইটিতে আলোচনা করা হয়েছে।

বইটি আশাকরি পাঠক সমাজ বিশেষ করে ইসলামী আন্দোলনের সাথে জড়িত, পাঠকবর্গ উপকৃত ও শিক্ষা পেয়ে তাঁরা তাদের ঈমানী জজবাকে উত্তর উত্তর বৃদ্ধি করতে সহায়ক হবে বলে আশাকরি এবং তা যেন আমার আখেরাতের পাথেও হয়।

www.pathagar.com

আলহামদু লিল্লাহ, অনেক তাড়াহুড়া করে "ফিরউনের দেশে ইখওয়ান" প্রকাশিত হল। এত অল্পসময়ের মধ্যে বই প্রকাশ ইতিপূর্বে আর কখন ও করিনি। মূল আরবি বই ছিল অনুবাদকের হাতে। তা অনুবাদ করে কিছু কিছু প্রেসে দেওয়া আর প্রেসে তা কম্পোজ ও ছাপা হচ্ছিল। এ ভাবে সল্প সময়েই বইটা প্রকাশ করা হয়েছে। এর পরও ভুলত্রুটি ও মানগত দুর্বলতা যথা সাধ্য কম করার চেষ্টা করা হয়েছে। তবুও দুএকটি ত্রুটি যে নেই তা বলা মুশকিল। দ্রুত প্রকাশের জন্য মহান আল্লাহর দরবারে শুকরিয়া জানাই। এর জন্য অনুবাদক জনাব গোলাম সোবাহান সিদ্দিকী মুদ্রক জনাব আশরাফ আলী বাইণ্ডার জনাব রহিস উদ্দিন ও বন্ধুবর জনাব মাহবুবল হককে বিশেষ কৃতজ্ঞ।

—প্রকাশক

www.pathagar.com

সূচী পত্র

প্রথম দৃশ্য—১৭
দ্বিতীয় দৃশ্য—২৫
তৃতীয় দৃশ্য—৩৭
চতুর্থ দৃশ্য—৪১
পঞ্চম দৃশ্য—৪৯
ষষ্ঠ দৃশ্য—৬৫
সপ্তম দৃশ্য—৮১
অষ্টম দৃশ্য—৯৪
নবম দৃশ্য— ১১৭
দশম দৃশ্য—১৪৬
একাদশ দৃশ্য—১৬৯
দ্বাদশ দৃশ্য—১৮৬

www.pathagar.com

সাফল্যের শর্ত

তোমরা হতোদ্যম হবেনা, বিষন্ন হবেনা। তোমরাই উপরে থাকবে যদি তোমরা হও মু'মেন। তোমাদের কোন আঘাত লেগে থাকলে তাদেরওলেগেছে অনুরূপ আঘাত। আমরা বিভিন্ন মানব গোষ্ঠীর জন্য ঘুরিয়ে ফিরিয়ে আনি এ দিনগুলো। আল্লাহ দেখতে চান, তোমাদের মধ্যে কারা ঈমান এনেছে। তিনি তোমাদের মধ্যে সাক্ষী করতে চান। আল্লাহতো যালেমকে ভালো বাসেন না। আল্লাহ মু'মেনদেরকে পরিশুদ্ধ করে পৃথক করতে চান আর কাফেদেরকে করতে চান নিশ্চিহ্ন। তোমরা কি ভেবে বসেছে যে, জান্নাতে প্রবেশ করবে (এমনিতেই) অথচ তোমাদের মধ্যে কে ঈমান এনেছে আর ধৈর্য, ধারণ করেছে—তিনি তা পরখ করে নেবেননা?

—সূরা আলে ইমরান

আয়াত ১৩৮—১৪১

www.pathagar.com

আলহামদুলিল্লাহ

অতি অল্প সময়ের মধ্যে 'ফেরাউনের দেশে ইখওয়ান' প্রকাশিত হলো। এজন্য মহান আল্লাহর দরবারে লাখো শুকরিয়া আদায় করছি। নিশ্চয়ে ইখওয়ানুল মুসলেমুনের নেতা-কর্মীদের উপর যে নির্যাতন চালানো হয়েছে, ইতিহাসে তা নযীর বিহীন। দুনিয়ার কোন দেশে ইতিহাসের কোন অধ্যায়ে এমন বর্বর নির্যাতন হয়েছিলো বলে আমাদের জানা নেই। ফেরাউনের মানস সন্তান জামাল নাসেরের অবসান শেষে এক কবে মুখ খোলা শুরু হয়। তার এক কালের সঙ্গীরাও কথা বলে। অনেকে বই লিখে। 'আল মাওতা ইয়াতাকাল্লামুন'—মৃতেরা কথা বলছে, আস সামেতুন ইয়াতাকাল্লামুন—বোবারা কথা বলছে, আইয়াম মিন হায়াতী—কারাগারের রাত দিন নামে প্রকাশিত এসব বই মিশরের জামাল নাসেরের সামরিক জান্তার শাসনামলের কৃষ্ণ অধ্যায়ের আসল চেহারা তুলে ধরে। মিশরের পত্র পত্রিকায় প্রকাশিত হয় অনেক নিবন্ধ। কারণ, সেখানে এখন আর প্রেস সেনসরশীপ নেই, নেই মিলিটারী ইন্টেলিজেন্সের কর্তৃত্ব।

মাসিক আদ দা' ওয়াহ এবং সাপ্তাহিক আল-এ তেসামপত্রিকায় অনেক নিবন্ধ প্রকাশিত হয়। ইখওয়ানের তরুণ কর্মী আহমদ রায়েফ 'আল-বাওয়া বাতুস সাওদা—কালো অধ্যায় নামে যে ধারাবাহিক নিবন্ধ প্রকাশ করেন, তা-ই উর্দু ভাষায় অনুবাদ করেন মুহতারাম খলীল আহমদ হামেদী' রোদাদে এবতেলা' বা নির্যাতনের কাহিনী নামে। এটি প্রথমে প্রকাশিত হয় মাসিক তরজমানুল কুরআনে ধারাবাহিকভাবে। ঠোঙ্গার দোকান থেকে কিনে আনা বিক্ষিপ্ত কয়েক সংখ্যা পড়ার সুযোগ আমার হয়েছিলো অনেক আগেই। তখন থেকে মনে জাগে অনুবাদ করার আগ্রহ। কিন্তু মূল বইয়ের সন্ধান এবং প্রকাশকের অভাবে আমি অনুবাদ কাজে হাত দেইনি। মেসার্স সিদ্দাবাদ প্রকাশনীর স্বত্বাধিকারী রাজা ভাইয়ের আগ্রহ-অনুপ্রেরণায় অনু-

www.pathagar.com

বাদ কাজে হাত দেই মাস খানেক আগে। সরাসরী কপি প্রেসে পাঠাই। কি লিখেছি দেখার সুযোগ হয়নি। প্রুফও পড়তে পারিনি। কাজেই ভ্রান্তি থাকা খুবই স্বাভাবিক। সহৃদয় পাঠক মহল তাদের প্রতিক্রিয়া জানালে আনন্দিত হবো এবং ভুল ত্রুটি নির্দেশ করলে পরবর্তী সংস্করণে তা সংশোধণ করে নেবো ইনশা আল্লাহ।

ইসলামিক ফাউন্ডেশনের জনাব আবুল কালাম আজাদের সহযোগিতায় রোদাদে একতেলা, বইখানা সংগ্রহ করেছিলাম। এজন্য আমি তাঁর কাছে কৃতজ্ঞ। পাঠককে এ কাহিনী পড়তে গিয়ে হয়তো এর বাস্তবতা সম্পর্কে সন্দিহান হতে হবে। আমারতো তাই হয়েছে। মনে হয়েছে এ যেন কোন উপন্যাস। একারনে প্রতিটি অধ্যায়কে দৃশ্য হিসাবে পেশকরেছি। এক একটি অধ্যায়ে এক একটা নূতন দৃশ্যের অবতরণা হয়েছে। এ কাহিনীর কোন নাট্যরূপ দেয়া যায় কিনা, নাট্যামোদী মহল তা ভেবে দেখতে পারেন।

আধুনা সারা মুসলিম জাহান ইসলামী জীবন ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার সংগ্রামে সোচ্চার। বাংলাদেশেও এ আন্দোলন তীব্র থেকে তীব্রতর হচ্ছে দিন দিন। মুসার (আঃ) কথায় ফেরাউনের গায়ে জ্বালা নাধরে পারেনা তাই এদেশের ফেরাউনরা চুপ থাকতে পারেনা। আগুনে না পোড়ালে স্বর্ণ খাঁটি হয় না। ইসলামী জীবন ধারার স্বপ্নাভিসারী কর্মীদেরকেও এপথেই খাঁটি হতে হবে স্বাভাবিক ভাবেই। আমাদের দেশের ইসলামী আন্দোলনের কর্মীরা সামরিক জান্তার পৈশাচিক নির্যাতনের লোম হর্ষক কাহিনী পাঠে উদ্বুদ্ধ-অনুপ্রাণিত হলে শ্রম স্বার্থক মনে করবো।

গোলাম সোবহান সিদ্দিকী
'নিরিবিলি'

১২- ইং ১/৩৮ মিরপুর ঢাকা ২১
২০ শে ডিসেম্বর ১৯৮৬

www.pathagar.com

ইখওয়ানুল মুসলেমুন

প্রথম মহাযুদ্ধের অবসান শেষে দেশে দেশে দেখা দেয় নানা সমস্যা। মাথা চাড়া দিয়ে উঠে নানা মতবাদ আর চিন্তাধারা। সৃষ্টি হয় সামাজীক মূল বোধের অবক্ষয়। দেখা দেয় নৈতিক অধপতন। ঘনিভূত হয় রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক সংকট। মিশরেও হয়েছে তাই। তুর্কী জাতির তথাকথিত পিতা মোস্তফা কামাল আতাতুর্ক (তুর্কী জাতির পিতা?) তুরস্কে খেলাফতের অবসান ঘোষণা করলে মুসলিম জাহানের নানা দেশে এক শ্রেণীর রাজনৈতিক নেতারা ধর্মীয় উদারতার নামে ধর্মহীনতার তলপীবাহক সেজে বসে। পাশ্চাত্যের প্রভুরা এজন্য তাদেরকে মদদযোগায়, সাহায্য সহযোগিতা করে। ফলে শুরু হয় আধুনিকতার নামে ইসলামের বিরুদ্ধে সয়লাব। অন্যান্য মুসলিম দেশের মতো মিশরেও এ সয়লাভ ঢেউ খেলে। বিশ্ব মুসলিম ঐক্যজোট আন্দোলনের পুরোধা সৈয়দ জামালুদ্দীন আফগানীর ভাবশিষ্য এবং মানস সন্তান মুফতী মোহাম্মদ আবদুহু এবং সাইয়্যেদ রশীদ রেজা প্রমুখ মনীষীরা সর্বগ্রাসী এ সয়লাবের বিরুদ্ধে বালির বাঁধ দেয়ার চেষ্টা চালালেও রাজনৈতিক দিক থেকে তাঁরা সংহত এবং অসংবদ্ধ ছিলেননা। ফলে সর্বগাসী এ সয়লাব রোধ করা তাদের পক্ষে সম্ভব হয়নি। তদুপরী রাজনীতিতে তখন চরম সংকট। সরকার আসে, সরকার যায়। সরকারের মিশরের নেই কোন স্থিতিশীলতা। এরা প্রায় সকলেই ছিলো ইংরেজদের হাতেরক্রীড়নক। তাদের ঘাড়ে সওয়ার হয় জাতীয়তাবাদের ভূত। স্কুল কলেজ-বিশ্ব বিদ্যালয় সর্বত্র বিস্তার লাভ করে ধর্মহীনতা তথা খোদা দ্রোহিতা। একটা আরব দেশের রাজধানী থেকে প্রকাশ্যে 'খোদার জানাযা'

www.pathagar.com

বের করা হয় (নাউযু বিল্লাহ)। রাজনীতির অঙ্গনে ইসলামের নাম নেয়া হাস্যস্পদে পরিণত করা। দেশের এহেন পরিস্থিতিতে কয়েকজন তরুণ প্রাণ মদেমুমেন এগিয়ে আসেন। লা'দ্বীনীর সয়লাব রোধ করার উপায় নিয়ে আলাপ আলোচনা শেষে এর বিরুদ্ধে দুর্ভেদ্য প্রাচীর হিসেবে একটা সংগঠন গড়ে তোলার ব্যাপারে তারা একমত হন। সর্ব সম্মতিক্রমে সংগঠনের নাম দেয়া হয় আল-ইখওয়ানুল মুসলেমুন। ১৯২৮ সালের মার্চ মাসে মিশরের ইসমাঈলিয়া শহরে ইখওয়ানুল মুসলেমুনের জন্ম হয়। মাহমুদিয়ার তরুণ স্কুল শিক্ষক শেখ হাসান আল-বান্না নূতন সংগঠনের নেতা-মুর্শেদে-আম নির্বাচিত হন।

প্রতিষ্ঠা লাভের পর ইখওয়ানের দ্রুত বিস্তৃতি ঘটে। দেশের প্রত্যন্ত প্রান্তে গঠিত হয় ইখওয়ানের শাখা। ছাত্র-শিক্ষক-যুবক-বৃদ্ধ আলেম ও ইংরেজী শিখিত—সর্ব শ্রেণীর লোক ইখওয়ানে যোগ দেয় দলে দলে। একটা শক্তিশালী সংগঠন হিসেবে দেশে-বিদেশে পরিচিতি লাভ করে ইখওয়ানুল মুসলেমুন। টাইমস অব লন্ডন পত্রিকার মতে ১৯৪৮ সালে অর্থাৎ প্রতিষ্ঠা লাভের মাত্র ২০ বৎসর সময়ের মধ্যে ইখওয়ানের সদস্য সংখ্যা দাঁড়ায় ন্যূনতম পাঁচ লক্ষ।

ইখওয়ানের দ্রুত অগ্রগতি আর বিস্তৃতি দেখে গায়ে জ্বালা ধরে ইসলামের দুশমনদের। ইখওয়ানের এ অগ্রযাত্রা রোধ করার জন্য অবলম্বন করা নানা কূট কৌশল। শক্তির জোরে ইখওয়ানকে ধরা পৃষ্ঠ থেকে মুছে ফেলার পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়। ১৯৪৮ সালে বাদশাহ ফারুকের শাসনামলে শুরু হয় ইখওয়ানের উপর নির্যাতন। ১৯৩৮ সালের মে মাসে ফিলিস্তিনে ইহুদী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার ঘোষণা দেওয়া হয়। লাখ লাখ ফিলিস্তিনীকে বিতাড়িত করা হয় নিজেদের আবাস ভূমি থেকে। এ অন্যায়ের মুখে ইখওয়ান নীরব দর্শকের ভূমিকা পালন করতে পারেনা। ফিলিস্তিন যুদ্ধে প্রেরণ করে মুজাহিদ বাহিনী। বীর বিক্রমে যুদ্ধ করে ইহুদী এবং তাদের দোসরদের বিরুদ্ধে। এ যুদ্ধের বিবরণ তুলে ধরেছেন ইখওয়ানের অন্যতম নেতা ওস্তাদ কামেল শরীফ তাঁর বিখ্যাত গ্রন্থ ইখওয়ানুল মুসলেমুন ফি হারবে ফিলিস্তিন—ফিলিস্তিন যুদ্ধে ইখওয়ানুল মুসলেমুন-এ। ইখওয়ানের বীর মুজাহিদদের তীব্র আক্রমনের মুখে ইসরাইলের নাপাক অস্তিত্ব মুছে যাওয়ার

www.pathagar.com

উপক্রম হয়। বহী বাহী চিৎকার শুরু করে ইহুদীরা। তাদের এ চিৎকার আর আর্তনাদে সহযোগিতার জন্য এগিয়ে আসে তাদের মদদগার সাম্রাজ্যবাদী শক্তি—বৃটেন-রাশিয়া-আমেরিকা। মিশরের তৎকালীন রাজতন্ত্র ছিলো ইংরেজদের হাতের পুতুল। কেবল বাইরের শক্তি দিয়ে ইখওয়ানের অগ্রাভিযান রোধ করা সম্ভব নয় দেখে পশ্চিমা সাম্রাজ্যবাদী শক্তি মিশরের রাজতন্ত্রকে লেলিয়ে দেয় ইখওয়ানের বিরুদ্ধে। সাম্রাজ্যবাদ ও ইহুদীবাদের সেবাদাস রাজতন্ত্র ইখওয়ানুল মুসলেমুনকে বেআইনী ঘোষণা করে। ইখওয়ানের বিপ্লবী মুজাহিদ বাহিনীকে ফিলিস্তিন থেকে ফিরিয়ে আনা হয়। দেশে এনে তাদেরকে নিক্ষেপ করা হয় কারাগারের অন্ধ প্রকোষ্ঠে। এটা ছিলো ইখওয়ানের বিরুদ্ধে এক আন্তর্জাতিক ষড়যন্ত্র। কিন্তু এত কিছু করেও ইখওয়ানকে রোধ করা যাবেনা বলে তারা সংকিত হয়। অবশেষে ইখওয়ানের প্রাণ শক্তি এর প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি বিপ্লবী নেতা মর্দে মুজাহিদ ইমাম হাসান আল-বান্নাকে ধরা পৃষ্ঠ থেকে নিশ্চিহ্ন করার পরিকল্পনা ও ষড়যন্ত্র গ্রহণ করাহয়। ১৯৪৯ সালের ১২ই ফেব্রুয়ারী ইমাম বান্নাকে প্রকাশ্যে গুলি করে শহীদ করা হয়। এদিকে কারাগারে বন্দী ইখওয়ান কর্মীদের উপর চালানো হয় অকথ্য বর্বর নির্যাতন। মিশরের খ্যাতনামা সাংবাদিক আশশুরা পত্রিকার সম্পাদক মোহাম্মদ আলী জাহেদ এ নির্যাতনের বিবরণী দিয়ে একটা গ্রন্থ রচনা করেছেন। ইখওয়ানকে পসন্দ করার অভিযোগে তাকেও গ্রেফতার করে কারাগারে আটক রাখা হয়। তাঁর উপরও চালানো হয় অমানুষিক নির্যাতন। ইখওয়ানের উপর এ পরীক্ষা চলে ১৯৫২ সালের ২৩ শে জুলাই বাদশাহ ফারুকের ক্ষমতাচ্যুতি পর্যন্ত। জেনারেল নজীবের নেতৃত্বে বাদশাহ ফারুক সিংহাসনচ্যুত হলে সাময়িকভাবে এ নির্যাতনের অবসান ঘটে। ইখওয়ানের জন্য ফিরে আসে অনেকটা সুদিন।

কিন্তু এ সুদিন খুব একটা স্থায়ী হয়নি হতে পারেনি। তার কারণও অজানা নয়। রাজা ফারুককে সিংহাস নচ্যুত করে জেনারেল নজীবকে ক্ষমতায় বসানোর ব্যাপারে ইখওয়ানের সহযোগিতা ছিলো, এটা সকলের জানা কথা। আর একারণেই আন্তর্জাতিক চক্র এবং দেশের অভ্যন্তরে

www.pathagar.com

তাদের সেবাদাসরা ছিলো বেজায় নাখোশ। তাই জেনারেল নজীবকে ক্ষমতাচ্যুত করার ব্যাপারে শুরু হয় সগভীর চক্রান্তের জাল বুনা। জেনারেল নজীব এ চক্রান্তের মুখে টিকতে পারেনি। তিনি আভ্যন্তরীন ষড়যন্ত্র আর চক্রান্তের শিকার হন। মাত্র দু'বছরের মধ্যে তাকে ক্ষমতাচ্যুত হতে হয়। ক্ষমতায় আসে জামাল নাসের। অবশ্য মিশরে ইখওয়ান এত শক্তিশালী ছিলো যে, এ ব্যাপারে জামাল নাসেরকেও ইখওয়ানের সহযোগিতা গ্রহণ করতে হয়। নাসেরের এককালে সহযোগী এবং তার প্রথম মন্ত্রীসভার শিক্ষামন্ত্রী কামালুদ্দীন হোসাইন আবাসামেতুনা ইয়াতাকালামুনা— বোবারা কথা বলছে, গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন, আমি জামাল আব্দুল নাসের ইখওয়ানের গোপন সংগঠনের নেতা আব্দুর রহমান আস-সান্দীর বাস ভবনে বসে কুরব্যাচান এবং পিস্তলে উপর হাত রেখে প্রতিজ্ঞা করেছিলাম যে,বাদশা ফারুককে ক্ষমনা চুত্য করে আমরা দেশে ইসলামী শরীয়ত জারী করবো। বিপ্লবের পর ইখওয়ান এবং জেনারেল নজীব উভয়েই এ ব্যাপারে একমত ছিলেন যে, সেনাবাহিনী ব্যারাকে ফিরে যাবে। দেশে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করা হবে। কিন্তু পাশ্চাত্য শক্তি এবং জামাল নাসেরের নেতৃত্বে সেনাবাহিনীর একাংশ চান না যে, ইখওয়ানের নেতৃত্বে দেশে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হোক। ছলে বলে কৌয়লে জেনারেল নজীবকে অপসারন করার পর জামাল নাসের ইখওয়ানকে পথের কাঁটা মনে করে। তাই তার মতে পথের কাঁটা অপসারন করতে না পারলে তার গদী বিপদমুক্ত হবেনা। তাই জামাল নাসের ইখওয়ানের বিরুদ্ধে তার প্রাণ নাসের চেন্টার অভিযোগ খাড়া করে। এরপর ইখওয়ানকে বেআইনী ঘোষণা করা হয়। গ্রেফতার করা হয় ইখওয়ানের নেতা এবং কর্মীদেরকে। ১৯৫৪ সালের ৭ই নভেম্বর সামরিক আদালতে এক বিচার প্রহসন চলে। নামকাওয়াস্তে শুনানীর পর ইখওয়ানের নেতাদেরকে ফাঁসীর আদেশ দেয়া হয়। এ সময় যাদেরকে ফাঁসীর কাষ্ঠে ঝুলানো হয়, তাঁদের মধ্যে ছিলেন বিশিষ্ট আইনজীবী আব্দুল কাদের আওদা' বিশিষ্ট আলেম দ্বীন মুহাম্মদ উনসুর আলী, ইউসুফ তালয়াত, ইব্রাহীম তাইয়্যেব হিন্দাবী দুয়াইর, মাহমুদ আব্দুল লতীফ প্রমুখ খ্যাতনামা ইখওয়ান নেতা। ডঃ সাঈদ রহমান, মুস্তাফা আলম, আল আশমাবি, আহমদ সুলায়মান এবং কামেল শরীফেও তাদের অনুপস্থিতিতে মৃত্যু দন্ডাদেশ দেওয়া হয়। কিন্তু তাঁরা তখন দেশের বাইরে ছিলেন বিস্ময় তাদের প্রাণ দন্ড কার্যকর করা

www.pathagar.com

সম্ভব হয়নি। যারা কারাগারে নিক্ষিপ্ত হয়, তাদের উপর চালানো হয় অমানুষিক নির্যাতন। জনৈক খৃষ্টান লেখক রোকাস ম্যাফরন এ নির্যতেনের কাহিনী নিয়ে একটা স্বতন্ত্র গ্রন্থ রচনা করেছে। এগ্রন্থের নাম দিয়েছে আফসামতু আন্ উরবিয়া' আমি কসম করেছি যে, এ কাহিনী আমি বর্ণনা করবো। কোন এক মামলা প্রসঙ্গে তাকেও কিছুদিন একই কারাগারে কাটাতে হয়। এসময় তররার কারাগারে পুলিশের গুলিতে প্রাণ দিতে হয় ইখওয়ানের ২৩ জন কর্মীকে। সাথী জওহার রচিত আল মাওতা ইন্নাতা কাল্লামুনা,—মৃতেরা কথা বলছে—গ্রন্থেও এ নির্যাতনের হৃদয় বিদারক বিবরণ দেখতে পাওয়া যায়। জামাল আব্দুল নাসের' গ্রন্থের রচয়িতা দৈনিক আল মিশরী সংবাদপত্রের সম্পাদক আহমদ আব্দুল ফাত্হ্ও এ নির্যাতন এবং বিচার প্রহসনের উল্লেখ করেছেন। তাঁর মতে সামরিক আদালতের তিনজন সদস্যই ছিলো নাসেরের বন্ধু এবং বিপ্লবী পরিষদের সদস্য। তাঁর মতে এহেন আদালতের কার্যক্রম লজ্জাকর নাটক প্রহসন ছাড়া আর কিছুই হতে পারেনা। এসময় জামাল নাসের আমেরিকার পরিবর্তে রাশিয়ার প্রতি আসক্ত হয়ে উঠে। দি গেম অব নেশনস গ্রন্থের লেখক কপল্যান্ড এর মতে জামাল নাসের ছিলো আমেরিকার কাঠপুতুলী মাত্র।

১৯৬৪ সালে জামাল নাসের সাইয়্যেদ কুতুবসহ কিছু ইখয়ান নেতা এবং কর্মীকে মুক্তি দেয়। এতে মিশরের অভ্যন্তরের কমিউনিষ্ট গোষ্ঠী এবং তাদের মুরুব্বীরা নাখোশ হয়। শুরু হয় তার উপর নানা চাপ। কমিউনিষ্ট পার্টি জামাল নাসেরের সাথে সহযোগিতার জন্য একটা শর্ত আরোপ করে। তা হচ্ছে মিশর থেকে প্রতিক্রিয়াশীল শক্তি তথা ইখওয়ানকে নির্মূল করতে হবে। এ ব্যাপারে মস্কোর পক্ষ থেকে বেশ চাপ আসে। আমেরিকা রাশিয়া, বৃটেন ফ্রান্স এরা সকলেই ইহুদীদের বন্ধু। ইসরাইল রাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠাতা তারাজানতো মিশর থেকে ইখওয়ানকে নির্মূল নিশ্চিহ্ন করতে নাপারলে ইসরাইল রাষ্ট্রে তথা ইহুদীদের অস্তিত্ব বিপদ

www.pathagar.com

মুক্ত হবেনা। সম্ভব হবেনা তাদের পক্ষে মুসলিম অধ্যুসিত এলকা ফিলিস্তিনকে কুক্ষিগত। পাশ্চত্য শক্তির মধ্যে যতো বিরোধ আর যত মত প্রার্থক্যই থাকুকনা কেন, একটা ব্যাপারে তারা সকলে একমত যে, ইসলাম এবং মুসলমানকে কোনঠাসা করতে হবে। মুসলমানকে করতে হবে ধরা পৃষ্ঠ থেকে নিশ্চিহ্ন। এ উদ্দেশ্যেই মধ্য প্রাচ্যের বিষফোড়া ইসরাইলের সৃষ্টি। ১৯৬৫ ইসরাইলের মুরুব্বী রাশিয়া থেকে নাসেরকে তলব করা হয়। পাশ্চাত্যের সেবাদাস নাসের ছুটে যায় প্রভুর ডাকে। ২৭ শে আগষ্ট মস্কোয় আরব ছাত্রদের এক অনুষ্ঠানে বক্তৃতা প্রসঙ্গে জামাল নাসের ঘোষণা করে যে, মিশরে ইখওয়ানুল মুসলেমুন তার বিরুদ্ধে নানা ষড়যন্ত্রে লিপ্ত রয়েছে। অতিতে বহুবার সে ইখওয়ানকে ক্ষমা করেছে এবার আর ক্ষমা করা হবেনা। এ ঘোষণা জামাল নাসেরের মুখ থেকে নিসৃত হলেও আসলে ঘোষণাটি ছিলো মস্কোর। মসকোর এ হুমকী দেয়ার পর নাসের দেশে ফিরে এলেই শুরু হয় ব্যাপক ধর-পাকড়। গ্রেফতার করা হয় হাজার হাজার ইখওয়ান কর্মীকে। কানায় কানায় ভরে ফেলা হয় দেশের সমস্ত কারাগার। গ্রেফতার করা হয় ইখওয়ান কর্মীদের আত্মীয় স্বজনকেও। এক বিচার প্রহসনের মাধ্যমে ফাঁসির কাষ্ঠে ঝুলানো হয় আন্তর্জাতিক খ্যাতী সম্পর্ণ মুসলিম মনীষী, বিশ্ব বিশ্রুত ইসলামী চিন্তাবিদ সাইয়্যেদ কুতুবকে। ১৯৬৬ সালের ২৯ শে আগষ্ট সাইয়্যেদ কুতুবের সাথে আরও দুজন ইখওয়ান নেতাকে ফাঁসির কাষ্ঠে ঝুলানো হয় জীবন মৃত। চালানো হয় তাদের উপর পৈশাচিক নির্যাতন।

কিন্তু সব কিছুরই শেষ আছে। সব যালেমেরই পতন আছে, আছে মৃত্যু। অবশেষে ১৯৭০ সালে জামাল নাসেরও মৃত্যুর কোলে আশ্রয় নেয়। ইমাম হাসান আল বানা, সাইয়্যেদ কুতুব শহীদ আর ইখওয়ানের মরনজয়ী শহীদরা এখনো লক্ষ কোটি মানুষের প্রাণে বেঁচে আছে। যতো দিন চন্দ্র সূর্য আর গ্রহ নক্ষত্রের পরিক্রমণ থাকবে, ততোদিন তাঁরা বেঁচে থাকবেন অযুত কোটী তাওহীদী জনতার প্রাণে। কারণ, শহীদের তো মৃত্যু নেই। আল কুরআনের দ্যর্থহীন ঘোষণা : ওয়ালা তাকুলু লিমাই

www.pathagar.com

ইউকতালু ফী সাবীলিল্লাহি আমওয়াত। বাল আহ ইয়াউ ওয়ালা কিল্লা তাশউরুন—যারা আল্লাহ রাহে জীবন দেয়, তোমারা তাদেরকে মৃত বলোনা তরা জীবীত। কিন্তু তোমরা টৈরপাচ্ছনা। কেবল শহীদরাই নয়, তাদের প্রাণ প্রিয় সংগঠণ ইখওয়ানুল মুসলেমুনও বেচে আছে। ইনশা আল্লাহ বেচে থাকবে। জামাল নাসের আজ মানুষের মনে বেঁচে নেই। বেঁচে নেই তার নর্যাতনের সখিরা। পরিণাম বিচারে দুনিয়ার প্রেক্ষিতেও বলা যায় ইখওয়ান এবং হাসানুল বান্না আব্দুল কাদের আওদা ও সাইয়্যেদ কুতুব শহীদরা বিজয়ী হয়েছেন। পরাজীত হয়েছে নাসেররা।

www.pathagar.com

প্রথম দৃশ্য

শুধু পাঁচ মিনিট

"শুধু পাঁচ মিনিট……এখনই আমরা ফিরে আসছি।"

২৫শে আগষ্ট ১৯৬৫ সাল। গভীর রাত আমাকে গ্রেফতার করার পর মেজর আব্দুল গাফ্ফার তুর্কি এ কথা কয়টি উচ্চারণ করেন।

রাত প্রায় ১টা। আমি মার্কিন লেখক জন চাটিংক-এর নাটক "ম্যান এ্যান্ড মাইস" পড়া শেষ করে ঘুমুতে যাবো। এমন সময় দরজায় 'কলিং বেল' বেজে উঠে। দরজা খুলে দেখি। সুমাইর আল-হোধাইবী। এত গভীর রাতে তাঁর আগমনে বিস্মিত হলাম। তাঁর চোখে-মুখে বিষাদের কালোছায়া। আমরা পাশাপাশি বসে আলাপ করছিলাম। তিনি নূতন নূতন খবর শুনাচ্ছিলেন। বললেন, আমার বন্ধু ইয়াহ্ইয়া হোসাইন আরব এয়ার কোম্পানীর পাইলট। খার্তুম হয়ে আদ্দিস আবাবা যাচ্ছিলেন। খার্তুম অবতরনে পর তিনি রহস্যজনকভাবে নিখোজ হয়েছেন। খবরটা শুনে আমরা যারপরনাই বিস্মিত ও স্তম্ভিত হলাম। তাঁকে জিজ্ঞেস করলাম, তা আপনি জানলেন কি করে? বললেন: মোহাম্মদ গান্নাম ও জিয়া তুয়াইসী আমাকে এঘটনা সম্পর্কে জানান। আবার জিজ্ঞাস করলাম, এর পেছনে রহস্য কি? কারা এ কান্ড ঘটিয়েছে? তিনি বললেন, সঠিক করে কিছু বলা যায়না। নানা লোকে নানা কথা বলছে। কেউ বলছে, সিআইএর কান্ড এটা। সুমাইর বললেন, জানা গেছে, সরকার ইথওয়ানের লোকজনকে গ্রেফতার করা শুরু করেছে। আমি মনে মনে ভাবছিলাম, ইয়াহ্ইয়া হোসাইনের নিখোজ হওয়ার সাথে এসব গ্রেফতারীর সম্পর্ক নেইতো। যাই হোক, একথা সেকথা বলতে বলতে রাত তিনটা বেজে যায়। বন্ধু যাওয়ার অনুমতি চাইলেন। চিন্তিত মনে আমিও ঘুমুতে গেলাম।

একটু পরই ওয়েটিং রুমে খটখট শব্দে আমার চোখ খুলে যায়। দেখি, রুমে বাতি জ্বলছে। খালাতো ভাই রুমজী সেখানে দাঁড়িয়ে। তার

www.pathagar.com

চেহারায় ভীতির চিহ্ন। গৃহের দরজায় স্বজোরে করাঘাত। রুমজী কানে কানে বললো, গুপ্ত বাহিনীর লোকেরা এসেছে। কি করা যায়? দরজা খুলে দেয়া ছাড়া কি আর করার আছে? ঘুমতো উড়েই গেছে। পুলিশ অফিসার ভেতরে প্রবেশ করছে। সঙ্গে আছে সেপাহী ও গোয়েন্দার দল। এরা রিভলভার তাককরে রেখেছে। আমিতো দেখেই হতভম্ব। গুপ্তপুলিশ কেন এখানে? এরা কি চায়? ইয়াহ্ইয়া হোসাইনের ঘটনার সাথে এর কি কোন সম্পর্ক আছে? আমার মনে হচ্ছে যেন কোন ভয়ংকর স্বপ্ন দেখছি। চাচা হাশেম চৌকিদারও তাদের পেছনে পেছনে ছিল। আমাদের মতো সে-ও জানেনা, এসব কি হচ্ছে!

রুমজী পুলিশ অফিসারকে জিজ্ঞেস করেন: কে আপনারা?

পুলিশ অফিসার বললেন: আমি হচ্ছি মেজর আবদুল গাফ্ফার তুর্ক

রুমজী: আমি আপনার পরিচয় পত্র দেখতে পারি?

প্রশ্ন শুনে সকলেই ক্রুদ্ধ নেত্রে আমাদের দিকে তাকায়। মেজর কার্ড বের করে আমাদের চোখের সামনে ঘুরায়। আমরা এর একটা অক্ষরও পড়তে পারিনি। আমাদেরতো চক্ষুছানাড়া। চাচা হাশেমও অস্থির। পুলিশ তাকে বের করে দেয়। একজন সেপাইকে দরজা বন্ধ করার হুকুম দেয়। আমরা নীরব-নিথর। কারোমুখে কোন কথা নেই। পুলিশ অফিসারের শব্দ নীরবতা ভাঙ্গে। আমার নাম সে তার জিজ্ঞাসা: করে আপনাদের মধ্যে আহমদ রায়েফ কে?

: জি, আমি আহমদ রায়েফ।

: তোমার কক্ষ কোন্‌টা?

: আমি নীরবে কক্ষের দিকে ইঙ্গিত করি।

কক্ষের দিকে মুখ করে তিনি বললেন: আমরা কি এতে তল্লাশী চালাতে পারি রুমজী তারে বারণ করার কোশেশ করে এবং তল্লাশীর অনুমতিপত্র দাবী করে তার কাছে। ক্রুর হাসী ছাড়া এর কোন জবাব আসেনি। আমি রুমজীকে অহেতুক কর্ম থেকে বারণ করি। তারা তল্লাশীর জন্য আমার কক্ষে প্রবেশ করে। ঘরের আনাচে কানাচে ছেয়ে আছে সেপাই। আমি পুলিশ অফিসারকে জিজ্ঞেস করি: এসবের কারণ জানতে পারি? আমার জানা দরকার, আপনারা কি চান? ভদ্রভাষায় পুলিশ অফিসার জানায়:

www.pathagar.com

"আমরা তোমার বই পুস্তক এবং কাগজ-পত্র দেখতে চাই।"

বইয়ের কথা শুনে আমার ভীষণ রাগ হয়। এ-তো আমার জীবনের সবচেয়ে মূল্যবান পুঁজি। অতি যত্নে আমি এগুলো সংরক্ষণ করেছি। এতে হাত দেওয়ার অনুমতি নেই কারো জন্য। আমি অনেক কষ্টে ক্রোধ সংবরণ করলাম। কারণ, এছাড়াতো আর কোন উপায় নেই। প্রায় এক ঘন্টা বই পুস্তক ও কাগজ পত্র ঘাটাঘাটি করে বিভিন্ন বিষয়ের এক বিরাট স্তুপ বই গাড়ীতে তুলে নেয়। আমি পরে জানতে পেরেছি যে, গ্রামের বাড়ীতে আমার ছোট ভাইকে গ্রেফতার করতে গিয়েও এরা সেখান থেকে আমার ৮ সিন্দুক বই নিয়ে যায়। যাই হোক, তল্লাশী শেষ। আমি ভাবছিলাম এর পর কি হবে। ইতি মধ্যে পুলিপ অফিসার বলে ঃ

ঃ আপনি কাপড় নিতে পারেন ?

ঃ অবশ্যই। কিন্তু কেন ?

মেজর বন্ধুর সুরে বললেন ঃ

ঃ কিছুই না। ইন্টেলিজেন্স দফতরে মামুলী জিজ্ঞাসাবাদ হবে। আমরা পাঁচ মিনিটেই ফিরে আসছি।

আমি ইতস্তত করে বললাম ঃ

রাতের এ শেষ প্রহরে ?

মেজর এবার একটু কড়া সুরে বললেন ঃ

হাঁ, রাতের এ শেষ প্রহরে !

আমি বুঝতে পারলাম, এখন কথা বলা অর্থহীন। তাই আমি অতি শান্তভাবে কাপড় পরিধান করে নিজেকে সম্পূর্ণ সোপর্দ করে তার সাথে চললাম। গ্রীস্মের মওসুম সত্ত্বেও আমি কেন মোটা কাপড় নিয়েছি, জানিনা। আমাদের মোটর গাড়ী ঘুমের কোলে ঢলে পড়া কায়রোর সড়ক অতিক্রম করছিল অতি দ্রুত গতিতে। সামনের সিটে ড্রাইভারের পাশে বসেছিল মেজর আর আমি বসেছিলাম পেছনের সিটে গোয়েন্দার সাথে। আমি ভাবছিলাম পরিণতির কথা। দুজন সেপাই আমার দু'বাহু ধরেছিল চেপে। যেন তাদের একজন তদারক ফেরেস্তা। আর অপরজন হাঁকিয়ে নিচ্ছে! আমার মনে উদয় হচ্ছিল নানা জিজ্ঞাসা। এসব জিজ্ঞাসার জবাব পেতে বিলম্ব হয়নি মোটেই। সূর্যোদয়ের আগেই আমি এর জবাব পেয়েছি। পরের দিনটি ছিল আমার জীবনের সবচেয়ে বিস্ময়কর দিন।

www.pathagar.com

আমার জীবনের সবচেয়ে বিস্ময়কর দিন

আমরা যখন গোপন পুলিশের দফতরে পৌঁছি, তখন অতি ধীরে সুস্থে রাতের আঁধার কেটে চলছিল। গোটা দফতর ঘুমের কোলে নিঝুম-নিথর নিস্তব্ধ। এক ভয়ংকর দফতর, যেন কবর। টিকটিকির বেষ্ঠনীতে গাড়ী থেকে নেমে মেজরের পিছু পিছু চললাম। তার পরনে ছিল শার্ট ও প্যান্ট। পথ চলতে গিয়ে হাজার হাজার লোকের ভীড়ে হয়তো কখনো তার সাথে আমার সাক্ষাৎ হয়েছে কায়রোর রাজপথে। কিন্তু সেদিন কি আমি ভাবতে পেরেছি যে, এ লোকটির হাতে অনেকের ভাগ্য নিহত রয়েছে। হাঁ, ইনি হচ্ছেন সেশক্তিধর ব্যক্তি। যিনি যখন যাকে খুশী, ঘর থেকে ধরে আনতে পারেন যেখানে খুশী তাকে নিয়ে যেতে পারেন। এজন্য তাকে কেবল এক-খানা ছোট কার্ড দেখাতে হয়। এ তো কার্ড নয়, যেন সোলায়মানের আংটি, বা আলাদীনের চেরাগ আর কি! যাদুকরী শক্তি রয়েছে এ কার্ডের। সত্য কথা এই যে, কার্ড দেখাবারও দরকার করেনা, কেবল ইনি কেন, যে কোন সর-কারী কর্মকর্তা যা খুশী করতে পারেন। তার কাছে কৈফিয়ত তলবতো দূরের কথা 'কেন' বলার সাহসও কারো নেই।

কোন পুলিশ অফিসারের সাথে কারো কোন বিরোধ থাকলে তিনি অতি সহজে উক্ত ব্যক্তিকে গ্রেফতার করে নেন। একদল সেপাই নিয়ে তাকে ঘর থেকে তুলে নিয়ে আসেন। তাকে নিয়ে যান এমন এক স্থানে, সেস্থান সম্পর্কে তার ফেরেশ্তাও কিছু জানেনা। কয়েক মাস পর বিষয়টি রেকর্ড করা হয়। অসহায় লোকটির কোন বিবৃতি নেয়া হতে পারে। আর আদৌ তা না-ও নেয়া হতে পারে। এ ভাবেই বছরের পর বছর সে কারা-গারে পঁচেগলে মরে। এ কঠিন দিনগুলোতে সবচেয়ে বিস্ময়কর যে ব্যাপারটি ঘটে, তা হচ্ছে এই যে, গ্রেফতারকৃত ব্যক্তিকে তদন্তকারী অফি-সারের সামনে হাযির করে এর কারণ জিজ্ঞেস করা হয়। তাকে অবশ্যই এর উপযুক্ত কারণ বলতে হবে। তা না বলতে পরলে তার জন্য অপেক্ষা করে 'আযাবে আলীম'—এক ভয়ংকর বেদনাদায়ক শাস্তি। জি হাঁ, এমনটিই করা হয় মানুষের সাথে। পরবর্তী কালে এমনটিই করা হয়েছে আমার সাথে।

সামরিক কারাগারে আমি মিলিটারী ইন্টেলিজেন্স এর মেহমান ছিলাম। একদিন দফতরের বাইরে তদন্তের অপেক্ষায় ছিলাম। একজনকে ডেকে তার

www.pathagar.com

গ্রেফতারের কারণ জিজ্ঞেস করা হয়। লোকটি বলে, গ্রেফতারের কারণ আমার জানা নেই। আর সত্যিই এ ব্যাপারে সে কিছুই জানতোনা। তদন্ত অফিসার শাস্তি দাতা সেপাইদেরকে বললেন। একে একটু মজা দেখাওত। এর পরই শুরু হয় শাস্তির পালা। দীর্ঘ ৮ ঘন্টা চলে এ শাস্তি। কখনো চাবুক মারা হয়, আবার কখনো লোহার শলা আগুনে গরম করে দেহের নানা স্থানে দাগানো হয়। এ শাস্তি, যেন দোযখের শাস্তিকেও হার মানায়। এ থেকে বাঁচার জন্য কি কারণ দর্শাবে সে তা ভাবতে থাকে। চেষ্টা করে ব্যাপারটি বুঝতে। ইতি মধ্যে আমাকে নিয়ে যওয়া হয় অপর এক তদন্ত অফিসারের কাছে। সেই হতভাগা লোকটির সাথে পরে কি আচরণ করা হয়েছে তা আমি আর জানতে পারিনি।

আর এক হতভাগার কাহিনী

আর এক হতভাগার কাহিনী শুনুন। সে থাকতো একই ইমারতে এক সামরিক অফিসারের প্রতিবেশী হিসেবে। একবার উভয়ের স্ত্রীর মধ্যে ঝগড়া হয়। সামরিক অফিসারটি ঠিক করেন এর কাছ থেকে প্রতিশোধ নিতে হবে। ১৯৫৪ সালে পাইকারী ধরপকাড় কালে লোকটিও গ্রেফতার হয়, সামরিক অফিসার প্রতিশোধ গ্রহণ করার সুযোগ পান। একবার তিনি সামরিক কারাগারের আঙ্গিনায় প্রতিবেশীকে দেখতে পান। সংশ্লিষ্ট রেকর্ডে তিনি এর নামও লিখে নেন। কয়েক মুহূর্ত পরই তাকে অন্যদের সাথে ট্রাকে তুলে নিয়ে যাওয়া হয় সামরিক আদালতে। তার দুর্ভাগ্য যে সেদিন কোন কার্যক্রম ছাড়ই সামরিক আদালতে অভিযুক্তদেরকে বিভিন্ন মেয়াদে দন্ডিত করা হয়। অভিযুক্তদেরকে দাঁড় করানো হয় দু'টি সারীতে। জনৈক সেপাই এসে সারীবদ্ধ লোকদের নাম তালিকাভূক্ত করে। এরপর একজন হাবিলদার এসে ঘোষণা করে, ডান দিকের সারীর লোকদেরকে আদালত দশ বছর সশ্রম কারা দন্ডে দন্ডিত করেছে। বাঁয়ের সারীর লোকদেরকে অতিরিক্ত আরও ৫ বছর দন্ড ভোগ করতে হবে—মানে ১৫ বছর। সেই হতভাগা প্রতিবেশীকে পরদিনই প্রেরণ করা হয় লিমান তররা কারাগারে। সেখানে মোফাত্তাম পাহাড়ের পাদদেশে প্রখর সূর্য তাপের মধ্যে পাথর ভাঙ্গার কাজ করতে হয়েছে তাকে বছরের পর বছর ধরে।

www.pathagar.com

অজানা পরিণতির দিকে

যাই হোক, আমি বলছিলাম ১৯৬৫ সালের ২৫ শে আগষ্ট ভোর বেলার কথা। আমরা মিলিটারী ইন্টেলিজেন্স দফতরে পেঁাছি। মেজর এবং তার সেপাইরা লাফিয়ে লাফিয়ে উপরে চলে যায়। আমিও তাদের সাথে ছিলাম। কিন্তু আমার পা ভারী হয়ে আসছিলো। চিন্তা আর শংকায় ব্যাকুল আমি। বুঝতে পারলাম এক অজানা পরিণতির দিকে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে আমাকে। বিশাল ইমারতের অভ্যন্তরে একজন মানুষও দৃষ্টি গোচর হচ্ছিলনা। এটাই কি সেই ইন্টেলিজেন্স সেন্টার, যার নাম শুনেই সবচেয়ে বাহাদুর ব্যক্তির হৃদয়ও গলে পানি হয়ে যায়। আমি চিৎকার দিয়ে মেজরকে বললাম, তুমি আমাকে কোথায় নিয়ে যাচ্ছ? কেন?

মেজর আমার চিৎকারে কর্ণপাত করলোনা। এখন সে এক ভিন্ন মানুষের রূপ নিয়েছে। একটু আগেওতো সে আমার সাথে শান্ত-মিষ্টি কথা বলছিলো। আমাকে দু'জন গার্ডের হাতে সঁপে দিয়ে সে অপর কক্ষে চলে যায়। আমি ঠায় দাঁড়িয়ে থাকি। আমার ধারণা ছিল, এ বিশাল প্রাসাদ দয়া-মায়াহীন পাহারাদারে ভরা থাকবে। কিন্তু এমন কিছুতো চোখে পড়ছেনা এখন। নিস্তব্ধতার পেছনে নিশ্চয়ই কোন রহস্য আছে।

একজন পাহারাদার আমার দিকে শ্যান দৃষ্টিতে তাকিয়ে। আমি তাকে অবচেতনভাবে জিজ্ঞেস করে বললাম:

: সেখানে কি শাস্তি দেয়া হয়?

: কোথায়?

: যেখানে তুমি আমাকে নিয়ে যাচ্ছ।

পাহারাদার আমার দিকে ক্লান্ত দৃষ্টিতে তাকিয়ে বলে:

: তুমি কি এই প্রথম বার গ্রেফতার হয়েছ?

এখন বুঝতে পারলাম যে, আমি গ্রেফতার হয়েছি। কিন্তু গ্রেফতারীর কারণ কি? আমার কানের কাছে গ্রেফতারশব্দটি ছিল অপরিচিত। আমি ভাবতে থাকি, মেজরতো আমাকে বলেছিল, পাঁচ মিনিটের মধ্যে ফিরে আসবো। তাহলে তার কথাতো ঠিক নয়। পাহারাদারের আওয়াজে আমি চমকে উঠলাম। সে বলছিল, যাই হোক, ঘাবড়াবার কিছু নেই। বললাম: কেন?

www.pathagar.com

সে বললো : মামুলী পিটুনী দেওয়া হবে। মামুলী আর অ-মামুলী পিটুনীর মধ্যে কি পার্থক্য? পরে অবশ্য বুঝতে পেরেছি যে, এ দু'য়ের মধ্যে আসমান যমীন তফাৎ। এ সম্পর্কে পরে বলবো।

মেজর যে কক্ষে ঢুকে ছিল, আমাকেও সে কক্ষে নিয়ে যাওয়া হয়। আমাকে বসতে বলা হয়। একটু পরই আমি নামায পড়ার অনুমতি চাই। অনুমতি দেয়া হয়। মেজরকে কেবলার দিক সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলে বলে জানিনা।

মেজর আমার বাসা থেকে নিয়ে আসা বইপুস্তক, কাগজপত্র, চিঠিপত্র এবং নিবন্ধের একটা ফিরিস্তি তৈরী করে। আমার হাতে কলম দিয়ে বলে, এতে দস্তখত কর। আমি তাকিয়ে দেখি, অনেক বইয়ের নামই এতে নেই। কিন্তু তা সত্ত্বেও পূর্ণ আস্থার সাথে তাতে স্বাক্ষর করি। কিছুক্ষণ পর আমরা আবার গাড়ীতে চড়ি। কায়রোর নানা সড়ক পরিক্রম শেষে এক স্থানে গিয়ে মেজর ড্রাইভারকে নির্দেশ দেয় আমাদেরকে উপরে নিয়ে যেতে।

কেল্লার চূড়া দেখা যাচ্ছিলো। ধীরে ধীরে তা আরও নিকটে আসছিল। এ সময় হযরত আমর ইউনুল আছ এর রূহ আমার সামনে উপস্থিত বলে আমি অনুভব করলাম। সে মহা মানবের রূহ, তিনি মিশরকে মুক্ত করেছিলেন রোমান সাম্রাজ্যের নির্যাতনের কবল থেকে। আর সে মহা মানবের বরকতেই আজ আমি মুসলমান। এ সময় আমি এটাও অনুভব করি যে, সঙ্গীন পরিস্থিতি আর কঠোর পরীক্ষা সত্ত্বেও কায়রোর পথে-প্রান্তে ইসলামের প্রাণ স্বত্ত্বা ছড়িয়ে থাকবে যুগ যুগ ধরে।

গাড়ী নানা অলি গলি আঁকা-বাঁকা শুড়ঙ্গ পথ অতিক্রম করে এমন এক স্থানে গিয়ে পেঁাছে, যেখানে কোন সাধারণ মানুসের চলাচল নেই। সুড়ঙ্গ পথগুলো সেপাই এ ভরা। তাদের সকলের হাতে রাইফেল। আর রাইফেলের মাথায় ধারালো সঙ্গীন। সেপাইদের মাথায় শিরস্ত্রান। যেন তারা কোথাও যুদ্ধে যাচ্ছে! একটা দরজার সামনে গিয়ে আমরা গাড়ী থেকে নামি। আমি বুঝতে পারলাম, আমার সাথে সঙ্গীদের আচরণ এখন কঠোর হচ্ছে। আমরা এমন স্থানে প্রবেশ করেছি, যাকে পুরাতণ কবরের সাথেই কেবল তুলনা করা যায়। আসলে আমরা ছিলাম কেল্লার জেলখানার দরজায়। এই জেলখানা রক্তের এমন হোলিখেলা দেখেছে, যা বিগত যুগে মোহাম্মদ

www.pathagar.com

আলী পাশার রক্তের হোলিখেলার চেয়েও বেশী মানবতা বিধ্বংসী ছিল। আমার মনে পড়ে, এ জেলখানায়ই পরদিন আমাকে একজন নিহত ব্যক্তির লাশ কাঁধে তুলে নিতে হয়েছিল। যাকে জীবন বিসর্জন দিতে হয়েছে রক্তের হোলিখেলার শিকার হয়ে। পরে এ সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করা হবে।

www.pathagar.com

দ্বিতীয় দৃশ্য

বিপদের ঘনঘটা

মেজর আবদুল গাফ্‌ফার তুর্ক বারান্দার দরজার কড়া নাড়ে। অসামরিক পোষাক পরিহিত এক ব্যক্তি দরজা খোলে। তার চক্ষু আগুন ঝরাচ্ছিল। মূর্খতা আর পাষাণ চিত্ততার পরিচয় তার চেহারা থেকেই পরিস্ফুট। সে মেজরকে সামরিক কায়দায় সালাম দিয়ে আমাদেরকে ভেতরে যাওয়ার অনুমতি দেয়।

স্থানটি ছিল কারাগারের কুঠরীর মত একটা সংকীর্ণ কুঠরী। আমরা যে দরজা দিয়ে প্রবেশ করি, তার বিপরিত দিকে আর একটা ছোট দরজা ছিল। বন্ধ দরজাটি দেখে আমার মনে পড়ে জ্ঞানীদের উক্তিসংকীর্ণ দরজা দিয়ে প্রবেশ করবেনা। কিন্তু এসব তত্ত্বকথা আর দর্শন নিয়ে চিন্তা করার সময় তখন ছিলনা। ভেতরে ছিল গাঢ় গোলাপী রংঙ্গের পালিশ করা একটা ছোট টেবিল। টেবিলের উপরে ছিল ২'৩ টা রেজিষ্টার। টেবিলে এক কোণে ছিল একটা বড় তরবারী। টেবিলের পেছনে ছিল একটা ছোট চৌকি। এক বিরাটকায় ব্যক্তি চৌকিতে শুয়ে জোরে জোরে নাক ডাকছিল। লোকটি এত লম্বা ছিল যে, তার পা চৌকির নিচে ঝুলছিল। কক্ষে আমরা প্রবেশ করার পরও তাঁর ঘুম ভাঙ্গেনি। সে তো মানুষ নয়, যেন এক বড় পাথর খন্ড। টেবিলের কাছেই বসেছিল আর একজন সামরিক অফিসার। কোট খুলে রেখেছিল পাশের চেয়ারে। কোটের তিন তারকা প্রমাণ করছিল, সে কাপ্তেন পদ মর্যাদার অফিসার। সে মেজর তুর্ককে অভিভাদন জানায়। তারা দু'জন কথা বলে। আমি যেন সেখানে নেই।

মেজর তুর্ক এবং তাঁর সাথী তখনই চলে যায়। এখন আমি এক নতুন সামরিক অফিসারের পাল্লায়। তিনি না থেমেই এক গাদা প্রশ্ন করা শুরু করেন। তোমার নাম কি, বয়স কত, পেশা কি, ঠিকানা কি ইত্যাদি। আমাকে সব কিছু খুলে ফেলতে বলা হয়। চশমা খুলতে আমি আপত্তি করি। দৈত্যের মত বিরাটকায় লোকটি ততক্ষণে জেগে উঠেছে। সে বললো, চশমা

www.pathagar.com

খুলে ফেলাতেই তোমার মঙ্গল। আমি বললাম, এতে তুমি কি বলতে চাও? সে বলেঃ তুমি জাননা, এ দরজার ভেতর তোমার জন্য কোন্ বস্তুটি অপেক্ষা করছে। শুনেইতো আমার কাহিল অবস্থা। আমি চশমা খুলে তার হাতে দেই। কোন্ বস্তুটি আমার জন্য অপেক্ষা করছে এবং কেন? আমার মনে পড়ে মোহাম্মদ আলী পাশা এবং মামলুকদের শাসন কালের কথা। এই কেল্লায়ই তাঁর কাচারী বসতো। মনে পড়ে আমীন বেগ শাহীনের কথা। আমার কাছ থেকে সব কিছু নিয়ে নেয়ার পর আমাকে সংকীর্ণ দরজা দিয়ে ভেতরে ঠেলে দেয়া হয়। ভেতরে পা ফেলতেই এমন এক দৃশ্য চোখে পড়ে, যা কখনো ভুলবার নয়। আমার বিশ্বাস, জীবনের শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত তা আমার মন থেকে মুছে যাবেনা।

দলে দলে কাতারে কাতার

ভেতরে পা রাখার সঙ্গে সঙ্গে দরজা বন্ধ করে দেয়া হয়। সামনে দুটা পাথরের সিড়ি। আমি সিড়ি দিয়ে নিচে নামি। সামনে খোলা যায়গায় তাকাই। দুই সারীতে ছোট ছোট খুপরি। দরজা খোলা। নম্বর দেয়া। একদল লোক সারীবদ্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে। পরে জানতে পেরেছি যে, এসব হতভাগারা সারা রাত কঠোর নির্যাতন ভোগ করার পর এখন পায়খানার জন্য লাইনে দাঁড়িয়ে নিজ নিজ পালার অপেক্ষায় আছে।

সখ্যায় এরা প্রায় ৩০।৪০ জন। সকলেই ব্যথায় কাতরাচ্ছে। নির্যাতনের শিকার হয়ে এদের চেহারা বিবর্ণ। এদের মধ্যে দুর্জন তৃতীয় ব্যক্তিকে হাতে তুলে রেখেছে। কারণ, তার দাঁড়াবার শক্তি নেই। পা ফুলে গেছে। দেহের নানা স্থান থেকে রক্ত ঝরছে। চেহারায় নানা ক্ষত। চামড়া উপড়ে ফেলা হয়েছে লাল কালো অনেক দাগ মুখে। চেহারা দেখে চেনাই মুশকিল। আর একজনকে দেখলাম, মাথা ফাটা। কালো চুলের মধ্য দিয়ে রক্তের ধারা প্রবাহিত। খঞ্জর দিয়ে তার মাথা ছেঁদা করা হয়েছে যেন। আর একজন পেটে ভর করে হামাগুড়ি দিচ্ছে। তার পায়ে এবং অন্যান্য স্থানে এমন প্রচণ্ড আঘাত করা হয়েছে, যার ফলে দাঁড়াবার ক্ষমতাই তার নেই। তাকে তুলে নেবারও নেই কেউ। হামাগুড়ি দেয়ার শক্তিও যাদের নেই, কেবল তাদেরকেই তুলে নেয়া হয়। এ হচ্ছে মামুলী পিটুনী, সে সম্পর্কে পাহারাদার আগেই

www.pathagar.com

আমাকে অবহিত করছিল। আর এ মামুলী পিটুনীই অপেক্ষা করছে আমার জন্য।

আমি নীরবে দাঁড়িয়ে এসব দৃশ্য অবলোকন করছিলাম। এর ভয়ংকর দিকের কথা চিন্তা করে আমার গলা শুকিয়ে যায়। কিন্তু মজার ব্যাপার এই যে, আমার মধ্যে ভয় অবিশিষ্ট ছিলনা। আমার ভালো ভাবেই মনে আছে যে, এসব অবস্থা দেখেই আমার মন থেকে ভয় দূর হয়ে যায়। কেন আমার এমনটি হয়েছে, তা আজ পর্যন্ত আমি বুঝতে পারিনি। হঠাৎ আমার সামনে এসে দাঁড়ায় এক সুদর্শন যুবক। বয়স প্রায় ২৫ বছর। তার চিকন গোফ উপর দিকে খাড়া। যেন সুদানী চাবুক, যা এখনো ব্যবহার করা হয়নি। যুবকটি কোন্‌দিক থেকে এসেছে, তা টের পাইনি। পায়খানার জন্য যারা লাইন ধরে দাঁড়িয়েছিল- আমি তাদের দিকেই এক দৃষ্টিতে চেয়েছিলাম। যুবকটি আমার দিকে এগিয়ে আসে। একেবারে আমার সামনে এসে দাঁড়ায়। গভীর দৃষ্টিতে আমার পানে চেয়ে নীরিক্ষণ করছিল। সে যেন আমার ভেতরের দিকটা বুঝবার চেষ্টা করছিল। আমিও গভীর দৃষ্টিতে তার দিকে চেয়ে থাকি। কাছে এসেই জিজ্ঞেস করেঃ তুমি আহমদ রায়েফ? হাঁ, আমি আহমদ রায়েফ।

শুরু হলো ভয়ংকর সকাল

এ জবাব শুনেই সে বিজলীর মতো ছুটে এসে সজোরে এক চপেটাঘাত মারে আমার মুখের উপর। আমার চক্ষু থেকে রাগের স্ফুলিঙ্গ ছড়িয়ে পড়ে। তার মুখ থেকে অনর্গল ধারায় বইতে থাকে গালি আর গালি। গালির অভিধানে—দুনিয়ায় যদি এমন কোন অভিধান থাকে—যত নিকৃষ্ট বিশ্রী গালি থাকতে পারে, তার সবই সে আমাকে দেয়। আমি অবচেতন-ভাবে তাকে ধরে দেয়ালের সাথে স্বজোরে ধাক্কা দেই। তাঁকে শাষিয়ে বলি। তুমি কেন আমাকে মারছ এভাবে। তুমিতো দেখছি আস্ত একটা পাগল। দেশে আইন আছে, পার্লামেন্ট আছে। তুমি এসব ভুলে গেলে তার মজা দেখবে। এসবই হচ্ছে কিন্তু আসপাশের কেউ আমার দিকে তাকিয়েও দেখেনি। আসলে তারাওতো বন্দী, সকলেই নিজেকে নিয়ে ব্যস্ত। আমার দিকে দেখার হুঁশ কোথায় তাদের!

www.pathagar.com

কয়েকজন সেপাই আমার দিকে ছুটে আসে। তখন আমারও হুঁশ ফিরে আসে। আমি বুঝতে পারি যে, বর্তমানে এমন এক স্থানে আমি আছি, যেখানে থেকে নিজের জন্য কিছুই করতে পারিনা। পারিনা নিজের কোন ক্ষতি বা উপকার করতে। আল্লাহর মর্জির সামনে মাথা নত করা ছাড়া আর উপায় কি? তিনি যা খুশী তাই করেন। সেপাইরা আমাকে শায়েস্তা করতে চেয়েছিল। কিন্তু যুবকটি তাদেরকে বারন করে। পরে জানতে পেরেছি, এযুবকই হচ্ছে আহমদ রাসেখ। আমি একটু স্বাভাবিক হলে যুবক হাত ধরে আমাকে নিয়ে যায়। এক সংকীর্ণ পথে সে আমাকে নিয়ে চলে, যার চারিদিকে ছিল ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কুঠরী। কুঠরী নয়, যেন মৃত্যুর ছায়া। এভাবেই শুরু হয় সেই ভয়াল সকাল।

গলির শেষ মাথায় ছিল কাঠের সিঁড়ি। তার পিছু পিছু আমিও সিঁড়িতে চড়ি। সেখানে ভয়াল দৃশ্য দেখে আমার ঠোঁট শুকিয়ে যায়। আবেগ-অনুভূতি হয়ে পড়ে বিলকুল ঠান্ডা। সিঁড়ি শেষ হতেই সামনে পড়ে একটা ক্ষুদ্র কক্ষ। এটি ছিল দুটি বড় ব্যারাকের মধ্যখানে। এর একটি ব্যারাক ছিল প্রায় ২৫ মিটার দীর্ঘ এবং ১০ মিটার প্রস্থ। আমি বাঁয়ে উকি দিয়ে দেখি, ব্যারাকে ফার্নিচার ইত্যাদি কিছুই নেই। আছে কেবল একটা কাঠের তক্তা, দু-তিনটা চেয়ার এবং একটা ছোট টেবিল। কোন প্রাণীও নেই সেখানে। অবশ্য দেয়ালের গায়ে ছিল থোকা থোকা রক্তের দাগ। সেখানে আমি মৃত্যুর গন্ধ পাই। একটু পরই আমি ডান দিকে যাবার চেষ্টা করি। আহমদ রাসেখ এসবই দেখছিল। তার মুখে ছিল ক্রুর হাসি। সে হাত দিয়ে ইঙ্গিত করে ব্যারাকের লোকদের প্রতি। আমার কানে ভেসে আসে হৈ-চৈ চিৎকার আর আর্তনাদ। মানুষের চিৎকার, যাদের পেছনে ছিল হিংস্র পশু। হাঁ এ ধারাই চলছিল সেখানে। সত্যি বলতে কি, এবার আমার ভয় হলো!

এসব হচ্ছে আর এক দৃশ্য। ব্যারাকের ভেতর মানুষগুলো দোড়হে ঘুরে ঘুরে। কারো গায়ে কাপড় নেই। একেবারেই উলঙ্গ, যেমন সদ্যজাত শিশু। হাতে লোহার শেকল। ব্যারাকের প্রতিটি কোণে তিনজন সেপাই দাঁড়িয়ে। এদের সকলেরই হাতে লাঠি। তাদের চেয়েও লম্বা। তারা এ হতভাগাদের

www.pathagar.com

পিঠাচ্ছে লাঠি দিয়ে। পিঠাচ্ছে নয়, বৃষ্টি বর্ষণ করছে। আমি সঙ্গাহীন অবস্থায় আহমদ রাসেথকে দেখলাম। বিষাক্ত হাসি হেসে সে আমাকে জিজ্ঞেস করে ঃ

ঃ তুমি এদের কাউকে চেন ?

ঃ না।

ঃ ভালো করে দেখ।

আমি আবার তাকালাম। বেহুঁশ হয়ে মাটিতে লুটে পড়ার উপক্রম হলো আমার। আসলে এসব হতভাগাদের মধ্যে তিনজনই ছিল আমার বন্ধু। কিন্তু প্রথম দৃষ্টিতে তাদের চেনার কোন উপায় নেই। কারণ, এরা সকলেই ছিল সম্পূর্ণ উলঙ্গ। আহমদ রাসেখ আমাকে হুংকার দিয়ে বললে ঃ দেখলে এবার দেশের আইন-শাসন আর পার্লামেন্ট। এসব প্রলাপের কোন অর্থ আছে কি ? আমার থুথু ফেলতে ইচ্ছে হয়। মুখে কোন জবাব এলোনা। এখানে জবাব দেয়ার কি-ইবা থাকতে পারে ! সে আবার কথার পুনরাবৃত্তি করলো। এবার তার সুর বেশ গরম। চারিদিকেগুঞ্জরন। সে বললো ঃ

ঃ এসো, কিছু বল।

ঃ কি বলবো ?

ঃ তোমাকে ক্লান্ত মনে হচ্ছে।

ঃ না। মোটেইনা।

ঃ আরে বদবখ্ত, এখনই আমি দেখে নেবো।

তখনো আমি জানতামনা যে, ব্যাপার কি আর কি-ইবা বলবো। কিন্তু আমি বুঝতে পেরেছি যে, কোন কথা না বললে এরা আমাকে মেরে মেরেই শেষ করবে। মার কাকে বলে, আজ পর্যন্ত তা আমার কাছে অজানা। আহমদ রাসেখের থাপ্পড়ই জীবনের প্রথম অভিজ্ঞতা। এসব হতভাগাদের সে দশা, তার তুলনায় দুএকটা থাপ্পড়তো কিছুই না। আহমদ রাসেখ আমাকে বাম দিকের ব্যারাকে নিয়ে যায়। বলে ঃ

ঃ এবার শুনাও কিছু।

আমার গলা শুকিয়ে যায়। তার মুখপানে আমার দৃষ্টি নিবদ্ধ। মুখে কোন শব্দ নেই। বুঝতে পারছিলামনা আমি, কি যে বলবো। আমি চাপা গলায় বললাম ঃ তোমার সব প্রশ্নের জবাব দেয়া কি সম্ভব ? সে অট্ট হাসিতে ফেটে পড়ে। চিৎকার করে জল্লাদ ডাকে। মিনেটের মধ্যে চারজন জল্লাদ

www.pathagar.com

হাজির। তাদের চোখ তামাতামা, যেন অগ্নি বর্ষণ করবে। হাতে দীর্ঘ লাঠি। আধা মিনিটের মধ্যে কাপড় খুলে আমাকে উলঙ্গ করা হয়। চারিদিক থেকে শুরু হয় লাঠির বর্ষণ। কক্ষের ছাদ যেন লাঠি আর আগুনের চাবুক বর্ষণ করছে। মনে হচ্ছিলো, আমার দেহ-প্রাণ চূর্ণ বিচূর্ণ হয়ে বাতাসে বিকীরণ করছে, পরিণত হয়েছে কঠোর শাস্তির ধোঁয়ায়। প্রায় এক ঘন্টা এভাবে পিটুনী চলে। এ এক ঘন্টা আমার জন্য শত বছরের চেয়ে কম ছিলনা। শ্রান্ত-অবসন্ন হয়ে কখন মাটিতে লুটে পড়েছি, মনে নেই। যেন প্রাণহীন দেহ। এর পরও সেপাইরা আমাকে ছাড়েনি। লাঠি আর চাবুক নিয়ে জড়ো হয় আমাকে মারার জন্য। তারা আমাকে মারতে থাকে, যেমন কশাই জবাই করা পশুকে লটকিয়ে খাল ছিলার জন্য ডান্ডা পেটা করে থাকে ঠিক সেভাবে।

আমাদের খাল খোলার এ কর্মটি ইন্টেলিজেন্সের ভাষায় তদন্ত আর অনুসন্ধান। কিছুক্ষণ পর আবার সেই আহমদ রাসেখ এসে হাজির। তার সামনেই রয়েছে শাস্তির হাতিয়ার। এসব যন্ত্রের ঝংকারে বীর-পাহালওয়ানের দেহেও শিহরণ না জেগে পারেনা। সে অতি নিষ্ঠুরভাবে বলে ঃ

ঃ এসো, কিছু একটা বল।

আমার জবাবের অপেক্ষা না করেই সে বলে ঃ

ঃ তোমাদের মতো ৫০ জন কুকুরকে প্রাণে মেরে ফেলার অনুমতি দিয়েছেন আমাকে ফিল্ড মার্শাল।

ভাবলাম এবার বুঝি আমার জীবনের শেষ মুহূর্ত ঘনিয়ে এলো। কয়েক মিনিট পরই মানুষরূপী এ পশুগুলো আমাকে হত্যার ফয়সালা করবে। এদের পায়ের তলায় পিষ্ট হয়ে আমি আল্লাহর দরবারে পৌঁছে যাবো। আমি শুধু ভাবছিলাম আর ভাবছিলাম যে, এভাবে কি আমার শাহাদাত নছীব হবে। আমি এসব উন্নত চিন্তায় বিভোর। এ সময় শুরু হলো শাস্তি দানের ধারা। এটা ছিল এক নূতন পর্যায়। এবার নূতন ধারা, নূতন বর্বরতা নিষ্ঠুরতা। প্রচন্ড পিটুনীতে প্রাণ যখন ওষ্ঠাগতপ্রায়, তখন তাকে বলছিলাম—কি বিষয়ে কথা বলবো, তা বলে দেবে-ত আমাকে! সে একটা মাত্রশব্দ উচ্চারণ করলো। তাতেই পথ খোলসা হয়ে গেল। কিন্তু এর ধার ছিল তরবারীর চেয়েও বেশী। তা হচ্ছে ইখওয়ানুল মুসলেমুন। আমি অবাক হয়ে তাকে

www.pathagar.com

জিজ্ঞেস করি; ইখওয়ানের কোন্ বিষয় সম্পর্কে বলবো? সে বললো: সংগঠন ষড়যন্ত্র, অস্ত্র, প্রশিক্ষণদাতা—সব বিষয় সম্পর্কে। এরপরই শুরু হয় প্রচণ্ড পিটুনী।

এ অবস্থায় কত সময় কেটেছে, বলতে পারিনা। হুঁশ যখন ফিরে আসে, তখন মনে হয় আমি ঘুমে। অর্ধ দিবস কেটে গেছে। আহমদ রাসেখ ব্যারাক থেকে চলে গেছে। এসেছে আরও অনেক সামরিক অফিসার। সেপাই একটা ডেস্ক নিয়ে এসেছে। সামরিক অফিসাররা গিয়ে বসেছে ব্যারাকের এক এক কোণে। আমার মতো অন্য বন্দীদের সামনে নিয়ে বসেছে সামরিক আফসাররা। কিছু সময়ের জন্য আমাকে বাদদিয়েছে।

প্রাণান্তকর দিন অতিক্রমনের আগেই আমি বুঝতে পারি তদন্ত কার্যক্রমের রহস্যটা কি। সামরিক অফিসাররা অভিযুক্তদেরকে বলছিলো, ইখওয়ান অবশ্যই কোন ষড়যন্ত্র করেছে। কিন্তু অভিযুক্তরাতো নিঃসাড়। এরা সকলেই ইখওয়ানের সদস্য। কিন্তু জামাল নাসেরকে হত্যার ষড়যন্ত্র সম্পর্কে এরাতো কিছুই জানেনা। ফিল্ড মার্শাল আব্দুল হাকীম আমিরের দফতর সেক্রেটারী শাম্স্ বদরানের নেতৃত্বে মিলিটারী ইন্টেলিজেন্স যথা সময় এ ষড়যন্ত্র ফাঁস করে ফেলে। সিভিল ইন্টেলিজেন্স এসম্পর্কে কিছুই জানেনা। বিষয়টি ছিল মিলিটারী ইন্টেলিজেন্সের হাতে। আর সামরিক কারাগারে তার তদন্ত হচ্ছে সিভিল ইন্টেলিজেন্স এ সম্পর্কে কিছু জানুক, তা মিলিটারী ইন্টেলিজেন্সের মনপুত নয়।

তখন আর্মি ক্রিমিনাল ইন্টেলিজেন্স ব্রাঞ্চ ছিল মিশরের সত্যিকার শাসক। এদের সিদ্ধান্ত ছিল চূড়ান্ত আইন। আদালতের ফয়সাল চ্যালেঞ্জ করা যায়, রদ করা যায়, এদের ফয়সালা চ্যালেঞ্জ হয়না, রদ হয়না। এ বিভাগের প্রধান ছিলেন ব্রিগেডিয়ার সাআদ জগালুল আব্দুল করীম, যিনি ছিলেন সরাসরী শাম্স্ বদরানের অধীন। শাম্স্ বদরান ছিল ফিল্ড মার্শাল আব্দুল হাকীম আমেরের অফিস সেক্রেটারী। আর আব্দুল হাকীম আমেরের উপর ছিল নানাবিধ দায়িত্বভার। তাই তিনি সমস্ত দায়ত্ব ন্যাস্ত করেন তাঁর সেক্রেটারীর হাতে। ইনি মিশারের 'মঙ্গল' নিয়ে ভাবেন আর প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করেন। এমনিভাবে শাম্স্ বদরান হয়ে উঠে সম্পূর্ণ বল্গাহীন। মানুষের সাথে যা খুশী আচরণ করে। এ ব্যাপারে আব্দুল হাকীম আমেরের সাথে কথা বলার কোন প্রয়োজন নেই।

www.pathagar.com

ব্যারাকের সামরিক অফিসারের কাছে এক একজনকে আনা হতো তদন্তের জন্য। আর এমন পিটুনী দেয়া হতো যে, অজ্ঞান হয়ে পড়তে হতো। কিছুই বলতে পারতোনা তারা। কারণ, কাহিনী সম্পর্কে তারাতো কিছুই জানেনা। কি বলবে? এমনিভাবে এক এক করে সকলকে হাজির করা হতো আর সকলের সাথেই করা হতো একই আচরণ। সেপাইদের প্রচন্ড পিটুনীতে তারা অপরাধ স্বীকার করতো বাধ্য হয়ে। তদন্তকারী অফিসারকে সন্তুষ্ট করার জন্য অনেক মিথ্যা কাহিনীও রচনা করতে হতো তাদেরকে। এসব মিথ্যা বিবৃতির একটা ছিল চাউলের বস্তা নামে খ্যাত। কাহিনীটি ছিল এরকম ঃ

মুছলেহ জুরাইর নামে একজন শ্রমিক এক সড়ক নির্মাণ সংস্থায় কাজ করতো। ১৯৬০ সালের কথা। দিমইয়াত শহরের কাছে একটা সড়ক নির্মাণ করা হচ্ছিলো। এলাকাটি ছিল ভালো চাউল উৎপাদনের জন্য খ্যাত। কাজ শেষে ফেরার পথে মুছলেহ তাঁর সাথী আহমদ ইসমাইলকে বললোঃ পাশের গ্রামে একজন চাউল ব্যবসায়ী আছে আব্দুল ফাত্তাহ ইসমাইল। চল, চাউল ক্রয়ের ব্যাপারে তার সাথে আলাপ করা যাক।

চাউল ক্রয়ের পরিণতি

আবদুল ফাত্তাহ ইসমাইল ছিলেন ইখওয়ানের অন্যতম নেতা। কিন্তু মুছলেহ এ বিষয়টি ভুলে যায়। দুই বন্ধু সে গ্রামে গিয়ে আব্দুল ফাত্তাহ ইসমাইসলের ঠিকানা খুজে। দুর্ভাগ্য বশতঃ ইন্টেলিজেন্সের লোকজনের সাথে তাদের সাক্ষাৎ হয়। আব্দুল ফাত্তাহ ইসমাইলের নাম উচ্চারন করা মাত্রই এদের নাম ডায়রীতে নোট করে নেয় এবং জিজ্ঞাসাবাদ শুরু করে। এখানে আসার কারণ জিজ্ঞাসা করে। আগামীতে কখনো এ পাড়ায় না আসতে বলে ফিরে যাওয়ার উপদেশ দেয়। ইন্টেলিজেন্সের লোকেরা এসম্পর্কে রিপোর্ট লিখে। বিষয়টি একান্ত তুচ্ছ। তাই পাত্তা দেয়নি। অবশ্য আব্দুল ফাত্তাহ ইসমাঈলের ফাইলে তা নথিভুক্ত করা হয়। মুছলেহ এবং আহমদ ইসমাঈল ফিরে যায় এবং বিষয়টি তারা এখানেই ভুলে যায়।

এভাবে কেটে যায় কয়েক বছর। আসে ১৯৬৫ সাল। গ্রেফতার হন আব্দুল ফাত্তাহ ইসমাঈল। শুরু হয় অনুসন্ধান কার্যক্রম! তাঁর ফাইলে আরও যেসব লোকের নাম ছিল, তাদেরকেও গ্রেফতার করে তদন্ত শুরু হয়।

www.pathagar.com

মুছলেহ এবং তার বন্ধু আহমদ ইসমাঈলও গ্রেফতার হয়। কয়েক বছর আগে তারা আব্দুল ফাত্তাহ ইসমাঈলকে কেন খুজে ছিল, কি ছিল এর রহস্য, তা উদঘটনের চেংটা চালায় সামরিক অফিসাররা। তাদের সোজা জবাবঃ আমরা কেবল চাউল ক্রয়ের জন্য দুমইয়াত গিয়েছিলাম। কিন্তু তাদের এ জবাবে শাস্তি আরও বৃদ্ধি করে। তাদের মাথায় পড়ে শাস্তির বৃষ্টিবান। কখনো লাঠির আঘাত, আবার কখনো চাবুকের ঘা। তাদের মুখে প্রাণ ফাটা চিৎকার। নানা শব্দ। কিছু অর্থপূর্ণ, কিছু অর্থহীন! সব দিক থেকে মৃত্যু তাদের উপর নিপতিত হচ্ছে, কিন্তু এরপরও মরতে পারছে না। জল্লাদ পিটাতে পিটাতে ক্লান্ত-শ্রান্ত হয়ে পড়লে মুছলেহ খোদার দরবারে ফরিয়াদ করে বলেঃ খোদার শপথ, আমরা চাউল ক্রয়ের জন্য সেখানে গিয়েছিলাম। জবাবে সামরিক অফিসার বলেঃ কুত্তার বাচ্ছা! চাউলের বস্তার জন্য গিয়েছিলি, না অস্ত্রের বস্তার জন্য? প্রাণ বাঁচানোর জন্য সে প্যাগলের মত চিৎকার দিয়ে বলে উঠেঃ

জনাব! আপনি কি বললেন, অস্ত্রের বস্তা! হাঁ, হাঁ ঠিকই বলছেন। আমরা অস্ত্রের বস্তার জন্য গিয়েছিলাম সেখানে। এই মাতাল অবস্থায় সে একবার হেসেও দেয়। ফলে শাস্তির ধারা বন্ধ হয়, পরিবর্তন হয় তদন্তের গতি। মুছলেহ এর শিকল খুলে দেয়া হয়, শাস্তিও বন্ধ হয়। কারণ অস্ত্রের কথা স্বীকার করেছে সে। আহমদ ইসমাঈলও জোরেশোরে সমর্থন করে এ স্বীকারোক্তি। তাদের সামনে প্রশ্ন ছিল এমন কিছু স্বীকার করে নেয়া বা মৃত্যুকে বরণ করা।

স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে পরিবর্তন এসেছে। সিভিল ইন্টেলিজেন্সও সক্রিয় হয়ে উঠেছে। সিভিল ইন্টেলিজেন্স এর বিশিষ্ট সদস্য বলে পরিচিত কর্নেল আহমদ ছালেহ সাইদ এসেছেন কেল্লার কারাগারের দায়িত্বে। তিনি নিজেই এসেছেন তদন্ত পরিচালনার জন্য। এখনতো মুছলেহকে অস্ত্রের সন্ধান দিতে হবে। মিথ্যা অস্ত্রের সন্ধান। মুছলেহ তৎক্ষণাত এর জবাবও ভেবে নেয়। গোটা ব্যাপার যেহেতু ইখওয়ানের সাথে সমপৃক্ত, তাই অস্ত্রও দেওয়া হয়েছে তাদের হাতে। তার মনে পড়ে নিজ মহল্লার দুজন ইখওয়ান কর্মীর নাম— আহমদ শোলান ও যাকারিয়া মাশতুলী। ১৯৬৪ সাল এরা কারাগার থেকে মুক্তি পেয়েছে মাত্র। তৃতীয়জনও ছিলেন। তিনি হচ্ছেন মাদার আল-কাছাবী। আল্লাহ এদের প্রতি রহমত ও ক্ষমার বৃষ্টি বর্ষণ করুন।

www.pathagar.com

মুছলেহ তার বিবৃতিতে বলে, এদের তিনজন বা কোন একজনকে অস্ত্র দেয়া হয়েছে ঠিক মনে নেই। আর যায় কোথায়। ফায়ুম কারাগার থেকে এদেরকে নিয়ে আসা হয় কেল্লার কারাগারে। চালানো হয় তাদের উপর অকথ্য ও বর্বর নির্যাতন। নির্যাতনের শিকার হয়ে তাদেরকে প্রাণ দিতে হয়েছে। এদের মধ্যে যাকারিয়া মাশতুলী-এর লাশ আমি নিজে কাধে করে বহন করেছি। অথচঃ অস্ত্রের কাহিনীর সাথে এদের কোন সম্পর্ক ছিলনা। এ সম্পর্কে আদৌ তারা কিছুই জানতোনা। অন্যায় ভাবে এদেরকে হত্যা করা হয়েছে। এরা শহীদ হয়েছেন। আল্লাহ তাদের উপর তাঁর রহমতের ফুল বর্ষণ করুন।

কারা রক্ষীদের নিয়ম ছিল, নির্যাতনের শিকার হয়ে কেউ মারা গেলে কাগজপত্রে তার নামের পাশে লেখা হতো 'ফেরার'। জেলখানার রেকর্ড পুলিশের হাতে পৌঁছলে তারা ফেরার আসামীর গৃহে হানা দিয়ে ধ্বংস যজ্ঞ চালাতো। যাকে ঘরে পেতো, ভীষণ পেটাতো। অনেক সময় ঘরের নারী-পুরুষ নির্বিশেষে সকলকে ধরে এনে কারার অন্তরালে নিক্ষেপ করতো। কারণ, তারা ফেরার আসামীকে আশ্রয় দিয়েছে। আর প্রকৃত আসামীরাতো জীবনের পরীক্ষা থেকে মুক্ত হয়ে আল্লাহর দরবারে পৌঁছে গেছে। মুছলেহ আর তার বন্ধুকে কেল্লার কারাগার থেকে সামরিক কারাগারে প্রেরণ করা হয়। মিলিটারী ইন্টেলিজেন্সের কর্মকর্তারা সেখানে তাদেরকে মুক্তি দেয় কয়েক দিন পর। কারণ, এরাইতো হচ্ছে মিশরে আসল ক্ষমতার মালিক।

ঐতিহাসিক মুহূর্ত

সে ঐতিহাসিক মুহূর্ত আমি কিছুতেই বিস্মৃত হতে পারবোনা। সামরিক অফিসার একদিন দুপুরের খাবার খেতে যায়। এ সুযোগে আমি মুছলেহ এর কাছে আসি। তাকে বলি, এ মিথ্যা বিবৃতি তোমাকে প্রত্যাহার করতে হবে। আর এ মিথ্যা স্বীকারোক্তি করেও তুমি বাঁচতে পারবেনা। নির্যাতন তোমাকে ২৫ বছর সশ্রম কারাদন্ড ভোগ করতে হবে। সুতরাং মিথ্যা বিবৃতি দিয়ে লাভ কি?

সে বললোঃ খোদার কসম। স্বীকারোক্তির জন্য আমাকে যদি ২৫০ বছর কারাভোগ ও করতে হয় তাহলেও আমি তা প্রত্যাহার করবোনা। আমি

www.pathagar.com

তাকে বললাম, তুমি অনুমতি দিলে আমি সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাকে আসল ব্যাপারটি বুঝিয়ে বলতে পারি। শুনে সে কেঁদে ফেললো। আমাকে খোদার দোহাই দিয়ে বললো, আমি যেন এমনটি না করি। আসলে তাদের সাথে এ নিয়ে আমার কথা বলার সুযোগইবা কোথায়। আমিতো নিজের জীবন নিয়েই ব্যাস্ত। নির্যাতনের যাঁতাকলে পিষ্ট হয়ে ধুঁকে ধুঁকে মরছি।

এক দিনের কথা। আহমদ ছালেহ দাউদ সামরিক অফিসারদের সাথে সাক্ষাৎ করার জন্য আমাদের কারাগারে আসে। তদন্তের গতিধারা জানতে চায়। দীর্ঘ বৈঠক শেষে আহমদ ছালেহ দাউদ বাইরে দাড়িয়ে কথা বলছিল জনৈক সামরিক অফিসারের সাথে। আমাকে যেখানে শাস্তি দেয়া হচ্ছিল, এস্থানটি ছিল তার কাছে। দূরত্ব মাত্র কয়েক মিটার। আমি তাকে বলতে শুনেছি বন্ধুগণ! তোমাদেরকে অবশ্যই মনে রাখতে হবে যে, এমন সংগঠন নিশ্চয়ই আছে, যাতে ইখওয়ানের সকল সাদস্য অন্তর্ভূক্ত। অন্য সামরিক অফিসারের জবাবঃ পাশা সাহেব! এপর্যন্ত তদন্তের যে ফল দেখা গেছে, তাতে এটা প্রমাণ হয়না। পাশা সাহেব কঠোর ভাবে প্রতিবাদ করে বলেঃ প্রেসিডেন্ট বলেন, দেশে নিশ্চয়ই এমন সংগঠন আছে! এমন সংগঠন বের করতে হবে। এ ধারায়ই তদন্ত চালাতে হবে। বুঝতে পারলেতো! তোমাদের সাহস গেলো কোথায়? আমি দেখতে পাচ্ছি, এখনও অনেক বন্দী পায়ের উপর ভর করে চলাফেরা করছে?

থেমে গেলো কালের গতি

আহমদ ছালেহ চলে যাওয়ার পর কঠোর শাস্তি আরও কঠোর রূপ নেয়। বর্বরতা, পাশবিকতা হয় আরো তীব্র। যাতে আগামীতে কেউ যেন পায়ের উপর ভর করে চলাচল করতে না পারে। এরা সকল বন্দীকে মৃত্যুর মুখে ঠেলে দিতে উদ্যত। এ কালো দিনগুলোতে কালের গতি যেন থেমে যায়। তদন্ত ব্যারাকে আমি তিনদিন ছিলাম। সব সময় চলে কঠোর নির্যাতন। মাঝে মধ্যে হয়তো ভূলেও যেতো। তখন আমি মেঝেতে উলঙ্গ দেখতে পেতাম নিজেকে। বিশ্বাস করুন, একেবারে জন্মগত উলঙ্গ! এখানে যাদেরকে আনা হতো তাদের সামাজিক অনেক মান-মর্যাদা থাকলেও এদের কাছে কোন মূল্যই ছিলনা। মশা-মাছিও মনে করা হতোনা তাদেরকে। এখানে এনেই কাপড়

www.pathagar.com

খুলে ফেলা হতো। এরপরই লাঠি নিয়ে ছুটে আসতো জল্লাদের দল। শুরু হতো প্রচন্ড পিটুনী। আঘাত কোথায় লাগছে, তা দেখার দরকার নেই তাদের। মারখেয়ে তারা সম্বিত হারা হতো, হতো সঙ্গাহীন। সব রকম শক্তিই হতো বিলুপ্ত। বিকৃত, রক্তাক্ত এবং উলঙ্গ অবস্থায় হাযির করা হতো অফিসারদের সামনে। এখানে শুরু হতো প্রশ্নবান আর সওয়াল-জওয়াবের পালা। কিল-ঘুষি লাথি আর অকথ্য অশ্রাব্য গালিতো লেগেই আছে। কি অপরাধ তা-ই যারা জানেনা, তারা কি আর বলবে? কিন্তু তদন্তকারী অফিসারদেরতো একটা কথাই দরকার—সরকারকে ক্ষমতাচ্যুত করার ষড়যন্ত্রে লিপ্ত ছিল—এ স্বীকারোক্তি। একবার জনৈক অফিসার আমাকে বলেঃ গোটা জাতিই অপরাধী—যতক্ষণ না কেউ নিজেকে নিরপরাধ প্রমাণ করতে সক্ষম হয়।

কেউ কথিত-কল্পিত ষড়যন্ত্রের কথা স্বীকার করলে সাময়িক ভাবে এ শাস্তি থেকে মুক্তি লাভ করতো। কিন্তু সে যে মিথ্যা বিবৃতি দিচ্ছে, এটা ফাঁস হওয়ার পর তার শাস্তির তীব্রতা আরও বৃদ্ধি পেতো। তার উপর চালানো হতো আগের চেয়েও কঠোর নির্যাতন।

www.pathagar.com

তৃতীয় দৃশ্য

গ্রেফতারীর প্রাথমিক দিনগুলো

১৯৬৫ সালে আগষ্টের শেষ দিনগুলোতে কেল্লার ভয়াল দিনগুলোতে এমনই পরিস্থিতি বিরাজ করছিলো। অবশেষে বুঝতে পারলাম, কেন গ্রেফতার করা হয়েছে আমাকে। মিলিটারী ইন্টেলিজেন্সের লোকরা ইয়াহইয়া হোসাইনকে গ্রেফতার করতে চেয়েছিলেন। ইতিপূর্বে ইয়াহইয়া হোসাইনের কথা উল্লেখ করা হয়েছে। গ্রেফতার হওয়ার আশংকায় সে পলায়ন করে। ইন্টেলিজেন্সের লোকজনের চিরা চরিত অভ্যাস অনুযায়ী এখন তার ছাত্রজীবন এবং কর্মজীবনের সঙ্গীদেরকে গ্রেফতার করা অপরিহার্য। তার অন্তর্ধানের খবরাখবর পাওয়ার কয়েক ঘন্টার মধ্যেই শুরু হয় বন্ধু বান্ধবদের ধর পাকাড়। তার সাথে সামান্যতম সম্পর্কও যার ছিল, সেই আক্রোশে পড়ে। কফি কলেজের অনেকেই, ফ্লাইং ক্লাসের বেশ কিছু লোক এবং বাইরের অনেককেই পাকড়াও করা হয়েছে। গ্রেফতার কৃতদের সংখ্যা এবশ ছাড়িয়ে যায়। আমিও ছিলাম তার বন্ধু পর্যায়ের। এমন একজনও ছিল, যার সম্পর্কে তদন্ত চলছিল যে, তার সাথে কোন ধরনের লোকদের সাংগঠনিক সম্পর্ক ছিল। এসব গ্রেফতারী ছিল অদ্ভুত প্রকৃতির। কয়েকটি দৃষ্টান্ত লক্ষনীয়।

বিস্ময়কর গ্রেফতার

আব্দুর রউফ আব্দুল নাছের। এরা শরীফ ঘরের সন্তান। ১৯৫২ সাল থেকে ১৯৬৯ সাল পর্যন্ত সুইজারল্যান্ডে কাটায়। ফার্মেসীতে ডিগ্রি নেয়। ক্যামেষ্ট্রিতেও। দেশে ফিরে আসে। শখ করে ফ্লাইং ক্লাবে ভর্তি হয়। পাইলট হয়। ফার্মেসীর একটা দোকানও খোলে। দোকানেও বসে আবার পাইলট হিসাবেও দেশের বাইরেও যায়। দু'হাতে পয়সা কামায়। দোকান থেকে আমদানী হয় বেশ। আবার বহির্বিশ্বে কিছু ব্যবসা-বাণিজ্যও চালায়। দ্বীনের সাথে কোন সম্পর্ক ছিলনা। সম্পর্ক ছিলনা রাজনীতির সাথেও।

www.pathagar.com

রাজনীতির র'ও তার মাথায় ধরতোনা। কে ক্ষমতায় আসলো আর কে ক্ষমতাচ্যুত হলো তা নিয়ে তার কোন মাথা ব্যথা ছিলনা, শাসনকর্তৃত্বে কার অধিকার আছে-আর কার নেই, তা তার চিন্তার বিষয় নয়। আরাম আয়েশে জীবন কাটায়। ফ্লাইং ক্লাবের দিন গুলোতে সে ছিল ইয়াহইয়া হোসাইনের গ্রুফে। এটাই ছিল তার অপরাধ।

লন্ডন থেকে ফেরার পথে কায়রো বিমান বন্দরে তাকে গ্রেফতার করা হয়। তখন বলা হয়, শুধু পাঁচ মিনিটের জন্য নেয়া হচ্ছে। ব্যাগসহ তাকে কেল্লায় নিয়ে আসা হয়। সেখানে এমন পিটুনী দেয়া হয় যাতে তার মরার উপক্রম হয়। পরে সে নিজে আমাকে বলে সে, নিচের দিকে মাথা দিয়ে ঝুলিয়ে রেখে তাকে পেটানো হয়। অন্য পাইলট বন্ধুদেরকেও সে এ অবস্থায় দেখেছে। এদের মাঝে কয়েকজনের নাম মোহাম্মদ গান্নাম, খালেদ, সাইদ ও জিয়া তুয়াইসি। তার ধারণা বিমান কোম্পানীতে দুর্নীতি এবং চরিত্রহীনতা ছড়িয়ে পড়ায় সরকার হয়তো তাদের সংশোধনের এই ব্যবস্থা নিয়েছে। মজার ব্যাপার এই যে, তার ব্যাগ তল্লাশী করে দু, বোতল দামী হুইস্কী উদ্ধার করা হয়। সুস্পষ্ট বুঝা যায় যে, ইসলামের অপবাদ' থেকে সে সম্পূর্ণ মুক্ত। কিন্তু এরপরও তার শেষ রক্ষা হয়নি।

খালেদ সাইদ। কৃষি কলেজ এবং ফ্লাইং ক্লাবে ইয়াহইয়া হোসাইনের ক্লাশ মেট ছিল। তদন্তের তীব্র কষাঘাত সহ্য করতে না পেরে সে স্বীকার করে যে, ইখওয়ান এর সদস্য সে। অথচ : ইখওয়ান সম্পর্কে তার জ্ঞান ছিলো ভাসাভাসা। কথা কিন্তু এখানেই শেষ নয়। তাকে জিজ্ঞেস করা হয়, ইখওয়ানের কোন উসরার সাথে তার সম্পর্ক। (উসরা বলতে বুঝায় ইখওয়ানের সাংগঠনিক গ্রুপ) জবাবে সে বলে, ইখওয়ানে দু'রকম উসরা রয়েছে। আভ্যন্তরীন এবং বৈদেশিক। শেষটির সাথে সে সম্পৃক্ত। এমন গড়া বিবৃতির ভিত্তিছিল তার ঘনঘন বিদেশ সফর। ইখওয়ানকে অর্থ দান সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হলে সে বলে : একদিন সে লিবারেশন পার্কের কাছে ওমর মোকাররম মসজিদের নিকট দাঁড়িয়েছিল। এক ব্যক্তি এসে জিজ্ঞেস করে তুমি কি আখ (ভাই) ? (ইখওয়ানরা রোকন বা রফীককে আখ বলে)। আমি দেইং নিশ্চয়ই। সে আমার কাছে বত্রিশ কোরশ এয়ানত চায়। এক স্থানে

www.pathagar.com

আর এক দিন সে পঞ্চাশ কোরশ এয়ামত চায়। এ হচ্ছে খালেদ সাইফের বিবৃতি তদন্ত রিপোর্ট। সাদাসিদা এবং হাস্যস্পদ!

ইয়াহইয়া হোসাইনের বন্ধুদের মধ্যে যারা ভাগ্যবান ছিলো, মাস ছয়েক পর তাদেরকে ছেড়ে দেয়া হয়। কিছু লোককে এক বছর, আর কিছু লোককে দু'বছর পর। এমন কিছু লোকও ছিলো, এ ছত্রগুলো লেখার সময় পর্যন্ত যারা কারার অন্তরালে পচে গলে মরছিলো। (১৯৬৯ সালের ৫ই নভেম্বর বুধবার বিকেলে লিমান তরা কারাগারে এছত্রগুলো লেখা হয়)

ইয়াহইয়া হোসাইনের কাহিনী

এবার ইয়াহইয়া হোসাইনের কাহিনী শুনুন। রাষ্ট্রীয় নিরাপত্তা আদালতে পেশকৃত গুপ্ত পুলিশের রিপোর্টে বলা হয়ঃ

"সপ্তম অভিযুক্ত ব্যক্তি জিয়াউদ্দীন আবদাস তুয়াইসী তদন্তকালে স্বীকার করেছে যে, অভিযুক্ত ইয়াহইয়া হোসাইন তার সাথে ইখওয়ানের গোপন সংগঠনের সদস্য ছিলো। ইয়াহইয়া হোসাইন তার মাসিক আয়ের শতকরা পাঁচ ভাগ সংগঠনকে এয়ানত দিত। সে আপন গৃহেই খেলাধুলার প্রশিক্ষণ গ্রহনের ব্যবস্থা করেছিলো। আগ্নেয়াস্ত্র ব্যবহারও সে সিখেছিলো। একটা খঞ্জরও তার কাছে ছিলো। আলী আশমাবী এবং যয়নব গাযালীর কাছ থেকে সে কয়েকখানা সাংগঠনিক পত্রও গ্রহণ করেছিলো জেদ্দা ও খার্তুমে ইখওয়ানের সাথে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের হাতে পৌছাবার জন্য।

আলী আশমাবী ১৯৬৫ সালে ইয়াহইয়া [redacted] এও বলেছিলেন যে, সম্ভব হলে বিদেশ থেকে শব্দ শূন্য রিভলভার [redacted] অভিযুক্ত ইয়াহইয়া ১৯৬৪ সালে আলী আশমাবীর সাথে কায়রো [redacted] আন্তর্জাতিক বিমান বন্দরের বিদ্যুৎ কেন্দ্র পর্যবেক্ষণ করে তা ধ্বংস করার উদ্দেশ্যে। অভিযুক্ত ইয়াহইয়া বিভিন্ন স্থানে মেয়াদী বোমা স্থাপন করে। একবার গোপন সংগঠনের অপর এক ইঞ্জীনিয়ার সদস্য অভিযুক্ত ব্যক্তির সাথে বিমান বন্দর পর্যবেক্ষণে গমন করে। উভয়ে মিলে ব্যাপক পর্যবেক্ষণ চালায়। বিদ্যুৎ উৎপাদন যন্ত্র দেখে। টেলিফোন সংযোগ দেখে। পর্যবেক্ষণ টাওয়ার দেখে। জাহাজ পরিচালন ব্যবস্থা দেখে। আলী আশমাবী অভিযুক্ত ইয়াহইয়া হোসাইনকে ১৯৬৫ সালের জুলাই মাসে কায়রো রেলওয়ে স্টেশনে নিযুক্ত করে

www.pathagar.com

প্রেসিডেন্টের সফর পর্যবেক্ষণ করে তাঁর কাছে রিপোর্ট পেশ করার জন্য। ১৯৬৫ সালের আগস্ট মাসে আলী আশমাবী অভিযুক্ত ইয়াহইয়া হোসাইনকে একথাও বলে যে, আমি গ্রেফতার হয়ে গেলে ফারুক মানশাদীর সাথে যোগাযোগ করবে। তার কাছ থেকে জরুরী হেদায়াত নেবে। আলী আশমাবীর গ্রেফতারীর পর সে এ চেষ্টা করে ব্যর্থ হয় এবং সে সম্পর্কে অভিহিতও করে। এরপর ফারুকের সাথে ইয়াহইয়ার আর যোগাযোগ হয়নি এবং সে খার্তুম পলায়ন করে।

দ্বাদশ অভিযুক্ত ব্যক্তি ফারুক আব্বাস সৈয়দ আহমদ স্বীকার করেছে যে' অভিযুক্ত ইয়াহইয়া হোসাইন ১৯৬০ সালে তাকে বলেছিলো যে, সে ইখওয়ানুল মুসলেমুনের গোপন সংগঠনের সদস্য। এ সংগঠন শক্তি প্রয়োগ করে বর্তমান সরকারের অবসান ঘটাতে চায়। অভিযুক্ত ব্যক্তি জাপানী খেলার প্রশিক্ষণ নিচ্ছে। সংগঠনের নির্দেশ কার্যকর করার জন্য সে দীর্ঘপথ পায়ে হেটে অতিক্রম করার ব্যায়ও করছে। অভিযুক্ত ইয়াহইয়া হোসাইন ফারুক আব্বাসকেও পরামর্শ দিয়েছিলো এসংগঠনে যোগদানের জন্য। অভিযুক্ত ব্যক্তি ১৯৬৫ সালের ২২শে আগস্ট তাকে এটাও বলেছিলো যে, ফারুক মানশাবীর সাথে টেলিফোনে যোগাযোগ করে সংগঠনের কয়েকজন সদস্যের গ্রেফতারী সম্পর্কে তাকে অভিহিত করার জন্য। কিন্তু ফারুকের সাথে যোগাযোগের সুযোগ তার হয়নি।'

ইয়াহইয়া হোসাইনের অনুপস্থিতিতে রাষ্ট্রীয় নিরাপত্তা আদালতে তার বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করা হয়। আদালতের প্রধান জালালুদ্দীন মামলার শুনানী চলাকালে। এরপর মেজর জেনারেল হাসান তামীমীর আদালতে পুনঃ মামলা দায়ের করা হয়। আদালত অভিযুক্ত ব্যক্তির অনুপস্থিতিতে তাকে ২৫ বছর সশ্রমকারাদণ্ডে দণ্ডিত করে। এসময় সে সুদানের বাগানে আজাদীর হাওয়া লুটছিলো। পলিশ ডায়রীতে তার নামের শেষে ফেরার লেখা হয়। সে ছিল একমাত্র ব্যক্তি, যে, সত্যিকার অর্থে ফেরার ছিলো। এছাড়া অন্য যেসব ব্যক্তির নামের পাশে ফেরার লেখা হতো, তারা কিন্তু ফেরার ছিলনা, তারা ছিলো নিহত—এ দুনিয়া থেকে চিরতরে ফেরার।

www.pathagar.com

চতুর্থ দৃশ্য

কেল্লার কারাগার

এবার কেল্লার কারাগার সম্পর্কে কিছু শুনুন। এটা হচ্ছে সুলতান সালাহুদ্দীন আইউবীর দুর্গের একাংশ। মোহাম্মদ আলী পাশা এই কেল্লায়ই মামলুকদের গর্দান উড়িয়েছিলেন। আমরা কেল্লার যে অংশে অবস্থান করছি, ইংরেজরা তার সংস্কার করেছিলো। এখানে তিনশর বেশী লোকের স্থান সংকুলান হয়না। ইন্টেলিজেন্সের মাধ্যমে তদন্ত কার্যক্রমের জন্যও এটাকে ব্যবহার করা হয়। আমাদের তদন্ত কাজও এখানেই চলছে। আলো-বাতাসহীন এসব অন্ধকার সংকীর্ণ কুঠরীতে চার পাঁচজনকে রাখা হয়েছে। অথচঃ এতে দুজনের বেশী লোক রাখা যায়না কিছুতেই। কিন্তু জরুরী অবস্থায় নিয়মেরও পরিবর্তন হয়—এটাতো জানা কথা।

বর্তমানে এখানে চারশ বন্দী আটক আছে। ইখওয়ানের বিরুদ্ধে ইন্টেলিজেন্সের প্রাথমিক তদন্ত কার্যক্রম শুরু হয় এখানে। জঙ্গী জেল খানায়ও আর একটা তদন্ত চলছে। ফিউম কারাগারেও চারশর মতো বন্দী রয়েছে। এখানে যাদেরকে আটক রাখা হয়েছে, ১৯৫৭ সালের গণ আদালতের দশ বছরের দন্ড ভোগ তাদের শেষ হয়েছে। বর্তমানে নুতন করে আবার তদন্ত হচ্ছে তাদেরও।

এখানে এসেছি অনেক দিন হয়েছে। এ কয়দিনে কি খেয়েছি, কিছুই মনে নেই। বলা চলে, এখানে বন্দীদেরকে আদৌ কোন খাবার দেয়া হয়না। আসালে এখানে আমরা নির্বিচার নির্যাতনের যে যাতাকলে আঁটকা পড়েছি, তাতে কারো ক্ষুধা বা খাবার চাহিদা থাকার কথা নয়। এখানে থাকা কালে বোধ হয় কোন দিন খাদ্যের স্বাদ গ্রহণ করে দেখিনি। অবশ্য একটু মনে আছে। এক দিন বিকেলে আমি যখন তীব্র শাস্তির পাঁজায় জ্বলে পুড়ে মরছিলাম, তখন একজন সেপাই আমাকে আধাকাপ চা পান করতে দেয়। আর তা-ও অত্যন্ত নিম্ন মানের এবং অতি বিস্বাদ। আরও মনে পড়ে

www.pathagar.com

মিসকীন জাকারীয়া মাশতুলী যখন পৃথিবী ছেড়ে চলে যাচ্ছিলেন, তখন আমি তার মুখে সামান্য পানী তুলে দেয়ার চেষ্টা করি। এ পানিয় কোথায় পেয়েছিলাম, তা আর এতো দিনে মনে নেই। পরে জানতে পেরেছি যে, কেল্লার কারাগারে জনৈক ঠিকাদার বন্দীদেরকে খাবার সরবরাহ করতো এবং প্রত্যেক বন্দীর কাছ থেকে এ জন্য বিনিময়ও আদায় করতো। আমরা যে অবস্থায় ছিলাম, উপার্জন কারীর জন্য এর চেয়ে ভালো অবস্থা আর কি হতে পারে? সে জানতো যে, এজন্য কেউ তাকে গ্রেফতার করতে পারবেনা। রসদ সরবরাহের দায়িত্ব তো তার হাতে। আর বন্দীরা ছিলো তার কাছে নিরুপায়।

কারাগারের কুঠরী গুলো ছিলো একটা দীর্ঘ সুড়গং পথের ভেতরে, উভয়দিক থেকে খোলা। পাথরের সিড়ির মাধ্যমে নামতে হয়। কোন বন্দীকে তদন্তের জন্য ডাকা হলে একজন বয়স্ক রক্ষী দরজা খুলে দিতো। কাউকে তদন্তের জন্য ডাকা হলে তার কর্তব্য হতো দৌড়ে তদন্ত কুঠরীতে হাযির হওয়া। সে নিজের প্রতি রহম করতে চাইলে এবং দন্ড কিছুটা হ্রাস করা হোক তা চাইলে তাকে তদন্তকারী অফিসারের সামনে সম্পূর্ণ উলঙ্গ হয়ে দাঁড়াতে হয়। তাকে নিজ হাতে পরনের কাপড় খুলে ফেলতে হয় দৌড়তে দৌড়তে। এতে অন্ততঃ লটকানোর উদ্বোধনী শাস্তি থেকে রেহাই পেতে পারে। তদন্তাধীন লোকদেরকে দু'দিন সম্পূর্ণ উলঙ্গ অবস্থায় রাখা হয় তদন্ত কক্ষে। তদন্ত শেষে সে যখন কুঠরীতে ফিরে আসতো, তখন কাপড় খুজে নেয়ার কোন সুযোগই দেয়া হতোনা তাকে। কখনো দৈব চক্রে কাপড় হয়তো পাওয়া যেতো। কিন্তু, তা যে রক্তে ভেজা। এমনও হতো যে, কাপড় আদৌ খুজে পাওয়া যেতোনা। সম্পূর্ণ উলঙ্গ অবস্থায় তাকে কুঠরীতে প্রবেশ করতে হতো।

কেল্লার কারাগারে যতো লোক ছিলো। সকলেই ছিলো মারাত্মক ভাবে আহত, ব্যাথায় কাতর। দেহে রক্তাক্ত। সেখানে কোন ডাক্তার ছিলোনা। ছিলোনা প্রাথমিক চিকিৎসার ব্যবস্থা। অবশ্য মুরেস নামে একজন মোটা-সোটা লোক সেখানে ছিল। তাকে ডাক্তার বলা হতো। কিন্তু সে কোন সময় আহতদের দেখা-শুনা করেনি। ক্ষতস্থানে পট্টি বাঁধতে তাকে দেখা

www.pathagar.com

যায়নি কোন সময়। বরং উল্টো শোনা গেছে যে, কোন কোন আহত ব্যক্তির মৃত্যুত্বরান্বিত করার ব্যাপারে তার সহযোগিতা ছিলো।

কেল্লায় ছিলো একজন সুদর্শন চটপটে যুবক। যে ব্যারাকে তদন্ত কার্যক্রম চলতো, সেখানে এসে দাঁড়াতো সে, লাজুক দৃষ্টিতে এ দিক সেদিক তাকাতো। আমি তাকে বুঝতে পারেনি। বরং প্রথম দৃষ্টিতে আমার মনে হয়েছিলো, সেও বুঝি আটককৃত ব্যক্তিদেরই একজন। যাদের তদন্ত চলছিলো, তাদের দিকে সে অত্যন্ত দয়ার দৃষ্টিতে তাকাতো। পরে বুঝতে পেরেছি, এ হচ্ছে একজন জুনিয়ার অফিসার। প্রশিক্ষণাধীন রয়েছে এখানে সে। একটু পরই আমাকে তার হাতে সোপর্দ করা হয়, যাতে তদন্তের পদ্ধতি শেখার মশক করতে পারে।

আমার বাসা থেকে যেসব কাগজপত্র তুলে নিয়ে আসা হয়েছিলো, একটা ছোট টেবিলে তা রাখা হয়। এগুলোর মধ্যে কিছু ব্যক্তিগত চিঠিপত্রও ছিলো, যার বিষয়বস্তু এবং প্রেরকের নাম এখন আর আমার মনে নেই। ইসলামের ইতিহাস এবং খৃষ্টাব্দ শেষ বিষয়ে আমার কিছু নিবন্ধ এবং নোটও ছিলো। ১৯৬৬ সালের একটা ছোট ডায়রীও ছিলো। যুবকটি এগুলো উল্টেপাল্টে দেখছিলো। আমার কাছে এসে জিজ্ঞাস করলো, তোমার বাসায় কি টেলিফোন আছে? আমি বললাম না। আমার কথা শুনামাত্রই সে আমার মুখে সজোরে এক চপেটাঘাত মারে। আমারতো চক্ষু ফেটে পড়ার উপক্রম। সে আরো কাছে এসে দম ফাটা বিকট শব্দে বললো: রে কুত্তার বাচ্চা! মিথ্যা দিয়েইকি তদন্ত কার্য শুরু হবে? আমারতো আক্কেল গুড়ুম। আমার বাসায় আবার টেলিফোন কোথায়। আমি অবাক বিস্ময়ে হতবাক তাকে বললাম, আমি কসম করে বলছি, আমার বাসায় টেলিফোন নেই। সে আমাকে কিল-ঘুষি আর লাথি মারতে শুরু করে। একটু আগেওতো সে আমাদের দিকে দরদভরা দৃষ্টিতে চেয়েছিলো। আমি তাকে বার বার নিশ্চয়তা দিয়ে বলছিলাম যে, আমার বাসায় টেলিফোন নেই। আমার কথায় বিশ্বাস না হলে এখনই টেলিফোন বিভাগ থেকে জেনে নেয়া যায়। থেকে থাকলে অস্বীকার করে আমার কি লাভ? আর থাকলেইবা কি অপরাধ। সরকারতো এখনো তা নিষিদ্ধ করেনি। কিন্তু তার কাছে আমার এসব আকুতি অর্থহীন।

www.pathagar.com

আমার আশংকা হলো, সেতো আমার জান নিয়েই ছাড়বে। আবেদন নিবেদন আর কাকুতি-মিনতী অর্থহীন পর্যবসিত হওয়ায় আমি স্বীকার করে নেই যে, আমার বাসায় টেলিফোন আছে। তার মুখে হাসির রেখা ফুটে উঠলো। সফল তদন্তের হাসি। আমি ভাবলাম, জটিল ব্যাপারটি বুঝি সহজে কেটে গেলো। কিন্তু হঠাৎ সে টেলিফোন নাম্বার জিজ্ঞেস করে বসলো। এবার আমি পড়লাম বিপাকে। তাকে যে কোন একটা নাম্বার বলে দিতে উদ্যত হলাম। এমন সময় দেখলাম, সে আমার ছোট ডাইরীটার পাতা উলটাচ্ছে। আমি থামলাম। মনে পড়ে, বছরের শুরুতে যখন ডায়রীটা ক্রয় করি, তখন এর ঘরগুলো সব পুরো করি নাম; ঠিকানা টেলিফোন নাম্বার সবই। আমার এক বন্ধুর পরামর্শে তার বাসার টেলিফোন নাম্বার আমার ডায়রীতে লিখে রাখি। আমি তখনই সে নাম্বারটা উল্লেখ করলাম। কিন্তু তার এবং সহযোগিদের কিল ঘুষি বন্ধ হলোনা। তদুপরী ছিলো অশ্লিল ভাষায় গালি-গালাজ। যেন জ্বলন্ত কয়লা ছুড়ে মারা হচ্ছে আমার দিকে সে বিড়বিড় করে বলছিলো ঃ রে কুত্তার বাচ্ছা। অস্বীকার করে কি লাভ? আমি তোমার সব কথাতো জানি।

আর একজন সামরিক অফিসার আব্দুল মোনএম দায়রাফী এসে আমাকে এ যুবকের হাত থেকে উদ্ধার করেন। কিন্তু যুবকটি সে দিন আমাকে এতটা মেরেছিলো যে, আমার মৃত্যুর উপক্রম হয়েছিলো। সে ধরে নিয়েছিলো' আমি বুঝি ইখওয়ানের গোপন সংগঠনের অন্যতম নেতা। এখন এ সম্পর্কে আমার কাছ থেকে বিস্তারিত বিবৃতি আদায় করে নেয়া ছিলো তার কাজ। যদিও ব্যাপারটি সবই মিথ্যা কিন্তু অস্বীকার করেইবা লাভ কি? বুদ্ধিমানের কাজ হচ্ছে প্রশ্ন শুনেই জবাব দেয়া ইতস্তত না করে পটপট বলে যাওয়া। যা করেনি তাও নির্দ্বিধায় স্বীকার করে নেয়া। তদন্ত অফিসার যাতে তার কথায় মিথ্যার গন্ধও খুঁজে না পায়, সে বিষয়েও সতর্ক থাকতে হবে। অন্যথায় তার জন্য রয়েছে ভয়ংকর শাস্তি।

আব্দুল মোনএম ছায়রাফী আমাকে কারাগারের আঙ্গিনায়, নিয়ে যায়। আমি সেখ নে এক কোনে বসে পড়ি। তিনি আমার প্রতি সহানুভূতি প্রকাশ করেন, বন্ধুত্বের ভাব দেখান। এতে আমার মনে কিছু শান্তি ফিরে আসে। তিনি অত্যন্ত শান্ত ভাবে অন্তত কুড়িবার আমাকে জিজ্ঞেস করেন ঃ ইখওয়া-

www.pathagar.com

নূলে মুসলেমনের গোপন সংগঠন এবং এর পাঁচ সদস্যের রাহনুমা কমিটি, সম্পর্কে বিস্তারিত বল। আমি ভাবলাম, আলোচনা বেশ ভালোর দিকে মোড় নিচ্ছে। আমি যাই কিছু বলবো, তিনি সত্য বলে স্বীকার করে নেবেন। আমিও খুব শান্তভাবে তাঁকে বললাম ঃ পাঁচ সদস্যের কমিটি সম্পর্কে আমার আগে কিছু জানা নেই। আমার ধারণায় এমন কোন কমিটির অস্তিত্বই নেই।

ঃ কিসের ভিত্তিতে তোমার এ ধারণা ?

ঃ এটা আমার অনুভূতি। আমার জ্ঞান তাই বলে।

ঃ এর অর্থ এই যে, ইখওয়ান এবং তার গোপন সংগঠনের সাথে তোমার কোন সম্পর্ক নেই।

ঃ কক্ষনো না।

ঃ মনে হচ্ছে, তোমার সাথে ভদ্রতা এবং ভালো ব্যবহারে কোন কাজ হবেনা।

এ বলেই সাদাসিদা গরম মেজাজের মানুষটি হঠাৎ রক্ত পিপাসু হিংস্র পশুতে পরিণত হয়। তার বিকট চিৎকার শুনে চারিদিক থেকে জল্লাদরা ছুটে আসে। ইতি পূর্বে তিনি আমাকে কাপড় পরার অনুমতি দিয়েছিলেন। এরা এসেই আমার কাপড় খুলে ফেলে। এবার কিল-ঘুষি আর লাথির আঘাতে আমাকে নিয়ে যাওয়া হয় আযাব ঘরে। হে খোদা। তুমিইতো সহায়।

আযাব ঘরের ক্যালেন্ডারে রাত আর দিনের কোন প্রার্থক্য ছিলনা। সব সময় শাস্তি চলতো। এর কোন শেষ ছিলনা, ছিলনা শেষ হওয়ার কোন আশা। আমরা কে কি কোথায়। কিছুই হুঁশ থাকতোনা। আমরা নিজেদেরকে দেখতে পেতাম কখনো আযাব ঘরে, কখনো কুঠরীর অভ্যন্তরে কখনো পায়খানার ভেতরে। সাড়া শব্দ অনুভূতিহীন জড়পদার্থ যেন! নির্যাতন-নিষ্পেশনের কঠোরতায় জীবন হয়ে উঠেতো ওষ্ঠাগত। দেশের প্রত্যন্ত প্রান্ত থেকে শরীফ ঘরের সন্তানদেরকে তুলে নিয়ে আসা হচ্ছে। তারাতো কোন অন্যায় করেনি, করেনি কোন অপরাধ। পাশান প্রাণ অফিসাররা তাদেরকে হিংশ্র জন্তুর মতো চিবে খাচ্ছে। তাদের কাছে এমন সব তথ্য জানতে চাচ্ছে, যা তাদের জানা নেই। প্রতিটি ব্যক্তি জ্বলছে আযাবের কুন্ডলীতে।

www.pathagar.com

কেল্লার কারাগারের রক্তাক্ত ড্রামা এক দিন শেষ হয়ে যায়। তিন জনের বেশী আদম সন্তান এ ড্রামার বলি হয়। প্রায় চারশ লোক মারাত্মকভাবে আহত হয়ে পড়ে থাকে। চার চার জনের দলে বিভক্ত করে আমাদেরকে কুঠরী থেকে বের করে আনা হয়। আমরা কারাগারের আঙ্গিনায় জড়ো হই। গোটা আঙ্গিনা ভরে যায়। লাঠি চাবুক ও শাস্তির অন্যান্য উপকরণ গাছের হয়ে যায়। এমন কি, শাস্তির মহড়া চালিয়েছিলো যারা, তাদের চেহারাও দেখা যায়না। কেহই বুঝে উঠতে পারছিলনা এ নূতন কার্যক্রমের রহস্য।

বাইরের দুনিয়াকে বিদায় জানিয়ে এক দিন যে সুড়ঙ্গ পথে আমরা কেল্লার কারাগারে ঢুকে ছিলাম। সে পথেই ভেতরে আসে একজন মাঝ বয়সের লোক। হেংলা পাতলা শিফশিফে। তার মুখে সিগারেট। মুখে এবং ঠোটেচেপে ধরা। তার সঙ্গে রয়েছে ত্রিশ বছরের একজন যুবক। যুবকটি বললোঃ ডাক্তার সাহেব আপনাদের পরীক্ষা করবেন। আপনারা ভয় করবেননা। শাস্তির পালা শেষ। যারা ভীষণ আঘাত পেয়েছেন, হাত তুলুন। ঘোষণায় অধিকাংশ লোকই হাত তোলে। সারীর মাঝখান দিয়ে ডাক্তার হেটে যায়। আহতদেরকে দেখে তার মুখে দুঃখ ও সহানুভূতির দাগ ফুটে উঠে। গভীরভাবে আহত কাউকে দেখে প্রকাশ্যেই জল্লাদদের লানত দেয়। নওজোয়ান সঙ্গীকে বলে আহত ব্যক্তির নাম তালিকাভূক্ত করে নেয়ার জন্য। এ অবস্থা দেখে সকলে সাহস ফিরে পায়। সকলে সরকারকে গালি দেয়া শুরু করে। যালেমকে দেয় লা'নত। ডাক্তারও মাথা নেড়ে তাদের প্রতিক্রিয়ায় সাড়া দেয়। তাদেরকে শান্তনা দেয়।

এ ডাক্তার হচ্ছে ব্রিগেডিয়ার আহমদ রুশদী। আবু জে'বল কারাগারের আযাব ঘরের কমান্ডার। কয়েক ঘন্টা পরই আমাদের কাছে এ রহশ্য উৎঘাটিত হয়। আবু জে'বল কারাগারে পেঁছা মাত্রই তালিকাভূক্তদেরকে দেয়া হয় প্রচন্ড পিটুনী। আমার নাম ইচ্ছা করেই তালিকাভূক্ত করিনি। কিন্তু তাহলে কি হবে, আমিও রেহাই পাইনি এ পিটুনী থেকে।

সামরিক পুলিশের গাড়ীতে ভরে আমাদেরকে নিয়ে যাওয়া হয় আবু জে'বল কারাগার অভিমুখে। গাড়ীর পেছনের দরজায় খাড়াছিলো সাম-

www.pathagar.com

রিক পুলিশ এসব গাড়ী রাস্তা দিয়ে যাওয়ার সময় সাধারণ মানুষ হয়তো মনে করবে এতে সামরিক জওয়ানদেরকে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে। আসলে কিন্তু তা নয়। এরা হচ্ছে গ্রেফতারকৃত মযলুম জনতার কাফেলা। সাম্প্রতিক অভিজ্ঞতার আগে আমিও অনেক গাড়ী এদিক সেদিক যেতে দেখেছি এখন বুঝতে পেরেছি, এসব গাড়ীতে আমাদের ভাইদেরকেই নিয়ে যাওয়া হয়েছে সত্যপথে যারা ছিলেন আমাদের পূর্বসূরী। আমাদের গাড়ীতে আমরা ছিলাম ত্রিশজন। বদর আল কোছাইবীও ছিলেন আমাদের সাথে। তাঁর আঘাত ছিলো মারাত্মক। আমরা তাকে একটা কম্বলে জড়িয়ে হাতে তুলে নিয়েছিলাম। আবু জে'বল পৌছার আধা ঘন্টা পরই তিনি জীবন দাতার হাতে প্রাণ সোপর্দ করেন।

আজব দেশ আজব শহর

আমি গাড়ীর ভেতর থেকে উঁকি মেরে বাইরের লোকজনকে দেখতাম। তারা স্বাভাবিক জীবনযাত্রা নির্বাহ করছে। তাদের জীবনের গতিতে কোনরূপ পরিবর্তন নেই। কি হবে তা নিয়ে কারো কোন মাথা ব্যথা নেই। আল মাক শারায় কি হচ্ছে, সাধারণ মানুষ হয়তো তার খবরই রাখেনা। (মামলুকদের শাসনামলে আযাব ঘরকে বলা হতো আল মাফশারা—কশাইখানা) রাস্তা দিয়ে তীব্র গতিতে মোটরগাড়ী ছুটে যাচ্ছে। পথচারীদের কল কাকলী চলছে। বাস স্ট্রান্ডে চলছে ছেলে-মেয়েদের লুকচড়ি। জীবনের প্রবাহ ছিল স্বাভাবিক।

গাড়ীতে যারা ছিলো, সকলের মুখেই হাসি। 'আযাবে আলীম' থেকে নাজাত পাওয়ার হাসি। সকলেই উল্লাসিৎ। আমাদের সংগে ছিলো এক নওজোয়ান। কোমলপ্রাণ ও ভীরু প্রকৃতির। সে করা না করা সব কিছুই স্বীকার করে নিতো। এজন্য আমরা তাকে অনেক তিরস্কার করেছি। বলেছি সাহস করে ধৈর্য ধর। কিন্তু সে কারো কথাই শুনেনা। তার ধারণা ছিল, তদন্তের পালা শেষ। তখন অপরাধ, অনুযায়ী বিভিন্ন মেয়াদে শাস্তি দেয়া হবে। এ দন্ড ভোগ করার জন্যই আবু জে'বল স্থানান্তর করা হচ্ছে। সেখানে পৌছে জানা যাবে, কাকে কয় বছরের দন্ড দেওয়া হয়েছে। আমি তাকে

www.pathagar.com

বুঝাবার চেষ্টা করি, দণ্ডদানের জন্য দরকার আদালতের কার্যক্রম কিন্তু সে বলে: দোস্ত, মিশরে এসবের কোন পরওয়া করা হয়না। অতঃপর উপহাসের সুরে সে বলে: আইন আদালত আর নিয়ম; এসব তুমি কি বলছো? ভুলে গেলে চলবেনা যে, তুমি মিশরে বাস কর। মিশর হচ্ছে এক আজব দেশ, আজব শহর! সে উত্তেজিত হয়ে বলতে থাকে: লিমনতরা (আবু জেবল কারাগার) পৌঁছে সরকারের সমর্থক হওয়া আমাদের কর্তব্য হবে। সরকার তখনই আমাদেরকে ছেড়ে দেব। আমরা যত বড় অপরাধই' করিনা কেন?

ব্যাপারটি ছিল বড়ই হৃদয় বিদারক, বড়ই দুঃখজনক। চারিদিকে শোক-দুঃখের ছায়া ঘেরা। কেন আমাদের সাথে এহেন মানবতা বিরোধী আচরণ করা হচ্ছে? এর ভিত্তি কি? কি জন্য এসব করা হচ্ছে?—এমন অনেক প্রশ্ন আমার মনের কোনে উকি মারতো। অতঃপর এর তীব্র প্রতিধ্বনী কানে বাজতো। অতঃপর আমার কাটা ঘায়ে নুন ছিটিয়ে দেয়ার কাজ করতো।

www.pathagar.com

তিনটি করে কম্বল পেয়েছে। একেবারে নতুন কম্বল। এখনোও ব্যবহার করা হয়নি। একটা বাটী, একটা চামিচ এবং এলুমিনিয়ামের একটা চকচকে প্লেটও পেয়েছি। পরিবেশ ছিলো অতি মনোরম, সৌভাগ্যের অনুভূতি প্রস্ফুটিত। নতুন পরিচ্ছন্ন ইমারতে আরাম আয়েশে জীবন কাটাবে —এই ভেবে সকলের মন আনন্দে আটখান।

এক ব্যারাকে বড়জোর ত্রিশজনের স্থান সংকুলন হতো। পরে সেখানে একশত্রিশজনকে গুঁজে দেয়া হয়। আমাকে স্থান দেয়া হয় এক নাম্বার ব্যারাকে। আমার বন্ধুরা সবাই এ ব্যারাকে। তাই আমি আনন্দিত। সকলে নিজ নিজ স্থান নেয়। ক্ষণেকের জন্য হলেও আরামে গা এলিয়ে দেই। খাবার এলো। লোহার মলীন পেয়ালায় ডাল ভরা। ডাল পাক করা হয়েছে সালাদ দিয়ে। ডালের সাথে অসংখ্য কংকর। সব মিলিয়ে খাবার ছিলো অতি নিম্ন মানের। তা সত্বেও আমরা গোগ্রাসে গিলে ফেললাম, কারণ, আমাদের অধিকাংশই কেল্লার কারগারে কোন খাবার খায়নি।

আমাদেরকে অতি নিকৃষ্ট সাবানও দেয়া হয়। এ সাবান কারাগারের কয়েদীদের তৈরী কয়েক দিন আমরা সাবানের ছবিও দেখিনি। সাবান পেয়েই আমরা ছুটে যাই গোসল খানায়। যেটুকু নেংটি পরণে আছে, তা ধুয়ে ফেলার জন্য। অনেক কিছুই মাখাছিলো আমাদের এ নেংটিতে। কেল্লার কারাগারে নির্যাতনের ফলে প্রবাহিত জমাট রক্তও ছিলো। গোসল-খানায় ছিলো পায়খানা, পেসাবখানা এবং হাউজ। একসঙ্গে তিনজন গোসল করার ব্যবস্থা ছিলো। শীতল পানি দিয়ে মহানন্দে আমরা গোসল করলাম। ধুয়ে ফেললাম দীর্ঘদিনের ময়লা কালিমা আমাদের এমনও অনেক ছিলো, আঘাতের তীব্রতার কারণে তারা কাপড় ধুতে পারেনি গোসল করতে পারেনি। তা সত্বেও তারা আনন্দিত। কারণ, কেল্লার কারাগারের ভয়াল দিনগুলো অতিক্রান্ত হয়েছে। ব্যারাকের যে অংশে আমরা থাকি, তার দরজা লোহার শিকের। ফাঁক দিয়ে কেবল খাবার ভেতরে দেয়া যায়। গোটা ব্যারাকে নযর বুলিয়ে দেখি, প্রায় সকলেই বয়স্ক লোক। কয়েকজন মাত্র যুবক। এরা ইয়াহইয়া হোসাইনের বন্ধু। যুবকদের মধ্যে আমিও একজন।

জানতে পারলাম, এ ব্যারাকে যারা বাস করছে, তারা মিসরের কোন না, কোন ইসলামী সংগঠনের সাথে সম্পৃক্ত যেমন জমিয়তে ছেরাতে মুস্তাকীম, মুর্দাদাকনের কল্যাণমূলক প্রতিষ্ঠান, জমিয়তে শারইয়্যাহ, তাবলীগি ইসলামী

www.pathagar.com

জমিয়ত ও অন্যান্য সংগঠন। হিযবুত তাহরীরিন ইসলামীর কিছু লোকও ছিলো। ইখওয়ানুল মুসলেমুনের লোক ছিলো সবচেয়ে বেশী। আসলে গোটা ব্যাপারটাই ছিলো ইখওয়ানকে কেন্দ্র করে। এমন কিছু লোকও ছিলো, কোন ধর্মীয় বা রাজনৈতিক সংগঠনের সাথে যাদের কোন সম্পর্ক ছিলনা। কিন্তু তাদের আত্মিয়তা ছিলো এমনসব লোকের সাথে, যারা কোন না কোন সংগঠনের সাথে জড়িত ছিলো, তাই তাদেরকে ধরে আনা হচ্ছে। এমন কিছু লোকও ছিল যারা নিজের কোন ব্যাপারে জড়িত ছিলনা, ধর্ম ও রাজনীতির সাথে জড়িত ব্যক্তিদের ব্যাপারে এদের কোন আগ্রহও ছিলনা। এমন লোকের অস্তিত্ব আছে জেনে আমরা বার বার অবাক হয়ে আঙ্গুলে কামড় দিচ্ছিলাম। অবশ্য আমাদের এ বিস্ময় বেশীক্ষণ-স্থায়ী হয়নি।

আমরা এখানে প্রথম রাত কাটিয়েই পরিচয়, মত বিনিময় এবং কেল্লার কারাগারের নির্যাতন নিয়ে আলোচনা করে, আমার বিশ্বাস, কেল্লার দুঃখময় দিনগুলোর স্মৃতি কখনো বিস্মৃত হওয়ার নয়। সে সময়ের কথা মনে পড়লে চিন্তা-বুদ্ধি আড়ষ্ট হয়ে উঠে। দেহ এবং নেকটির উপর তার চিহ্ন এখনো স্পষ্ট রক্তধারা আঘাত, থোকা থোকা রক্তের দাগ আর চাবুকের ঘা কেল্লার স্মৃতি মনে জাগিয়ে তোলে তীব্রভাবে। কেল্লায় আমরা ছিলাম মাত্র কয়েক দিন কিন্তু মনে হয়, কতদিন নয়, বরং তা ছিলো কত বছর। কিন্তু আজ নূতন ইমারতে স্থান পেয়ে আমরা আনন্দিত। নব নির্মীত এই ইমারতটি অতি চমৎকার এবং আলোকোজ্বল।

আনন্দের মধ্য দিয়ে রাতটি দ্রুত কেটে যায়। প্রত্যু সানন্দে নিদভাঙ্গে। অযু করে সারীবদ্ধ হয়ে আল্লাহর হুকুমে হাযির হই। তাঁর অসীম শক্তির অনুভূতি আচ্ছন্ন করে আমাদেরকে। শান্তির অবসান আমাদের অন্তরে প্রজ্বলিত করে আশার নূতন আলো। আমরা নামায আদায় করি। বাইরের দুনিয়ার নামায থেকে আমাদের এ নামায ছিলো শতগুণে ভিন্ন-স্বতন্ত্র। কেল্লায় অবস্থান কালে এক ওয়াক্ত নামাযও আদায় করতে পারিনি আমরা। সেখানে নামায আদায়ের সুযোগই দেয়া হয়নি। শাস্তির চাবুক চলছিলো অবিরত ধারায়। বস্তুতঃ সেখানকার দিন হাশর ময়দানের চেয়ে কম ছিলনা।

বাইরে পক্ষীকুল কিচির-মিচির করছিলো, আর ভেতরে সুমধুর কণ্ঠে আমরা কুরআনুল করীম তেলাওয়াত করছিলাম। উভয় আওয়াজ মিশে সৃষ্টি করছিলো এক মধুর আবেগ। আবুজে'বল কারাগারে এ হচ্ছে আমা-

www.pathagar.com

পঞ্চম দৃশ্য

আবু জে'বল কারাগার

শনিবার আছরের সময় আমরা আবু জে'বল কারাগারে পৌঁছি। শাস্তির যুগ শেষ হয়েছে মনে করে বাহ্যত, আমরা ছিলাম আনন্দিত। অন্তত ঃ তাই ছিলো আমাদের ধারণা। ইন্টেলিজেন্সের লোকজনেরও ধারণা ছিলো শাস্তির এসব প্রক্রিয়া ব্যর্থ হয়েছে। আমরা মনে করেছিলাম, এখানে কিছু-দিন কাটিয়ে আমরা সেরে উঠবো। এরপর আমরা আপন আপন গৃহে ফিরে যাবো। এসব চিন্তা করে আমাদের মনে জাগে অসীম আনন্দ। এ কারণে গাড়ী থেকে নামিয়ে আমাদেরকে যখন আবু জে'বলের অফিসারদের হাতে তুলে দেয়া হচ্ছিলো' আমাদের অনেকেই তখন অট্টহাসিতে রীতিমতো ফেটে পড়ছিলো।

কারাগারের অফিসার আমাদেরকে গ্রহণ করার সময় এক এক করে গুনে নিচ্ছিলেন। এতে আমাদেরকে নিয়ে আসা সামরিক রক্ষী বলেঃ মিষ্টার ইসমাঈল। ভয়ের কোন কারণ নেই। গননায় হ্রাস বৃদ্ধি হলে আমি তা পুরো করে দেবো। তুমি শুধু রিসিভ করে নাও। এরপর মিঃ ইসমাঈল সংখ্যার প্রতি নযর না দিয়ে শুধু রিসিভ করে নেয়।

এ ছোট বাক্যটি সবসময় আমার মনের কোনে উঁকি মারে। আমি ভাবি, সে কি করে সংখ্যার হ্রাস-বৃদ্ধি পুরো করবে। কোথা থেকে আনবে, আর কোথায় নিয়ে যাবে। হাঁ, নিশ্চয়ই এমনটি করতে পারে সে।

আগে বলেছিলাম, বদর আল কোছাইবকে আমরা হাতে তুলে নিয়ে এসে-ছিলাম। তাঁর অবস্থা ছিলো সঙ্গীন। কারা ফটকে মেজর ফওজীকে দেখ-লাম। পরে কিছু দিনের জন্য কারাগারের কমান্ডার করা হয়েছে। বদরকে দেখে মেজর ফওজী অনেকটা ব্যথিত হলেন। কেল্লার কারাগারে তাঁর উপর এমন নির্যাতন চলেছিলো, যার ফলে তাঁর অবস্থা দাড়িয়েছিলো মলা আটার মতো। মেজর ফওজী আমাদেরকে বললেন, তাকে একটা কুঠরীতে নিয়ে শুইয়ে দাও। এরপর আমরা আর বদরের চেহারা দেখিনি। ইতিহাসের মঞ্চ

www.pathagar.com

থেকে অপ্রকৃত হয় বদর। বা ইতিহাসের একটা গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায় হয়ে দাঁড়ায়। কেউ বলতে পারেনা, কোথায় বদরের কবর। ধৈর্যের বিশাল পাহাড়তুল্য এ মানুষটার স্মৃতি আমাকে সব সময় পীড়া দেয়। তাঁর কথা মনে পড়লে আমি সবসময় আরব কবির কবিতাটি আবৃত্তি করি :

سيذ كرنى قومى اذ اجد هم
وفى الليلة الظلماء يفتقد البدر

সাইয়াযকুরুনী কাওমী ইযা জাদ্দহুম
ওয়াফীল লাইলাতিয় যুলমায়ে ইফতাকদুল বাদরু
খঞ্জরে মোরে মোর জাতি যখন হবে দগ্ধ
আঁধার রাতে তীব্র হবে 'বদর' হারার যাওয়ার অনুভূতি !

আবু জে'বল কারাগার তেতালা আলীশান ইমারত। প্রতিটি তালায় ১২টি কক্ষ। এক একটি কক্ষকে ব্যারাক বলা হয়। ইমারতের প্রথম ফটক লোহার শিকের তৈরী। বেষ্টনী প্রাচীরের উপর ও লোহার শিক গাঁথা। তার আঙ্গিনা সুদৃঢ় খাচার মতো। আবুজে'বল অঞ্চলে আগে থেকে একটা ইমারত ছিলো। বর্তমান ইমারত তার ধ্বংসাবশেষের উপর নির্মীত। এর দুশ মিটার দূরেই রেডিও স্টেশন। ১৯৫৬ সালের যুদ্ধে রেডিও স্টেশনের উপর গোলা-বারুদ নিক্ষিপ্ত হলে এই ইমারতটিও ভীষণভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়। বর্তমান ইমারত অতি সম্প্রতি নির্মীত। ঠিকাদারদের পক্ষ থেকে কারা বিভাগের নিকট ইমারতটি কয়েক দিন পর হস্তান্তর করার কথা ছিলো। কিন্তু ইন্টেলিজেন্স থেকে চাপ দেয়া হয় তাড়াতাড়ি এর নির্মাণ কাজ সমাপ্ত করার জন্য। ধারণা ছিলো, এই ইমারত কম্যুনিষ্টদেরকে স্বাগতম জানাবে। কিন্তু খোদার ইচ্ছা ও ফয়সালা ভিন্ন। আমাদের মতো মজলুদের জন্যই আল্লাহর ইচ্ছা হয়েছে।

সূর্যাস্তের পূর্বক্ষণে আমরা কারার অভ্যন্তরে প্রবেশ করি। ভেতরে শ্রমিকরা তাড়াহুড়া করে কাজ সমাপ্ত করছিলো। ভেতরে প্রবেশকালে আযাবের ফেরেশতাদের কেউকে চোখে পড়েনি। বরং যাদেরকে দেখতে পেয়েছি তাদেরকে মনে হয়েছে উদারমন, নরম স্বভাব আর কোমল হৃদয় বলে। আমাদের সাথে তাদের ব্যবহারও ছিলো অতি কোমল। আমাদের এক একজন

www.pathagar.com

তৈরী ছালা। কিন্তুত কিমাকার! হুকুম হলো পরনের কাপড় খুলে জমা দেয়ার। কাপড় কিছুতেই শরীরে খাপ খায়না, তা ছাড়া পূতি গন্ধময়। যেন দীর্ঘ দিন ময়লা-আবর্জনায় ডুবিয়ে রাখা হয়েছে। টুপি দিলো কদাকার। তখন ভীষণ গরমের মওসুম। একদিকে গরম আর দিকে মোটা দুর্গন্ধময় পোশাকে জীবন হয়ে উঠে অতীষ্ঠ, অসহ্য। যে পাইলট গল্প দিয়ে আমাদেরকে হাসিয়ে মজিয়ে রেখেছিলে, তিনি তো নূতন পোশাক পরার নির্দেশের কথা শুনে কান্না জুড়ে দেন রীতিমতো। খোদার দোহাই দিয়ে তাঁর নিজের পোশাক পরতে দেয়ার জন্য বলেন। হাবিলদার মোল্লা জবাব দেয়ঃ তোমাকে আস্ত ছেড়ে দেয়া হয়েছে এজন্য খোদার শোকর আদায় কর।

দরজার ফাঁক দিয়ে বাইরে উঁকি মেরে দেখি, সেপাইরা লাঠিশোটা, ভেতের ছড়ি এবং চামড়ার চাবুক নিয়ে আসছে বিপুল পরিমাণে। এগুলো দেখেই অনেকের পিত্ত পানি হয়ে যায়, আমাদের এক বন্ধু কুরআন মজীদের নিম্নোক্ত আয়াতটি উচ্চারন করে

يا ايها الذين امنوا اذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا

لعلكم تفلحون

—হে তোমরা যারা ঈমান এনেছ, তোমরা (শত্রু) দলের মুখোমুখি হলে দৃঢ়থাকবে এবং আল্লাহকে বেশী করে স্মরণ করবে। আশা করা যায় যে, তোমরা সফলকাম হবে। এ আয়াতটি সকলের মনে যাদুর মতো কাজ করে। আল্লাহর যিকির এবং কুরআন মজীদ তেলাওয়াতের শব্দে গোটা ব্যারাক গর্জে উঠে। সকলের মনেও উথলে উঠে শান্তি—স্বস্তির অবিরাম ধারা।

শুরু হলো চিৎকার

এসময় এক বিকট শব্দ হয়। কেঁপে ওঠে কারাপ্রাচীর। ব্যারাকের সকলেই আমার দিকে চেয়ে আছে। আসলে আমাকে বাইরে ডাকা হচ্ছিলো। হঠাৎ আমার মনে গতির সঞ্চার হলো। এ শব্দের একটা বিশেষ অর্থ আছে। কখনো এখানে আগমন ঘটেছে এমন লোক তা বুঝে। এ যাবৎ আমরা যে শান্তিতে কাটিয়েছি, তা ছিলো নিছক স্বপ্ন, মরীচিকা মাত্র! আবার শব্দ হলো। বিকট শব্দ! আমরা আবার ডুবে গেলাম চিন্তায়। কখন এ পরীক্ষা শেষ হবে, কখন আসবে প্রশস্ততা, খোদাই ভাল জানেন।

www.pathagar.com

ব্যারাকের বুড়ো সাথীরা আমার নিকটে এলেন, কানে কানে কুরআন মজীদের আয়াত পড়েন। আমি দরজার দিকে এগুই, দূর থেকে হাঁক দেয়া লোকটি যাতে আমাকে দেখতে পায়। আমাকে দেখেই সে লাফিয়ে আমার সামনে আসে। হাতে তার চাবি। সে দরজা খুলে, নিয়ে যায় আমাকে বাইরে। চোখে পট্টী বেধে অন্ধের মতো টেনে নিয়ে যায়। কখনো উপরে তোলে, কখনো নিচে নামায়। এরপর এমন এক স্থানে নিয়ে যায়, সেখানে ছিলো শুকনো ঘাস আর কাটা। আমার ধারণা, জেলের বাইরে কোথায় নিয়ে যায় আমাকে।

এক ভয়ংকর শব্দে আমি চমকে উঠি। পরিচিত শব্দ। মেজর ফা-আইন এর আওয়াজ। কেল্লার কারাগারে তদন্তকালেও সে আমার জন্য কেয়ামত সৃষ্টি করেছিল। অতি দাম্ভিক আর অস্থির ভঙ্গিতে বলে ঃ

ঃ হাঁ, তুমি এসেছ ?

ঃ আমি নেরুত্তর।

ঃ তোমার কপাল খুব খারাব।

ঃ চাপা স্বরে কেন

ঃ সত্যিসত্যিই কি তুমি জাননা, কেন তোমার কপাল খারাপ !

এরপর সে শুরু করে একের পর এক অশ্লীল অশ্রাব্য গালি। আমার জবাবের আগেই সে শুরু করে উপর্যপুরি লাথি। কয়েক মুহূর্ত পরই আমাকে একসাথে নিয়ে মাথা নিচে পা উপরে দিয়ে ঝুলিয়ে রাখা হয়। আমার চোখ বাধা। চারিদিক অন্ধকার। পায়ে পড়ছে বিশেষ ধারায় ডান্ডার আঘাত। আমার মনে হচ্ছিলো, এর চেয়ে বুঝি মৃত্যু সহজ। আমি বার বার মিনতি জানিয়ে বললাম, আমিতো একজন মুসলমান। তোমাদের মতোই এদেশের একজন নাগরিক। কিন্তু তার একই কথা' তোমাকে একটা কিছু বলতে হবে। কিন্তু বিবাদ হচ্ছে এই যে, কি বলতে হবে, তা সেও জানেনা, আমিও না। এভাবে পালাক্রমে নির্যাতন চলে। আযাব চলে। এরপর আমি মনে মনে প্রতিজ্ঞা করেছি যে, আর চিৎকার করবোনা, মুখে কোন শব্দই উচ্চারণ করবোনা। কিন্তু কোনবারই প্রতিজ্ঞা রক্ষা করতে পারিনি। হাঁ ঠিকই বলছি এ আযাব ছিলো মানুষের সহ্যের অতীত। অন্তত: আমার সহ্যের অতীত !

www.pathagar.com

দের প্রথম সকাল। এখানকার দিনগুলো কেল্লার চেয়েও ভয়ংকর বিপদাশংকুল হবে। এখনো আমরা তা ভাবতে পারিনি। এটাও আমরা বুঝতে পারিনি যে, একটু পরই আমরা এই বলে দোয়া করবো যে, পরের লাগুনা থেকে আগের লাগুনাইতো ভালো ছিলো। ভালো ছিলো পরের কশাইর চেয়ে আগের কশাই। সূর্য উদয় হয়েছে। আমাদের জন্য খাবার এলো। কালো মধু, খাবার অযোগ্য এক টুকরো পনির, বাসি শুকনো রুটি। রুটির সাথে রয়েছে অনেক পদার্থ। পোকামাকড়। কিছু পোকামাকড়তো চিনতে পেরেছি, আর অনেক ছিলো যা চেনা সম্ভব হয়নি।

খাবার শেষে আমরা কিছুটা খোশ আলাপে মশগুল। তখন পর্যন্ত আমাদের পুরো ধারণা ছিলো এ শান্তি সমাহিত পারিবেশ বর্তমান থাকবে। দেখা দেবেনা এতে কোন ছেদ। হঠাৎ একজন সামরিক অফিসার এসে হাযির। তিনি দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে আমাদের সাথে কথা বলছিলেন। তিনি বেশ শান্ত প্রকৃতির লোক। কঠোরতার সাথে তাঁর পরিচয় নেই। শাস্তি দানে তাঁর ভূমিকা না থাকারই মতো। আমাদের অন্তরে এমন লোকের মূল্য অসীম। কেল্লার কারাগারে যে সব অফিসার তদন্ত করেছিলেন, ইনি তাদের একজন সেখানে যারা মার-পিট এবং শাস্তি সিতম ছাড়াই তদন্ত কার্য চালিয়েছিলেন। ইনি হচ্ছেন তাদের একজন। কিন্তু চোক্ষের পলকে তিনি হাওয়া হয়ে গেলেন স্বপ্নের মতো। আমার সাথে অনেক কথা বললেন, অনেক কিছু জিজ্ঞাসাবাদ করলেন। তেড়া-বাকা কিছু কথাও বললেন। তিনি হাত-পা ব্যবহার করেননি, ব্যবহার করেছেন বিচার-বুদ্ধি। তাঁর কথা-বার্তা থেকে আমরা মনে করলাম, আমাদের পরীক্ষার পালা বুঝি শেষ হয়েছে। কেল্লায় যা ঘটেছে, তার আর পুনরাবৃত্তি হবেনা। এখন কিছুদিন আটক থাকতে হবে। তা-ও হয়তো খুব বেশী দিন নয়। কোন কোন বন্ধুতো আনন্দে আটখান। মুক্তির পরওয়ানা এসে গেলো বুঝি!

তিন ব্যতিক্রমী চেহেরা

আমাদের সাথে এমন কিছু বিরল ব্যক্তিত্বও ছিলো, মুক্তি পাওয়া যাদের কোন মাথা ব্যথা ছিলোনা। তাদের দৃপ্ত চেহারায় দৃঢ় প্রত্যয়ের গভীর ছাপ অংকুরিত। ঈমান বিল্লাহ্‌র সদা প্রশান্তি তাদের অন্তরকে শান্তি-সুস্থিতির

www.pathagar.com

নেশায় সর্বদা বিভোর করে রাখতো। এরা ছিলেন ইমাম হাসানুল বান্নার হাতে গাড়া খাটি সোনা। ইখওয়ানুল মুসলেমুনের আন্দোলনের সেরা সৃষ্টি। উৎকৃষ্ট অবদান। এদের মধ্যে তিনজনের নাম ভালো ভাবে আমার মনে নেই। এখন তারা কোথায়, আল্লাহ-ই ভালো জানেন। এদের একজন হচ্ছেন শেখ হামেদ আত্তাহান। দ্বিতীয় জন ওস্তাদ মাহমুদ আবদুহু। ১৯৪৮ সালে ফিলিস্তিন জেহাদে ইখওয়ান বাহিনীর অন্যতম কম্যান্ডার। আর তৃতীয় জন হচ্ছেন আল হাজ্ব আবদুর রহমান ছামছুল্লাহ। ১৯২৮ সালে ইসমাইলিয়া শহরে যে ৬ জন মহান ব্যক্তিত্বকে নিয়ে ইখওয়ানুল মুসলেমুন গঠিত হয়, তাঁদের একজন। মানব-মনে আল্লাহর প্রতি ঈমান ও আস্থার অবিরাম ধারা সৃষ্টির জন্য এদের প্রতি একনযর দৃষ্টি নিক্ষেপ করাই যথেষ্ট। পক্ষান্তরে এখানে এমন কিছু লোকও দেখা যায়, যাদের অন্তরে দৃঢ়তার চেয়ে অস্থিরতাই ছিলো বেশী। আমাদের সাথে ছিলেন দফতরের একজন ইন্‌সপেক্টর। অতি কাপুরুষ এবং কঞ্জুস। জেলখানার দারোগার কাছে তিনি পাঁচ পাউন্ড জমা রেখেছিলেন। তিনি বারবার বলতেন ইনটেলিজেন্সের লোকজন তার প্রাণ বাঁচালে তিনি পাঁচ পাউন্ড তাদেরকে দান করতে প্রস্তুত। ব্যাপারটি পাঁচ পাউন্ডের নয়, তা যেন তার ধারণাই ছিলোনা।

দেখা দিলো পরিবর্তন

আমরা আনন্দে বসে একজন পাইলটের গল্প শুনছিলাম, যিনি জীবনে এমন নাজুক পরিস্থির কথা কল্পনাও করতে পারেননি। আসল ব্যাপারটি বুঝতে না পেরে তিনি কৌতুক করছিলেন আর তার কৌতুক শুনে আমরা হাসছিলাম। আসলে আমরা মনে করে বসেছিলাম, এখানে বুঝি আমরা আরামে ছুটি কাটাবো কিছুক্ষণ পরই আমাদের মনের এভাব কেটে গেলো। শুরু হলো পরিবর্তন। শুরু হলো হৈ চৈ। বিকট মূর্তি আর পাশান চিত্তের এক হাবিলদার এলো। তাকে বলা হতো মোল্লা,। এসেই সে সকলের নাম জিজ্ঞাসা করে আর তা নোট করে নেয়।

কয়েদীদের বিশেষ পোশাক নিয়ে আসে কারা কর্মচারী। ব্যবহৃত পোশাক না হলেও তা ছিলো ছার পোকায় ভরা। কাপড়তো নয়, যেন সনের

www.pathagar.com

মেজর আমাকে অচেনা একজনের হাতে তুলে দেয়। সে আমাকে একটু দূরে কোথাও নিয়ে যায়। আমি নানা চিন্তায় ডুবে যাই। আজই কি আমার জীবনের অবসান ঘটবে? এমনিভাবে এত সহজে? ফিল্ড মার্শাল আব্দুল হকীম আমের আমাকে চেনেন তাতো বিশ্বাস হয়না। কেন আমি তাদের এত অসহ্য। কি ক্ষতি করেছি?

অতীতের স্মৃতি মনে জাগে। আসা-আকাংখ্যা, সুন্দর স্বপ্ন, সুন্দর আরজু, বই পড়ার স্বাদ বিশেষ করে কোন নূতন বই পড়ে মনে যে অনাবিল আনন্দ সৃষ্টি হতো। এসব কিছু এক এক করে মনের কোনে উঁকি মারে। ভাবি, কয়েক মিনিট পরই এসব কিছু সঙ্গে নিয়ে দুনিয়া থেকে বিদায় নিতে হবে। কোথায় গেছে আইন? কোথায় গেছে সভ্যতার দাবী? প্রগতির বুলি? সুবিচার-ন্যায় নীতির শেষ কীর্তনটুকুও মুছে গেছে মন থেকে। আমি সম্বিত হারিয়ে ফেলি। বমিভাব দেখা দেয়। কিন্তু এ অবস্থায় আমি তার পেছনে পেছনে চলছি, যে আমাকে ফাঁসির কাষ্টে ঝুলাবার জন্য নিয়ে যাচ্ছিলো।

চলতে চলতে হঠাৎ সে থমকে দাঁড়ায়। আমিও দাঁড়াই। আমার অনুভূতি রহিত। কানে ভিন লোকের পায়ের আওয়াজ। মেজর ফা-আইনের আওয়াজ :

ঃ মৃত্যুর আগে কোন্ আকাংখ্যাটা পুরো করতে আগ্রহী?

ঃ দু'রাকাত নামায আদায় করতে চাই। আল্লাহ তাআলার সাথে সাক্ষাতের প্রস্তুতির চিরতরে অবসান হচ্ছে জীবনের। আমিতো প্রস্তুতি নিয়ে আসিনি।

ঃ নামায? কিসের? মেজর বলে।

ঃ আল্লাহ তা'আলার সামনে মাথানত করার অনুমতি।

ঃ না, না। আমরা নামাযের অনুমতি দিতে পারিনা। এটা আমাদের ইখতিয়ার বহির্ভূত।

এরপর তার সাথে আরও কিছু দূর সামনে যাই। হঠাৎ একজন এসে আমাকে ফেলে দেয় মাটিতে। পেছনে জিঞ্জীরে বেঁধে ফেলা হয় আমার হাত। আমার মন থেকে ভয়-ভীতি আর ক্ষোভ-দুঃখের অনুভূতি নিশ্চিহ্ন হয়ে যায় সম্পূর্ণ ভাবে। মনে হলো, এবার বুঝি শেষ মুহূর্ত উপস্থিত হয়েছে! কয়েক মিনিট পরেই বুঝি জবাই করা হবে। আমাকে [ফাঁসির

www.pathagar.com

কাণ্ডে না ঝুলিয়ে ধারালো অস্ত্রদ্বারা এখানে মানুষকে জবাইও করা হয়]। দুনিয়ায় আমার জীবনাবসানের এটা হবে মহান প্রতীক। এখন কতল হতে চাই, কতল হতে। আল্লাহর রহমত ও সন্তুষ্টির দরিয়ায় হেলে-দুলে তাঁর হুযুরে হাযির হতে চাই। মহান স্বত্তার পানে ছুটে যেতে চাই, মিলিত হতে চাই তাঁর সাথে।

কিন্তু না। লোকটি আমাকে তুলে খাড়া করে। এরপর সিড়ি দিয়ে উপরে কোথাও নিয়ে যায় আমাকে। পট্টির নীচ দিয়ে যেটুকু আলো দেখা যাচ্ছিলো, তাদিয়ে উঁকি মেরে স্থানটা চেনার চেষ্টা করি। আমাকে এক স্থানে দাঁড় করানো হয়। সিঁড়ি শেষ হওয়ার পর শুরু হয় পাথরের তৈরী একটা গলি। এরপর আমাকে বলা হয় সামনে এগুতে। এবার মনে কিছুটা ভীতির সঞ্চার হয়। গলির ভেতর অনেক দূর চলি। এরপর হুকুম দেয়া হয় দাঁড়াবার। পট্টির সংকীর্ণ ফাক দিয়ে নযর পড়ে পায়ের দিকে। দেখি এক গভীর গুহার একেবারে প্রান্তে দাঁড়িয়ে আছি। এখন সামান্য একটা ধাক্কাই এতে ফেলার জন্য যথেষ্ট। আমার ধারনায় এ গুহার কোন কূল-কিনারা নেই। আমার গলায় জড়ানো হয়েছে ফাঁসির রজ্জু।

সামরিক অফিসার শাওফী আমার দিকে এগিয়ে এসে বললেন, জীবনে শেষ যে দোয়াটি পাঠ করতে চাও, করতে পার। কারণ, শেষ মুহূর্ত উপস্থিত। আমি বিনয়বনত চিত্তে আল্লাহর দরবারে দোয়া করি; পরওয়ারদেগার! আমার জীবনের পাপ-তাপ ক্ষমা করো। তোমার এ নালায়েক বান্দা এখন তোমার দরবারে হাযির হচ্ছে। জীবনে যতো অপরাধ হয়েছে আমার দ্বারা সবই মনে পড়ে। গুনাহের কথা স্মরণ করে মনে ভীষণ দুঃখ ও লজ্জা বোধ করি। কিছুটা অবকাশ পেলে তা থেকে বিরত হতাম। প্রায়শ্চিত্ত দিতাম। দয়াময় মেহেরবান খোদা আমার কাম্য। [একবার কারাগারে অবস্থান কালে শুনেছি যে, ১৯৬৮ সালে বিমান দুর্ঘটনায় এছাম শাওফী নিহত হয়েছে]।

আমার গলার ঢিলা রজ্জুতে সটকা টান মারা হয়। আমার পায়ের নিচেই গভীর আঁধার গর্ত। দূরে কোথাও চাবুক বর্ষণের শব্দ কানে ভেসে আসছে। সাথে প্রাণ ফাটা চিৎকার। আর্তনাদ। আমার আশ-পাশের পরিবেশ প্রকাশিত কিন্তু এসব কিছুই আমার মনে কোন ভয়-ভীতির সৃষ্টি কর-

www.pathagar.com

মার-পিটের প্রথম গরম গরম ডোজ, নেওয়ার পর আমার শরীরের সমস্ত জোড়া আলাদা হয়ে যায়। আমি হয়ে পড়ি আধামরা। তারা রশি খোলে চরকা থেকে নিচে নামায় আমাকে। অতঃপর ডান্ডা দিয়ে পিটিয়ে ঠান্ডা করতে করতে নির্দেশ দেয় দু'পায়ে লাফাবার জন্য। যাতে পা ফুলে না যায়। পুজ জমতে না পারে। আমার প্রতি দয়া পরবশ হয়ে এ নির্দেশ দেয়নি। আরও পিটুনী খাওয়ার শক্তি যাতে হারিয়ে না ফেলি, সেজন্য এ নির্দেশ।

আমার পায়ের গোড়ালি ফুলে গেছে। দাঁড়াতে পারিনা। কিন্তু এরপরও পষাণ গলেনি। থামেনি পিটুনীর পালা। আরও তীব্র হয়েছে লাথি আর ঘুঁষি। আমি অতি কষ্টে দাঁড়াই। মেজর গলাফাটা চিৎকার দিয়ে বলে জোরে হাটার জন্য। হাটতে গিয়ে মনে হচ্ছিলো, যেন পেরেক গাথা তক্তার উপর দিয়ে চলছি। ব্যাথায় কাতর হয়ে চিৎকার দিয়ে মাটিতে পড়ে গেলাম। প্রথম দিন আমাকে যে বেদনা দায়ক শাস্তি দেয়া হয়, এটা ছিলো তার অধ্যায়।

আবুজে'বল কারাগারে শাস্তি আর তদন্ত দু'টোই হয়ে উঠছে। আসলে দু'টো একই বস্তু, ভিন্ন নাম। এ কর্ম শুরুহতো দিনের ১১টার দিকে। আর অব্যাহত থাকতো মধ্যরাত পর্যন্ত। এরপর মেজর, লেফট্যানেন্ট কর্নেল ও কর্নেল সাহেবরা বলে যেতেন আমাদেরকে অন্য আযাবের ফেরেশতাদের হাতে ছেড়ে দিয়ে। এরা আমাদেরকে তৈয়ার করতো পরদিনের তদন্তের জন্য। পরদিন সকলে আবার ডিউটিতে হাযির হতো।

দু'দিন পর এ কর্মধারা স্বতন্ত্র রূপ নেয়। আমি ব্যারাকে ফিরে এসে দেখি, অনেক নূতন মুখ। আরও অনেককে ধরে আনা হয়েছে। যেখানে ত্রিশজনের বেশী লোকের স্থান সংকুলান হয়না। চাটাইতে উপুড় হয়ে পড়ে বলাম। এর আয়তন অনেক হ্রাস পেয়েছে। নানা শহর থেকে লোকধরে আনা হয়েছে। এদের যে দশা হয়েছে এবং এখনো হচ্ছে, তাতে এরা দিশে হারা, ব্যাকুল।

পরদিন আমাকে একই ধারায় নিয়ে যাওয়া হয় অজানা স্থানে। চিরাচরিত অভ্যাস অনুযায়ী এবার চাবুক আর কিল-ঘুঁষি দিয়ে তদন্তের সূচনা করেন। আমার চোখবন্ধ। কানে ভেসে আসছে চিৎকার আর চিৎকার। এখানে অস্বাভাবিক কিছু আছে, তা স্পষ্ট বুঝা যাচ্ছে। আমাকে যখন একদিকে নিয়ে যাওয়া হচ্ছিলো, তখন এক ব্যক্তি আমার কাঁধে প্রচন্ড ঘুঁষি মারে।

www.pathagar.com

আমি অবাক হলাম। ঘুষির জন্য নয়, বরং এজন্য যে, একজন অফিসার এ কাজ থেকে বারন করেছিলেন তা শুনে। আমি তখনো বুঝতে পারিনি, কেন অফিসার বারন করলেন, এ প্রথম বার বারন করার ঘটনা ঘটলো।

মৃত্যুদণ্ডের নির্দেশ

মেজর ফা-আইন এলেন, আওয়াজ থেকেই আমি তাকে চিনতে পেরেছি। বললেনঃ মিষ্টার রায়েফ, আমি দুঃখিত। তোমার সাথে এমনটি ঘটুক, আমি তা চাইনি। কিন্তু কি করবো। সসস্ত্র বাহিনীর জেনারেল হেড কোয়ার্টার থেকে এ নির্দেশ এসেছে।

ঃ কি বুঝাতে চান ?

মেজর ধমকের সুরে ঃ

ঃ আমাদের কাছে একটা তালিকা এসেছে। তাতে এমন কিছু নাম আছে··· ।

ক্ষণেক চুপ থেকে পুনরায় ।

ঃ আপনার কথা বুঝতে পারলামনা ।

ঃ তালিকায় এমন অনেক নাম আছে, যাদেরকে মৃত্যুদন্ড দেয়ার হুকুম এসেছে। তালিকায় ফিল্ড মার্শাল আব্দুল হাকীম আমের এর স্বাক্ষর আছে।

ঃ আপনার মতলব ?

ঃ যাদেরকে মৃত্যু দন্ড দেয়ার নির্দেশ এসেছে, তাদের মধ্যে তোমার নাম শীর্ষে রয়েছে।

ঃ এমনিতে মামলা ছাড়াই ?

ঃ মামলা বলতে কি বুঝ ? বিশ্বাস কর,

ঃ তাহলে ফাঁসির কাষ্টে কখন ঝুলতে হবে ?

ঃ এখন একটু পরেই ।

দূর থেকে দৌড়ে আসছে এমন লোকের পদধ্বনী কানে এলো। কাছে এসে হাফাঁতে হাফাঁতে বলে ঃ

ঃ যাদের সম্পর্কে মৃত্যুদন্ডের সিদ্ধান্ত হয়েছে, কোথায় তারা ?

মেজর ফা আইন আমার বাহু ধরে ঃ

ঃ আজ যে ৫০ জনকে ফাঁসির কাষ্টে ঝুলানো হবে, তাদের মধ্যে এর নাম শির্ষে।

www.pathagar.com

আমি কয়েকজন বন্ধুর সাথে মিলে সরকারের পতন ঘটানোর পরিকল্পনা করি। এই স্বীকারোক্তির পর আমার ধারণা ছিলো, এরা ২০ বছরের কম দন্ড দেবেনা। কারণ, ইন্টেলিজেন্সের বক্তব্য অনুযায়ী পরিকল্পনাটি ছিলো সম্পূর্ন প্রস্তুত। আমার গ্রেফতারীর ফলে পরিকল্পনাটি কার্যকর করা যায়নি।

গভীর রাত। সেপাইর পাহারাধীনে আমি আনন্দ চিত্তে কারাগারে ফিরে আসি। আমার ধারণা ছিলো, তদন্ত শেষ হয়েছে। এখন মামলা চলবে। এরপর আমাকে পাঠানো হবে রাজ বন্দীদের সাথে তররার কারাগারে। এসব খোশ খেয়াল আমার মনকে ব্যাকুল করছিলো।

হৃদয় বিদারক দৃশ্য

ব্যারাকে ফিরে গিয়ে দেখি, সকালে মানুষের যে সংখ্যা দেখে এসেছিলাম, এখন তা দিগুনের বেশী। কারাগারের খাঁচাসদৃশ্য আঙ্গিনার দিকে তাকিয়ে দেখি, অনেক আদম সন্তান ঠাঁসা, যাদের দেহে নেংটিও নেই। এদের মধ্যে এমন অসহায় ব্যক্তিও ছিলো, যারা চলছিলো কনুই আর হাঁটুতে ভরকরে হামাগুড়ি দিয়ে, আর লাঠিধারী এক ব্যক্তি তাদেরকে হাঁকিয়ে নিয়ে যাচ্ছিল। কিছু লোকের ছিলো চোখে পট্টি বাঁধা, সদ্যজাত শিশুর মতো উলঙ্গ। তারা দৌড়াচ্ছিলো মানে দৌড়াতে বাধ্যছিলো, দৌড়াতে দৌড়াতে সামনের দেয়ালের ভীষণ ধাক্কা খেয়ে নিজেরাই নিজেদের মাথা ফাটাচ্ছিলো। কেউ পড়ে উঠে আবার দৌড়াতো। এর একটা দৃশ্য ছিলো এরকম ঃ লোহার শলাকাধারী প্রাচীরের সাথে কিছু লোককে ঝুলিয়ে রাখা হয়েছে উলঙ্গ। যেন শূলিবিদ্ধ করা হয়েছে তাদেরকে। তাঁদের চোখবন্ধ। হে খোদা! এরা কি মানুষ? কোথায় গেছে মানবতা? আমি ব্যারাকের এক কোনে যেখানে স্থান পেয়েছি, গিয়েই ঘুমের কোলে ঢলে পড়ি।

তদন্ত কার্যক্রমের ফলশ্রুতিতে দেহ চুর্ন-বিচুর্ন। এ অবসন্ন অবস্থায় ভোর চোখ খুলছে। ব্যারাকের বন্ধুরা সকলে আমার কাছে ছুটে এসে অবস্থা জিজ্ঞেস করেন। কি ঘটেছে ; কি কি জিজ্ঞেস করেছে? তুমি কি জবাব দিলে? কোন কোন সরল মনা বন্ধু এ ও জিজ্ঞেস করে—আমরা সকলে কবে না গাহ ঘরে ফিরাহ? ব্যারাকে বন্দীছিল ঠাসা। তাদের সংখ্যা বেশী হওয়ার ফলে পরিস্থিতি দাঁড়িয়েছিলো অবর্ণনীয়। ঘিন ব্যবস্থাপকরা আমাদের খাবা-

www.pathagar.com

রের দিকে তেমন একটা নজর দেয়না, কয়েক ঘণ্টা বিলম্বে খাবার আনতো। আর তাতে যে গোস্ত থাকতো, নাক তার গন্ধ সইতে পারতোনা। সবচেয়ে মযবুত দাঁড়তও তা চিবাতে সক্ষম হতোনা। আমরা সাবান দিয়ে তা ধুয়ে নিতাম, যাতে দুর্গন্ধ কিছুটা হলেও দূর হয়। এরপর মুখে দিয়ে চুষতাম।

কালো দিনের কথা

সেই কালো দিনগুলোর কথা। সেপেটম্বর মাস। কিছু অপ্রাপ্ত বয়সের বালককেও কারাগারে আনা হয়। এরা সকলেই ছিলো তাবলীগ জামাতের সাথে সম্পৃক্ত। কারাগারের অবস্থা দেখে প্রতি মুহূর্তেই তাদের করুন দশা দাঁড়াতো। প্রিয় পাঠক একবার ভেবে দেখুন। ছোট ছোট বালক আর তাদের উপর যুলুম নির্যাতনের এ পাহার। গ্রেফতারকৃতদের মধ্যে বৃদ্ধ বয়স্কদের অবস্থা ছিলো আরও করুন। এরা এত বয়স্ক যে, চলাফেরা করাই অসম্ভব। তারা সবসময় কুরআন মজীদ তেলাওয়াত করতো আর দোয়া মুনাজাতে মশগুল থাকতো যে, আল্লাহ এ বাধ্যক্য তাদেরকে সৈরাচার ও শাস্তির দৈত্য থেকে নিরাপদ রাখুক। ব্যারাকের যাকেই তদন্তের জন্য ডাকা হতো, এসব বৃদ্ধ বুযুর্গরা তাদের জন্য সূরা এখলাছ পড়ে দোয়া করতেন। তাদের পাথুরে চোখ আর ভীত সন্ত্রস্ত চেহারা থেকে সব সময় উত্থিত হতো ব্যাথা-বেদনা আর দুঃখ-বিস্বাদের কালো ধোয়া। এদের অনেককে একবারও তদন্তের জন্য তলব করা হয়নি। নানা সংগঠনের সাথে ছিলো এদের সম্পর্ক। এদের কোন রাজনৈতিক চেতনা ছিলোনা, ছিলনা এ ব্যাপারে কোন সংলাপ-সংশ্রব। তাদেরকে এখানে কেন আনা হয়েছে—এটা ভেবে তারা চিন্তিত হতেন। কেবল ভয়-ভীতি-সন্ত্রাস পর্যন্তই ব্যাপারটা সীমাবদ্ধ ছিলনা, বরং ছিলো এর চেয়ে নাজুক এবং কঠিন। চিন্তার বিভিন্নতা আর দর্শন মতবাদের অনৈক্যের ফলেও ভয়-ক্ষুধা এবং বিভীশিকা এসব বুযুর্গকে ঐক্যসূত্রে আবদ্ধ করে রেখেছিলো। এক দীর্ঘ স্থায়ী এবং পবিত্র সম্পর্কে সম্পৃক্ত হয়ে তাঁরা এক প্রাণে পরিণত হয়েছিল।

www.pathagar.com

ছেনা। আমার মনে কেবল একটাই চিন্তা। নিজ প্রতীকে আল্লাহর দরবারে উপস্থিত, আর তার নিকট ক্ষমার নির্দেশ।

—যে ধারায় প্রাণ যায়, তা থাকে চির অম্লান
জীবনতো আসে যায়, থাকেনা চিরদিন।

মায়ের কথা মনে পড়ে, বন্ধু-বান্ধবের কথা মনে পড়ে, মনে পড়ে আমার সাথে সম্পৃক্ত সকলের কথা। এরপর আকাশের দিক থেকে প্রবাহিত হয় মৃদুমন্দ শান্ত বায়ু। এ বায়ু প্রবাহ আমাকে সম্পূর্ণ রূপে আচ্ছন্ন করে ফেলে। আত্মহারা অবস্থায় আমার মুখে উচ্চারিত হয় দোয়া ইস্তিগফার। এ অবস্থায় দীর্ঘক্ষণ বুদ হয়ে দাঁড়িয়ে ছিলাম। আমার কল্পনা রাজ্যে অনেক চেহারার আনাগোনা। নানা স্থানে, নানা রঙ্গের। আমি অনুভব করলাম, পা আমাকে ধরে রাখার ক্ষমতা হারিয়ে ফেলেছে। গলার ফাঁস বেশ কষে বাঁধা। ওদিকে মানুষের আর্ত চিৎকার আর চাবুক মারার কষা কষা শব্দ ঘূর্নি বায়ুর মতো কানে বিঁধছিলো। পায়ের নিচে গভীর গর্ত আমার পানে চেয়ে আছে। একজন অফিসার নিকটে এসে হুংকার ছেড়ে বলে ঃ

ঃ গর্তে লাফিয়ে পড়।

ঃ আমাকে ধাক্কা দিয়ে ফেলতে পার। আমি নিজে লাফিয়ে পড়তে পারিনা।

ঃ অফিসার চিৎকার করে ঃ

ঃ আমি বলছি। লাফিয়ে পড়। ফিল্ড মার্শালের নির্দেশ।

তন্দ্রাভাব আমাকে আচ্ছন্ন করে। অচেতন মনে আমি সামনে পা বাড়াই। উপর থেকে নিচে গিয়ে পড়ি। আমার আর গর্তের মধ্যখানে মাত্র তিন গজ দূরত্ব। আসলে তা ছিলো একটা মামুলী গর্তমাত্র। আমার কল্পনা শক্তি তাকে একটা গভীর, অন্ধ এবং; প্রাণ সংহারক পরীক্ষা বলে আমার মনো-রাজ্যে অংকিত করেছে।

শ্রান্ত ক্লান্ত অবস্থায় আমাকে গর্ত থেকে তুলে নেয়া হয় একটা কক্ষে। এখানে আর্ত চিৎকার আরও বিকটের হয়। আমার চোখ থেকে পট্টি খুলে দেয়া হয়। আমি দেখি, মেজর ফা-আইন এবং ল্যাফটেন্যান্ট এছাম শাওফী আমার সামনে বসা। মেজর ফা-আইন বললে ঃ

ঃ তোমার কিসমত ভাল। ইন্টেলিজেন্স থেকে এমাত্র নির্দেশ এসেছে তোমার মৃত্যুদন্ড আপাতত মুলতবী করার জন্য। একটু পরই তারা এব্যা-পারে বিস্তারিত জানাবেন।

www.pathagar.com

পরিশেষে ক্ষণিকের তরে নিস্তব্ধতা বিরাজ করে। অতঃপর মেজর আমাকে বললেন :

: তোমার কাছে যেসব তথ্য আছে, আমাদেরকে সেসম্পর্কে অবহিত করতে পসন্দ করবে ?

: আমি মাথা নেড়ে বললাম—না।

: তোমার কি কোন কিছু আকাংখ্যা আছে ?

: আমি আবারও মাথা নেড়ে না বললাম।

তিনি আমাকে চেয়ার দিয়ে তাতে বসতে বললেন। আমার দিকে সিগারেট বাড়ায়ে দেন। নিজেই তাতে আগুন ধরান। আমিতো আঙ্গুলে কামড় দিয়ে বোকা হয়ে রলাম। একটু পরই আমার বিস্ময় কেটে যায়। আমার দিকে কাগজ- কলম ঠেলে দিয়ে বলেন :

: এখন তুমি স্বীকারোক্তি পত্র লিখবে।

: আমি তো অবাক ;

: কিসের স্বীকারোক্তি ?

: তিনি বললেন :

: আমি বলি, তুমি লিখ। তোমার অতীত কথার আলোকে এ বিবৃতি লিখাবে।

: আমি মনে মনে তাঁর এ প্রস্তাবের শুকরিয়া আদায় করি। এটাই কম কি যে, তিনি আমার আর অপমান থেকে আমাকে রক্ষা করেছেন।

মেজর কথা কেটে বললেন :

: মনে করবেনা যে, আমি কোন মিথ্যা কথা লিখবো, যা আমি করনি, আমি তৎক্ষণাত বললাম :

: মাফ করবেন মেজর সাব, মিথ্যা কথন কি কোন যুক্তিযুক্ত পন্থা ?

তিনি বললেন :

: ব্যাপার কেবল এতটুকুই যে, আমি তোমার বিক্ষিপ্ত কথা বিন্যস্ত করে সপষ্ট করে তুলে ধরতে চাই।

: এটা আমি অবশ্য মেনে নিতে পারি।

তিনি বলছিলেন, আমি লিখছিলাম। বড় সাইজের নয় পৃষ্টা পুরে ফেললাম। গোটা কাহিনীর সার সংক্ষেপ এই ;

www.pathagar.com

ষষ্ঠ দৃশ্য

শুরু হলো আবার তদন্ত

আবু জে'বল জেলের ব্যারাকে তিনদিন অতিক্রান্ত হয়েছে। আমার ধারণা ছিলো, বুঝি আমার তদন্ত সমাপ্ত হয়েগেছে। এসময় ব্যারাকের দরজা দিয়ে উঁকি মেরে শাস্তির রং-রূপ দেখে থাকি। শাস্তির ধরণ প্রত্যক্ষ করা শাস্তিতে নিমজ্জিত হওয়ার চেয়ে আমাকে বেশী ব্যথিত করে। ব্যারাকের দরজা ছিলো জেলের আঙ্গিনার দিকে। কারাগারের পরিভাষায় আঙ্গিনাকে বলা হয় মাদ-মাদা। উদুখল বা খল। যারা তদন্তের জন্য পালার অপেক্ষায় থাকতো বা যাদেরকে তদন্তের জন্য তৈয়ার করা হতো, তাদেরকে দিয়ে ভরা হতো আঙ্গিনা। সকলেই উলঙ্গ, যেমন সদ্য মাতৃগর্ভ থেকে এসেছে। অফিসাররা বিকেলে নিজ নিজ গৃহে চলে যেতেন। কিন্তু এদেরকে ঘুমাবার অনুমতি দিয়ে যেতেন না। পরদিন ভোরে আসতেন তদন্তের ব্যাপারে যে ত্রুটি রয়েগেছে, তা পুরো করার জন্য। অন্যান্য শাস্তির সাথে তাদেরকে রাত জাগার এ শাস্তি দেয়া হতো। রাত জাগাও কম শাস্তি নয়। এটা যে কত বড় শাস্তি একমাত্র ভুক্ত-ভুগীই তা বুঝতে পারে এটা কত বড় আযাব যে, মানুষকে কয়েক দিন পর্যন্ত ঘুমাতে দেয়া হয়না। এছাড়াও যালেম অফিসাররা তাদের দৈহিক এবং মানসিক শাস্তির জন্য আরও নানা উপায় অবলম্বন করতো। আমার দুভাগ্য যে, কিছুদিন পর আমিও এদের অন্তভুক্ত হই।

দেয়ালের দিকে মুখ করে তাদেরকে দাঁড় করানো হতো। চোখ বাঁধা। এ অবস্থায় কেটে যেতো ঘন্টার পর ঘন্ট। রাত কখন শেষ হয়েছে, দিন কখন শুরু হয়েছে—তা এরা জানতেই পেতোনা। চোখ থেকে পট্টিখোলার কথা কেউ চিন্তা করলে তার বিনাশ ছিলো অনিবার্য। সকলেই বুলন্দ আওয়াজে একটা বিশেষ বাক্যাংশ বার বার উচ্চারণ করতো। রাতের শুরু থেকে এ ধ্বনি শুরু হতো। সকালে হুকুম না আসা পর্যন্ত চলতো। এ বুলি আওড়াতে সে বিন্দুমাত্রও শৈথিল্য দেখাতে পারবেনা। এমন টি কেউ করলে তার জন্য রয়েছে আযাবে আলীম এত আগুন মাখা তুফান। অথবা বিশেষ

www.pathagar.com

কোন সংখ্যা শাত-আট-নয়—ঠিক করে দেয়া হতো এবং রাতভর জেগে চিৎকার করে তা আওড়াতে হতো। অবস্থা দেখে মনে হয়, এটা জেলখানা নয়, পাগলখানা। যারা এখানে পৌছে, তাদের জন্য কয়েক দিনের ঘুম এবং খাবার হারাম হয়ে যায়। সকাল থেকে সন্ধা পর্যন্ত এক গ্লাস পানি দেয়া হয়। বিশেষ প্রয়োজন মানে মল-মূত্র ত্যাগের দরকার হলে যেখানে থাকে সেখানেই তা সারাতে হয়। অনেককে খলের লৌহ শলাকার মাথায় ঘন্টার পর ঘন্টা বসিয়ে রাখা হয়। অনেক সময় অবসন্ন হয়ে নিচে পড়ে যায়। মাথা ফাটে, পা ভাঙ্গে বা অন্য কোন আঘাত পায়। যাকিছু ঘটুক কে তার পরওয়া করবে। কেন করবে?

মযলুমদেরকে নিয়ে উপহাস

কখনো কখনো কোন কোন অফিসার মযলুমদেরকে নিয়ে উপহাস করতো। তারা এ উদ্দেশ্যে এসে এদের পাশে কিছু সময় কাটাতো এবং কষ্ট দেয়ার যতো উপায় তাদের জানা আছে, সবই ব্যবহার করতো। তারা সকলকে এক দীর্ঘ সারীতে দাঁড় করাতো। একজনের পেছনে একজন। নিজে দাঁড়াতো সারীর শেষে। সারীর শেষ মাথায় দাঁড়ানো ব্যক্তিকে দু'হাতে সজোরে এক থাপ্পড় মারতো। তা রাতের আধাঁরে সৃষ্টি করতো এক গুঞ্জরন এরপর তাকে নির্দেশ দিতো তার সামনের লোককে তেমনি থাপ্পড় মারার। একের পর এক সারীর শেষ লোকটি পর্যন্ত এ ধারা চলতো। অফিসার ঘড়ির দিকে তাকিয়ে দেখতেন, কত স্বল্প সময়ে তাঁর এ নির্দেশ শেষ লোকটি পর্যন্ত পৌছে, তারা আলস্য করছে বলে ক্ষেপে যেতো। তাদেরকে শাসাতো। নানা প্রকার ভয় দেখাতো। তার দাবী হচ্ছে। স্বল্প সময়ে দ্রুত গতিতে একাজ সম্পন্ন করতে হবে। সকলের অনুভূতি আড়ষ্ট হয়ে যেতো। কিন্তু এরপরও দন্ড লাঘবের মোহে অফিসারকে খুশী করার চেষ্টা করতো। আর তাকে খুশী করার একমাত্র উপায় ছিলো আপন আপন সামনের লোককে সর্বশক্তি নিয়োগ করে এবং দ্রুত থাপ্পড় মারা। কিছুসময় পর কাজটি এক লজ্জাকর রূপ ধারণ করতো যে, তা দেখে মানবতা অশ্রু বর্ষণ করতো। অবশ্য অফিসার সাহেব আনন্দে অট্টহাসি হাসতেন।

আমার সারীতে যেসব অফিসার একেলা পরিচালনা করতেন তাদের মধ্যে একজন ছিলেন মেজর জা-আইন। এ ব্যাপারে তিনি ছিলেন আরও একধাপ

www.pathagar.com

অগ্রসর তিনি বন্দীদেরকে মখামোখি দু'সারীতে দাঁড় করান। এক সারীর বন্দীদেরকে নির্দেশ দেন অপর সারীর লোকদেরকে থাপ্পড় মারতে। সব-সারী পর্যায়ক্রমে এ নির্দেশ পালন করতো। মেজর দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখছি-লেন কে ক্লান্ত-শ্রান্ত হয়ে মাটিতে লুটে পড়ে। কয়েক ঘন্টা পর্যন্ত চলতো এখেলা। কেউ ক্লান্ত হয়ে মাটিতে লুটে পড়লে মেজর খিলখিল করে হাসতেন।

কিছু বন্দীরকে দেয়ালে ঝুলিয়ে রাখা হতো। তাদেকে প্রত্যেকের হাতে একখানা কাগজ। তার সাথে কি আচরণ করা হবে, তা লেখা থাকতো। মানে তার নাম, পায়খানায় যাওয়ার সময়' পানি পান করার সময় এমন কি তাকে কখন পেটানো হবে, তা-ও লিখা থাকতো এ কাগজে। পানি দেয়া হতো ২৪ ঘন্টায় মাত্র একবার এক গ্লাস মাত্র কিন্তু পেটানো হতো প্রতি দু'ঘন্টা অন্তর।

খল ও ডাণ্ডা

একদিন কাকডাকা ভোরে আমি খলে প্রবেশ করি। সেখানে প্রবেশ মাত্রই আমাকে ডান্ডাপেটা করা হয়। প্রায় দু'শ ডান্ডার বাড়ী খেতে হয়। এর-পর লোহার শলার উপর ঝুলানো হয়। এভাবে আমাকে দেড় ঘন্টা পর পর ডান্ডাপেটা করা হয়। একাধারে তিন দিন আমাকে লোহার শলায় ঝুলিয়ে রাখা হয়। আজও তা মনে পড়লে দেহ-মন কেঁপে উঠে, শরীরে জাগে শিহরণ। এদিনগুলো আমার কাছে কি-যে দুর্বিসহ ছিলো, তা ভাষায় ব্যক্ত করা কঠিন। এঘটনা আজও আমাকে খোদার কথা স্মরণ করিয়ে দেয়, মনে সৃষ্টি করে পরকালের ভয়। আমার পাশেই ঝুলানো হয় এক ডাক্তারকে। শুনেছি তিনি চিরতরে মিশর ছেড়ে চলে গেছেন। তাঁর অবস্থা ছিলো আমার চেয়েও শোচনীয়। কিন্তু তারপরও তিনি আমার জন্য দুঃখ করেন। আমাকে পরামর্শ দেন হৃদ রোগের রুগী সাজতে। কিভাবে এটা করতে হবে, তিনি আমাকে তাও বাতলে দেন। আমি তা রপ্ত করে রাখি। বর্তমানের চেয়েও লাজুক কোন পরিস্থিতির উদ্ভব হলে এ কৌশল প্রয়োগ করবো ঠিক করি। প্রশ্ন উঠতে পারে, এসব নর পিশাসরা হৃদ রোগে আক্রান্ত ব্যক্তির প্রতি বিশেষ কোন রেয়ায়াত করে। হাঁ, করে বৈ কি! অনুসন্ধান কার্য সমাপ্ত করা পর্যন্ত বাঁচিয়ে রাখতে নিজেদের গরজে। তাদের প্রয়োজনীয় তথ্য সংগ্রহের লোভে আমাদেরকে কিছুসময় বাঁচিয়ে রাখতে তারা আগ্রহী বটে।

www.pathagar.com

সঙ্গীন মুহূর্তে উপস্থিত হয়। মেজর ফা-আইন এর নেতৃত্বে আমার উপর শুরু হয় ডান্ডা বর্ষণ। প্রচন্ড পিটুনী যন্ত্রনায় ছটফট করে আমি পাগলের মত বকতে শুরু করি। চিৎকার দিয়ে বলিঃ আমি হৃদ রোগে আক্রান্ত। এটা শুনে পিটুনী থামে। আমি আগেই বলেছি, তথ্য সংগ্রহ না করে এরা আমাদেরকে মরতে দিতেও রাজি নয়। জেল খানার বদমাশ ডাক্তার আসে। সে আমাকে বুক ব্যথার ঔষধ দেয় এবং বিশ্রাম নিতে বলে। দেয়ালের পাশে সারা রাত জেগে বসে থাকা ছিলো আমার বিশ্রাম। এ বিশ্রাম আমি গ্রহণ করি। কিন্তু ঘুমাবার অনুমতি দেয়া হয়না। এটাছিলো বড় কঠিন রজনী। চারিদিক থেকে ঘুমের হামলা। তা রোধ করার শাস্তি চাবুকের ঘা আর আগুনে দাগানোর চেয়েও কঠোর দিন আমার কাছে। ভুক্ত-ভূগী ছাড়া এটা বুঝবেনা।

নূতন বিপদ

সকাল হয়েছে। আমাদের উপর এসেছে আর এক নূতন বিপদ। আমাদেরকে নির্দেশ দেয়া হয় উপুর হয়ে শুয়ে আকাশের দিকে পা প্রশারিত করতে। আমাদেরকে বলা হয় সারীবদ্ধ হয়ে শুয়ে পড়তে। ব্রিগেডিয়ার এ, আর, আমাদেরকে পরিদর্শন করবেন। ব্রিগেডিয়ার হাযির। তাঁর আরদালীর মধ্যে ছিলো তিনজন হৃষ্ট-পুষ্ট সেপাই। নূতন নির্দেশ অনুযায়ী আমরা পট্টির উপর জ্যাকেট পরেছি, যাতে চেহারায় কোন আঘাত দেখা না যায়। ব্রিগেডিয়ার সারীর এক প্রান্ত থেকে পরিদর্শন শুরু করে। এক একজনের কাছে গিয়ে নাম জিজ্ঞেস করে। সকলের নামই কেবল তাঁর মুখস্ত ছিলনা, বরং অনুসন্ধানযোগ্য বিষয় সম্পর্কেও অবহিত ছিলো। নাম জিজ্ঞেস করার পর সংশ্লিষ্ট বিষয় সম্পর্কেও প্রশ্ন করতো। জবাবে সন্তুষ্ট না হলে সেপাইকে ছোট করে বলে দেয় ত্রিশ, পঞ্চাশ কোন কোন ক্ষেত্রে একশ ঘা চাবুক মারতে। এর অর্থ হচ্ছে এর চেয়ে কম ঘা চাবুক মারা যাবেনা এ ব্যক্তিকে। এদের ত্রিশ ঘা ছিলো ৫০ এর সমান, আর ৫০ ঘা আশি ঘার সমান। যে ব্যাক্তি সারীর শেষ প্রান্তে ছিলো, ব্রিগেডিয়ার সেখানে না পেঁছা পর্যন্ত পা উপরে তুলে রাখতে হবে। কেউ নিরুপায় হয়ে পা নামিয়ে নিলে তার অবস্থা কাহিল। এরা তার বারোটা বাজিয়ে ছাড়তো।

www.pathagar.com

প্রত্যুষে এভাবে লোহার শাস্তি নৈমিত্তিক ব্যাপারে পরিণত হয়। এ ধারা অব্যাহত থাকতো দু'আড়াই ঘণ্টা। এদের রাতও কাটতো ভীষণ অত্যাচারের ভেতর দিয়ে। এর ফলে দেশের সমস্ত শক্তি পানি হয়ে যেতো। বাধ্যতা মূলক ব্যায়াম, ডান্ডার আঘাত বা লোহার শলায় ঝুলে রাত কাটাতে হতো তাদেরকে। সারারাত এ অবস্থায় কাটিয়ে পা হয়ে পড়তো দেহ থেকে বিচ্ছিন্ন প্রায়। এরপর শুরু হতো সকালের নিত্যকার পালা। এ পালা শেষ করে সকলকে লোহার শলায় ঝুলার জন্য দেয়ালে আরোহণ করতে হতো। নিজ নিজ স্থানে আরোহণ করে অপেক্ষা করতো অফিসার এসে তদন্ত শুরু করার।

লাইটার দিয়ে দাগানোর শাস্তি

রাতের বেলা মেজর ফা-আইন আবার আসে। দুর্ভাগ্য আমার। সে আমার সামনে এসে দাঁড়ায়। আমাকে কাপড় পরা দেখে ক্রুদ্ধ হয়। কর্তব্য-রত সেপাইকে ডেকে জঘণ্য গালি দিয়ে বলে: কোন্ হতভাগা একে কাপড় পরার অনুমতি দিয়েছে। সেপাই বলে, হৃদ রোগে আক্রান্ত। ডাক্তারের নির্দেশ অনুযায়ী তাকে এ সুযোগ দেয়া হয়েছে। মেজর ডাক্তারকেও ভীষণ গালি দেয়। আমাকে দেয়াল থেকে নামিয়ে সমস্ত কাপড় খুলে নেয়া হয় এবং আমাকে বেশ গরম ধোলাই দেয়া হয়। এরপর আবার হুকুম হয় দেয়ালে গিয়ে বসার, মেজর আবার আমার কাছে আসে। তার চোখে-মুখে আগুন। হাতে জ্বলন্ত লাইটার। তাকে আমার দিকে অগ্রসর হতে দেখেই আমার অবস্থা কাহিল। আমি ভাবি, এ জ্বলন্ত আগুন আমার দেহে রাখলে নির্ঘাত আমি মারা পড়বো। কিন্তু না, কিছুতেই কিছু হলোনা। সে লাইটার দিয়ে আমার দেহের বিভিন্ন অংশ জ্বালিয়ে দেয়। আমার ভীষণ কষ্ট হয়। অবর্ণণীয় কষ্ট। পঁচা চামড়ার গন্ধ আমার নাকেও আসে। কিন্তু তাসত্ত্বেও আমার মৃত্যু হয়নি। মেজর জুড়ে দেয় ফালতু কথা মালা। যার কোন শেষ নেই। তা ছিলো এ রকম:

: তুমি কি কিছু বলবেনা?

: কি ব্যাপারে?

: এবার আমি নির্দিষ্ট কথা শুনতে চাই।

www.pathagar.com

ঃ কোন্ নির্দিষ্ট কথা ?

ঃ ইয়াহইয়া হোসাইন সম্পর্কে কি জান ?

ঃ যা জানা ছিলো, আগেই বলেছি। আর কিছু বলার নেই।

ঃ সে ইখওয়ানের গোপেন সংগঠনের সদস্য ছিলো। তোমার জানা আছে ?

ঃ না।

ঃ তার সাথে তোমার শেষ দেখ কবে হয় !

ঃ কয়েক মাস আগে।

ঃ মানে সে সুদানে পলায়নের আগে তোমার সাথে দেখা করেনি ?

ঃ এমন কোন ঘটনা ঘটেনি।

ঃ তুমিও ইখওয়ানের সদস্য ?

ঃ না।

ঃ কেন সদস্য হওনি ?

ঃ এ প্রশ্নের জবাব বড় কঠিন।

ঃ খুলে বল।

ঃ আপনি কি মনে করেন, ইখওয়ানের সদস্য হওয়াই আমার উচিৎ ছিলো ?

ঃ আপনি যে সংগঠন বুঝতে চাচ্ছেন, তাতে অংশ নেয়ার দাওয়াত দেয়া হয়নি আমাকে

ঃ এ সত্ত্বেও তুমি তাদের অনেককে চেনো।

ঃ হাঁ। আমি তাদের অনেককে চিনি।

ঃ তুমি মিথ্যা বলছো।

ঃ তাহলে সত্য কি ?

ঃ সত্য এই যে, তুমি ইখওয়ান সংগঠনের সদস্য। এটা তোমাকে স্বীকার করতে হবে।

ঃ আমি বুঝতে পেরেছি।

ঃ তবে বল কি বলতে চাও।

ঃ আপনার সিদ্ধান্তের পর আর কি বলবো ? এটাইতো, আমি ইখওয়ান সংগঠনের সদস্য।

ঃ সংগঠনের নেতৃত্বের সাথেও সম্পর্ক আছে ?

ঃ বরং তুমি সংগঠনের অন্যতম নেতা ?

www.pathagar.com

o o o o o o o o o o o o o o o o o

ঃ কেন এ নীরবতা ?

ঃ বুঝেতে পারছিনা, কি বলবো?

ঃ তোমাকে বলতেই হবে। না হলে তোমার পরিণতি হবে মারাত্মক !

ঃ আমি একমত !

ঃ কোন্ বিষয়ে।

ঃ আমি সংগঠনের অন্যতম নেতা।

ঃ স্বীকারোক্তি লিখতে হবে। ঠিক আছে ?

ঃ আঘাত থেকে নাজাত দেয়া হবে—এ শর্তে।

ঃ আমরা একমত। মার-পিট থেকে তোমাকে নাজাত দিচ্ছি। এসো কি লিখবে ?

ঃ এই লিখবো যে, আমি ইখওয়ানুল মুসলেমুন দলের সদস্য।

ঃ এরপর।

ঃ এরপর লিখবো যে, আমি সংগঠনের অন্যতম নেতা ?

ঃ তাহলে ইখওয়ানের সংগঠন এবং নেতৃত্ব সম্পর্কে আমাদেরকে বিস্তারিত বলতে হবে।

ঃ মেজর সাহেব! এটা অসম্ভব। আপনি যা বলেছেন, আমি তার চেয়ে একটা শব্দও বেশী লিখবোনা। আপনি যা খুশী আমার সাথে করতে পারেন। যা কিছু বলেছি তার চেয়ে বেশী কিন্তু বলতে পারবোনা। ..... —বিশ্বাস করুন।

এরপর আমাকে কঠোর শাস্তির কলুতে জুড়ে দেয়া হয়। দুঃখ আর বিপদের পাহাড় ভেঙ্গে পড়ে আমার উপর। ১৯৬৫ সালের ৬ই সেপ্টেম্বর সাধারণ ধরপাকাড় এর নির্দেশের আগের এ ঘটনা। পাইকারী ধরপাকাড় এর নির্দেশের পর সব কিছুতেই পরিবর্তন হয়। কারণ, এ নির্দেশে স্পষ্ট বলে দেয়া হয় যে, যে সব ইখওয়ান কর্মীকে আগে (১৯৫৪ সালে) গ্রেফতার করা হয়েছে, তাদেরকে পুনরায় গ্রেফতার করা হোক। উপরন্তু স্বরাষ্ট্র মন্ত্রীকে এ ক্ষমতাও দেয়া হয়েছে যে, সন্দেহ ভাজন যে কোন ব্যক্তিকেই তিনি গ্রেফতারের নির্দেশ দিতে পারেন।

৩রা সেপ্টেম্বর ১৯৮৬ সালের কথা। পাইকারী ধরপাকাড়-এর নির্দেশের আগে আবুজে'বল কারাগারে এক দল লোককে ধরে আনা হয়। এদের

www.pathagar.com

মধ্যে আমার ভাইও ছিলো। কোন দলের সাথে তার কোন সম্পর্ক ছিলনা তখন পর্যন্ত। অবশ্য আমার এক বন্ধুর সাথে তার পরিচয় ছিলো। আমার ভাই কোন এক উপলক্ষে তাকে চিঠি লিখে। ইয়াহইয়া হোসাইনের সাথে আমার বন্ধুকেও গ্রেফতার করা হয়। তার কাছে লেখা চিঠির সূত্র ধরে আমার ভাইকেও গ্রেফতার করা হয়। এটাই ছিলো তাদের সাধারণ নিয়ম। গ্রেফতারকৃত ব্যক্তির কাছে পাওয়া কাগজ পত্রের সূত্র ধরে অনেককেই গ্রেফতার করা হয়। এসব কাগজ পত্র খালি দেয়া-নেয়া সম্পর্কে হলেও।

একটা কথা ইন্টেলিজেন্সের লোকদের কাছে আমি গোপন রাখি। কিন্তু আমার এক বন্ধু গ্রেফতারীর পর এটা প্রকাশ করে দেয়। কারাগারে সাক্ষাতের পরই আমি তাকে এ সম্পর্কে বলে দেই। কিন্তু আল্লাহ তাকে মাফ করুন, নির্যাতনের শিকার হয়ে জানা-অজানা সব কিছুই সে স্বীকার করে নেয়। ফলে সেপাইরা আমাকে ডেকে নিয়ে চরম নির্যাতন শুরু করে। দুনিয়া হয়ে পড়ে অন্ধকার। শুরু হয় কেয়ামতের ঘনঘটা।

রোজ হাশরের দৃশ্য

অবশেষে দেখা দেয় ৬ই সেপ্টেম্বর ১৯৬৫ সালের দিনটি। এ দিনটি রোজ হাশরের চেয়ে আপার। মিশর থেকে নূতন এক দল লোককে গ্রেফতার করে কারাগারে আনা হয়। এদের সংখ্যা ৯ জনের বেশী। এ সময় ক্ষমতার মূলে যে সব জীবন উৎসর্গ হয়েছে। তাদের বেশ কয়েক জন ছিলো এরা। সামরিক অফিসারের তরফ থেকে তাদেরকে বলা হয় একস্থানে জিনিস-পত্র রেখে দিতে। সকলে নির্দেশ মতো কাজ করে। এরপর হঠাৎ তাদের গায়ের কাপড় খুলে ফেলা হয়। শুরু হয় লাঠির বৃষ্টি বর্ষণ। গ্রাম থেকে ধরে আনা এসব হতভাগারা ছিলো সম্পূর্ণ উলঙ্গ। পিটুনীর তীব্রতায় তারা অস্থির হয়ে এদিক-ওদিক ছুটো-ছুটি করছিলো। যেমন করে খাঁচায় আটক ইঁদুর খাঁচা থেকে বেরুবার জন্য। এদের সংখ্যা ছিলো বেশী। তাই কারাগারের সংকীর্ণ আঙ্গিনায় ছুটা-ছুটি করারও তেমন সুযোগ ছিলোনা উপরন্তু আঙ্গিনার দৃশ্য তাদেরকে আরও হতচকিত করে তুলেছে। সে দৃশ্য ছিলো এইঃ কিছু হতভাগা বন্দী লোহার শলাকায় ঝুলছে। তাদের শরীরের নানা স্থান থেকে রক্ত ঝরছিলো। টপ টপ করে। অনেকের

www.pathagar.com

দেহের আঘাত থেকে দুর্গন্ধ ভেসে আসছে। ভয়ে-ত্রাসে হতবিহ্বল হয়ে এরা পাগল হয়ে নীচে পড়ছিলো! চারিদিক থেকে কানে ভেসে আসছিলো কেবল চিৎকার-আর্তনাদ। আমরা যারা আগে থেকে লৌহশলাকায় ঝুলছিলাম, তাদের ভয় অনেক আগেই দূর হয়ে গেছে। এখন জল্লাদ দেখেও আমাদের আর ভয় হতোনা অনেক চেষ্টা করেও মন থেকে যে জিনিসটি দূর করতে পারিনি, তাহচ্ছে আতংক!

আমি মনকে অনেক বুঝাবার চেষ্টা করি যে, মূলতঃ আতংক হচ্ছে মানুষের মস্তিষ্কে একটা অনুভূতি বা ধারণার নাম। এর চেয়ে বেশী কিছু নয়। অপর কোন দৃঢ়-উন্নত অনুভূতি দ্বারা এ অনুভূতির ওপর আধিপত্য বিস্তার করা সম্ভব। এর ফলে আতংকের অনুভূতি লোপ পাবে। তার স্থান গ্রহণ করবে আর এক অনুভূতি। যখন আমাকে শাস্তির চরকায় ঝুলানো হয়, তখন আমি মনে মনে এসব দার্শনিক চিন্তা করতাম। এ যেন দর্শনকে মনে বদ্ধমূল করে নিতাম। কিন্তু শাস্তির এক ঝটকায় আমার সব দর্শন উড়েযেতো। আবুজে'বল কারাগারে শাস্তির সূচনা হতো অধিকন্তু মানসিক ভাবে। যেমন, শুরুতেই সম্পূর্ণ উলঙ্গ করা হতো, যাতে নিজের দৃষ্টিতেই মানুষ মূল্যহীন হয়ে যায়, এরপর তাকে নানা ভাবে অপদস্ত করা হতো। এটা তার মনে এক ভয়ংকর তোলপাড় সৃষ্ট করতো। এরপর শুরু হতো নির্মম নিষ্ঠুর পিটুনী। ক্ষুধা-পিপাসায় কাতর করা হতো। দাগানো হতো আগুন দিয়ে।

আবুজে'বল কারাগারের ইন্টেলিজেন্স এবং সামরিক কারাগারের ক্রিমিন্যাল মিলিটারী ইন্টেলিজেন্স এর মধ্যে কিছু পার্থক্য আছে। শাস্তি দেয়ার ক্ষেত্রে প্রথমটি দক্ষ। আর পাষাণ চিত্ততার ক্ষেত্রে দ্বিতীয়টি অপ্রতিদ্বন্দ্বী। সিভিল ইন্টেলিজেন্স কারাগারের তুলনায় মিলিটারী ইন্টেলিজেন্স কারাগারে নিহতদের সংখ্যা অনেক বেশী এতে বিস্মিত হওয়ার কিছু নেই।

উপরে আমি আলোচনা করলাম যে, এক বন্ধু আমার গোপন তথ্য ফাঁস করে দিয়েছে। বিষাদের বছর অর্থাৎ ১৯৬৫ সালের এপ্রিল-মে মাসে আলোচনা এবং সামষ্ঠিক পাঠে তার সাথে আমার বিকেল বেলার সময় কাটে। ইন্টেলিজেন্সের কাছে যে তথ্যটি আমি গোপন রাখার চেষ্টা করছিলাম, তা ছিল এইঃ আমরা নিছক দ্বীনী এবং একাডেমিক প্রশিক্ষণের একটা কর্মসূচী গ্রহণ করেছিলাম। আমরা ইসলাম সম্পর্কে সামষ্ঠিক পাঠের ব্যবস্থা

www.pathagar.com

করি। কোন কোন বন্ধু এ সম্পর্কে নিবন্ধ রচনা করে বৈঠকে তা পড়ে শুনাতো, আমাদের এ বন্ধুর কর্মসূচী শুরুও হয়ে ছিলো সুন্দর ভাবে। অধ্যয়ন আর গবেষণার উদ্দেশ্যে আমরা মিলিত হতাম। এ কর্মসূচীর মাধ্যমে আমাদের চিন্তাধারা এবং মন-মানসের পরিশুদ্ধী হতো। এ কর্ম-সূচীর সূচনাতেই চারিদিকে ধর-পাকাড় শুরু হয় ব্যাপকভাবে। আমরা নিছক জ্ঞান চর্চা এবং নিজেদের মন-মানসের পরিশুদ্ধীর নিমিত্ত এ কর্মসূচী শুরু করেছিলাম—ইন্টেলিজেন্স এটা কিছুতেই বিশ্বাস করতোনা। তাই অনেক চিন্তা করে আমি বিষয়টি গোপন রাখি তাদের কাছে। কিন্তু আমার বন্ধুটি গ্রেফতার হলে কারাগারে এসে তদন্ত অফিসারদের কাছে অত্যন্ত সরল মনে আমাদের এ কর্মসূচী এবং বৈঠকের কথা বলে ফেলে। আর যায় কোথায়। তারা ধরে নেয় যে, সরকারকে ক্ষমতাচ্যুত করার মতলবেই ছিলো আমাদের এসব বৈঠক।

মিশরে জন-নিরাপত্তার সকল সংস্থা এ ধারণায় নিমজ্জিত ছিলো যে, গোটা জাতিই জামাল নাসের সরকারকে গদীচ্যুত করার ষড়যন্ত্রে লিপ্ত। নির্যা-তন সহ্য করতে না পেরে আমার বন্ধুটিও আমাদের বৈঠককে এ ষড়যন্ত্রের অংশ বলে স্বীকার করে নেয়। কিন্তু এ ষড়যন্ত্রটি স্পষ্ট করার জন্য একটি চমকপদ কাহিনী রচনা করা প্রয়োজন। আমরা দায়ে পড়ে অনেক কিছু স্বীকার কর-লেও তা দিয়েতো একটা কাহিনী রচনা করা যায়না। মেজর ফা আইনের কাছে তার ইচ্ছে অনুযায়ী আমি যে বিবৃতি লিখে দিয়েছি, তাও ছিলো অস-ঙ্গতিপূর্ণ। যদিও তাতে আমি নিজ হাতে স্বাক্ষর করেছি। আমি মেজর ফা-আইনকে বললাম, যেকোন নূতন কথা আমাকে দিয়ে স্বীকার করিয়ে নিতে পারেন। আমি নিজ হাতে তাতে স্বাক্ষরও করবো। কিন্তু এজন্য আগের বিবৃতিই যথেষ্ট নয়। মেজর রাগে চিৎকার করে বলেঃ বে কুত্তার বাচ্চা! আমরা কি বিবৃতি রদ-বদল করি? আমরা আসল সত্য উদঘাটন করতে চাই। অতঃপর শাস্তির সামনে নিজেকে সঁপে দেয়া ছাড়া আর কোন গত্যা-ন্তর ছিলনা আমার জন্য। শুরু হলো রকমারী নির্যাতনের পালা। আমার দেহের বিভিন্ন স্থান জ্বলন্ত সিগেরেটের আগুনে পুড়ে ফেলা হয়। মুখে সিগেরেটের আগুনের পুড়া দাগ দীর্ঘ দিনেও মুছেনি।

আমার এক বন্ধুকে গ্রেফতার করে আনা হয়। আমার এ বন্ধুটি ছিলো অতি ভীরু। সামান্য ব্যাপারেই তার বুক কাঁপতো। কথিত ষড়যন্ত্রের

www.pathagar.com

কাহিনী প্রণয়নে আমার এ বন্ধুটিও সাহায্য করে। আর ব্যাপারতো তাই। এদের সামনে নিজেকে নির্দোষি প্রমাণ করা অর্থহীন। তাই মুক্তির আশায় মিথ্যা কথনে দক্ষতা দেখানোই ছিলো আমার কর্তব্য। অর্থাৎ আমরা ষড়যন্ত্রে জরীত—কেবল এটুকু স্বীকার করাই যথেষ্ট নয়। বরং এজন্য প্রয়োজন একটা পুর্বাপর কাহিনী রচনার। নিজের সাফাই পেশ করতে গিয়ে অনেককেই জীবন বিসর্জন দিতে হয়েছে।

কৃষ্ণ যুগের কথা

তোমার মৃত্যু ঘনিয়ে এসেছে, এতে কোন সন্দেহ নেই। কিন্তু মৃত্যুর আগে তোমাকে কিছু একটা বলে যেতে হবে—তদন্তকারী অফিসার একথাগুলো উচ্চারণ করতো। আমি আগেই উল্লেখ করেছি যে, জন-নিরাপত্তা বিধায়ক সংস্থাগুলো মনে করতো, গোটা জাতি নাসের সরকারের পতনের অবসানের ষড়যন্ত্রে লিপ্ত। এসব সংস্থায় নিয়োজিত ব্যক্তিরা নিজেদের যোগ্যতা প্রমাণ করার জন্যও সরকারকে এমন ধারণা দেয়। কিন্তু দেশের অবস্থা যদি স্বাভাবিক হবে তাহলে এসব সংস্থা কি দরকার। এপ্রশ্ন কেবল আমাদেরই নয়, বরং অনেক ঐতিহাসিক এবং রাষ্ট্রবিজ্ঞানীরও। কেন মোটা বেতন দিয়ে এসব প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তাদেরকে পোষা হয়? সিভিল ইন্টেলিজেন্স মিলিটারী ইন্টেলিজেন্স, গন তদন্ত সংস্থা, সামরিক তদন্ত সংস্থা, প্রেসিডেন্টের গোপন বাহিনী, তথ্য ব্যুরো, প্রেসিডেন্টের রক্ষীবাহিনী এবং আরোও কতো কি। এসব সংস্থার দু'এক জন গোয়েন্দা দেশের আনাচে-কানাচে, শহরে-বন্দরে এবং সরকারী বেসরকারী দফতরে অবশ্য পাওয়া যায়। মোট কথা এসব সংস্থার কর্মী সংখ্যা হয়তো সাধারণ নাগরিকের চেয়ে কম নয়। এ হচ্ছে কৃষ্ণ যুগের কথা। সে যুগ বিগত হয়েছে। আর কখনো ফিরে আসবেনা সে যুগ। ইনশাআল্লাহ।

আবু জে'বল কারাগারে আমি ১৭ দিন ছিলাম। ২৮শে আগষ্ট ১৯৬৫ তারিখে সেখানে প্রবেশ করি, আর বের হই ১৩ই সেপ্টেম্বর। এসময় এক মুহূর্তের জন্যও আমি শান্তি পাইনি, অবাক হওয়ার মতো অনেক ঘটনাই এখানে চোখে পড়ে। দু'একটি এখানে আলোচনা করছি।

এক ব্যক্তিকে ধরে আনা হয়। তদন্তকালে তার পকেট থেকে উদ্ধার করা হয় ১১ জনের একটা তালিকা। স্বাভাবিক ভাবে এদেরকেও গ্রেফতার করা হয়।

www.pathagar.com

কি জন্যে গ্রেফতার করা হয়েছে, সে সম্পর্কে এসব হতভাগারা কিছুই জানেনা। এরা সকলেই ছাত্র। সবচেয়ে বড় যে, তার বয়স ২০ বছরের বেশী নয়। এ দেশে ইন্টেলিজেন্স কর্মকর্তাদের সন্দেহ আরও ঘনীভূত হয়। কারণে অকারণে এদেরকে ব্যবহার করা হয় সরকারকে গদীচ্যুত করার কাজে। এক নাগাড়ে তিন দিন এদেরকে নির্মম নিষ্ঠুরভাবে পেটানো হয়। সরকারের বিরুদ্ধে বিপ্লব করার কথা স্বীকার করবার চেষ্টা করা হয়। কিন্তু তাতেও কোন ফল না হওয়ায় অবশেষে পুলিশ অফিসার বাধ্য হয়ে যার পকেট থেকে এদের নামের তালিকা উদ্ধার করা হয়েছে তাকে জিজ্ঞেস করে। খোজখবর নিয়ে জানা যায় যে, পাড়ার ক্লাবে একটা ফুটবল টিম গঠনের জন্য ১১ জনের একটা তালিকা তৈয়ার করা হয়েছিলো। শেষ পর্যন্ত গোটা ব্যাপারটা ছিলো হাস্যসপদ।

এমন হাস্যকর ঘটনাও ঘটেছে যে, গোপন পুলিশ আবিস্কার করে যে' একদিন এক কফি হাউসে দু'ব্যক্তির মধ্যে বিশেষ কোন কথা' হয়েছে। এ বিশেষ কথাটা কি ছিলো, তা উদ্ধার করার জন্য তারা এমনসব লোককে গ্রেফতার করে, কফি হাউসে যারা নিয়মিত যাতায়াত করতো। আর অনুসন্ধান ও তদন্ত বলতে কি বুঝায় তাতো আমি বারবার উল্লেখ করেছি—অর্থাৎ পাইকারী ধোলাই আর মেরামত!

মর্মবিদারী দৃশ্য

এর চেয়েও বিস্ময়কর এবং মর্মবিদারী দৃশ্য চোখে পড়েছে এ আবু জে'বল জেলখানায়। পুত্র পিতাকে চাবুক মারছে। পিতা-পুত্র উভয়েই চিৎকার করছে। এ দৃশ্য দেখে দস্তয় ভস্কির নাটকের কথা মনে পড়ে। এক রাতের কথা কিছুতেই বিস্মৃত হওয়া যায়না। সে রাত গোটা জেলখানা ছিলো বন্দীতে ভরা। পুলিশ সকলকে নির্দেশ দেয় চোখ বেঁধে নিতে। একটু পর পুনরায় এ নির্দেশ জারী হয় এবং ডান্ডা পেটা করে তা কার্যকর করা হয়। সব ব্যারাকের লোকদেরকে বলা হয় একস্থানে জড়ো হতে। পাঠকের নিশ্চয়ই স্মরণ আছে যে, কারাগারটি হচ্ছে তিন তলা। কাজেই সকলের একস্থানে জড়ো হতে সময় লাগার কথা। উপরন্তু সকলকে নির্দেশ দেয়া হয়েছে হাতে এবং পায়ে ভর করে নীচে নামতে পশুর মতো। 'এবং মুখে বকরীর ডাক দিতে। উপর থেকে নিচে নামার ব্যাপারে কোন নিয়ম শৃংখলা ছিলোনা।

www.pathagar.com

সকলেই নামছিলো দ্রুত গতিতে। সকলেই নবজাত শিশুর মতো সম্পূর্ণ উলঙ্গ। কারো দেহে এক টুকরা কাপড় নেই। তাদের চোখে পট্টি বাঁধা। ডাণ্ডার আঘাত আর লাঞ্ছনা-গঞ্জনার পরিবেশে নগ্ন মানুষের দল নামছিলো নীচে সিঁড়ি দিয়ে। সে কি এক করুন-মর্মান্তিক দৃশ্য

খলের পুরো আয়তন লোকে লোকারণ্য। কোথাও তিল ধারনের স্থান নেই। সকলকে নিয়ন্ত্রণে আনার জন্য পুলিশের সংখ্যা যথেষ্ট ছিলনা। সকলকে পৃথক পৃথক ভাবে কোড়া মারার হুকুম। কিন্তু এতো পুলিশতো নেই সেখানে। তাই কারাগারের অন্যান্য স্টাফের সাহায্য নেয়া হয়। সিভিল স্টাফ ছাড়া মেডিক্যাল স্টাফকেও কাজে লাগানো হয়। রন্ধন শালায় নিয়োজিত ব্যক্তিদেরকেও কাজে লাগানো হয়। সকলকে পৈশাচিক ভাবে কোড়া মারা হয়। বৃদ্ধ-রুগ্ন-আহত পীড়িত, শিশু, কাউকেই বাদ দেয়া হয়না। আমরা শুনেছি যে, জন নেতার পক্ষ থেকে সবলকে কোড়া মারার এ নির্দেশ এসেছে। এদিন এক হাজারেরও বেশী লোকের পিঠে চাবুক মারা হয়। এরা হচ্ছে এমন লোক, যাদের মুখে সর্বদা আল্লাহর তাসবীহ এবং হামদ জারী থাকে।

وما نقموا منهم الا ان يؤمنوا بالله العزيز الحميد

—তারা মহা পরাক্রমশালী প্রশংসার মালিক আল্লাহর প্রতি ঈমান এনেছিল এটারই প্রতিশোধ নিচ্ছিলো ওরা এদের কাছ থেকে। সকলের চোখ বাঁধা। চাবুকের কঠোর আঘাতে সকলেই অস্থির হয়ে ছটফট করে। রাতের ঘুটঘুটে অন্ধকার ছেয়ে গেছে চারিদিকে শুরু হয় আহাজারী আর আর্ত চিৎকার। কিন্তু তাদের সাহয্যে এগিয়ে আসার মতো কেউ ছিলোনা। ১৯৬৬ সালের সেপ্টেম্বরের প্রথমার্ধে আবুজে'বল কারাগারে যারা ছিলো, তারা মানবতা বিরোধী ঘটনার প্রত্যক্ষদর্শী এবং ভুক্তভোগী। এদের অনেকেই এখনো বেঁচে আছেন। সে পুলিশ অফিসারের কথাও আমি ভুলতে পারিনা, যে সবেমাত্র চাকুরীতে যোগ দিয়ে ছিলো এবং শাস্তির হৃদয় বিদারক দৃশ্য দেখে কারাগারের ভেতর এক কোনে বসে বসে নীরবে অশ্রুবিসর্জন দিতো। এই কারাগারে আমার থেকে মাত্র কয়েক মিটার দূরে একজন বন্দী সারারাত পানি পানি বলে চিৎকার করে, কিন্তু কোন রক্ষী-প্রহরী

www.pathagar.com

তাকে এক ফোটা পানি দেয়নি। ভোরে উষার আলো ছড়িয়ে পড়ার আগে তার প্রাণ পাখী উড়ে যায়। চিরদিনের জন্য সে ঘুমের কোলে ঢলে পড়ে।

সে ভয়ংকর রজনী

আবুজে'বল কারাগারে ইন্টেলিজেন্স যে সব নাগরিককে 'অতিথি' হিসেবে রেখেছিলো, তাদের কেউই ১৯৬৫ সালের ৩১ শে আগষ্টের ভয়ংকর রজনীর কথা বিস্মৃত হতে পারেনা। এদিন জামাল আব্দুল নাসের মস্কোর সোভিয়েট যুবকদের একটা ক্লাবে ইখওয়ানুল মুসলেমুনের ষড়যন্ত্রের কথা প্রকাশ করে ঘোষণা করে যে, ১৯৫৪ সালে ইখওয়ানকে ক্ষমা করা হয়েছিলো। কিন্তু এবার আর কিছুতেই তাদেরকে ক্ষমা করা হবেনা। তার এ হুমকী সত্য প্রমাণিত হয়েছে। এ ঘোষণার পর আবুজে'বল কারাগার মানবতার বধ্যভূমিতে পরিণত হয়।

মানবতার বধ্যভূমি

আবুজে'বল কারাগারে আমি আমার ছোট ভাইকেও চাবুকের আঘাতে ক্ষতবিক্ষত হতে দেখেছি। আমার কয়েক জন বন্ধুসহ সে ছিলো সদ্যজাত শিশুর মতো উলঙ্গ। চাবুকের ঘায়ে তাদের পিঠ ছিলো রক্তাক্ত। এখানে ভবিষ্যৎ সম্পর্কে হতাশ হয়ে পড়ি যখন আমাদেরকে চালান অফিসারের হাতে তুলে দেয়া হয়। যে পুলিশ অফিসার আমাদেরকে গ্রহণ করছিল সে অতি সতর্কতা অবলম্বন করছিলো। সতর্কতার সাথে গুণে নিচ্ছিলো। কিন্তু চালান অফিসার বলেঃ চিন্তা করবেননা। সংখ্যা কম-বেশী হলে আমি তা পুরো করে দেবো। মানুষ নয় যেন একপাল বকরীকে কসাইয়ের হাতে তুলে দেয়া হচ্ছিলো। আমি এখানে দেখতে পাই হার্ট অপারেশন বিশেষজ্ঞ ডাঃ আহমদ মালতকে। তাকে পায়ের তলায় পিষ্ট করা হয়। পিটুনীর সব রকম হাতিয়ারই প্রয়োগ করা হয় তার উপর। শেষ পর্যন্ত হয়ে পড়ে বাকশক্তি হীন। আমি এখানে হাজার হাজার নিরপরাধ আদম সন্তানকে দেখেছি, যারা জানতোনা যে কোন্ অপরাধে তাদেরকে গ্রেফতার করা হয়েছে তারাতো দূরের কথা, গ্রেফতারকারীরাও জানতোনা, তারা কোন্ অপরাধে এদেরকে গ্রেফতার করে এনেছে। এখানে গোপন পুলিশ নির্যাতন আর পিটুনীর জন্য যেসব যন্ত্র ব্যবহার করেছে, তা বর্বরতার যে কোন যুগকে

www.pathagar.com

হার মানায়' এমন কি রোমক এবং পারসিকদের নির্যাতনকেও। খৃষ্টানরা ধর্মীয় একনায়কত্ব এবং তদন্ত আদালতযুগে যেসব নির্যাতন চালায়, তা বইতে পাঠ করেছি। কিন্তু আমার ব্যক্তিগত যে অভিজ্ঞতা হয়েছে, তা এর থেকে অনেক ভিন্ন, সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। আমার অভিজ্ঞতা ইতিহাসের সকল যুলুম-নির্যাতন থেকে সম্পূর্ণ আলাদা।

এখানে খোদারও প্রবেশাধিকার নেই

আমার গ্রেফতারীর প্রথম দিন একজন সামরিক অফিসার আমাকে উদ্দেশ্য করে বলেঃ শুনেছি তোমরা শিক্ষিত, আগ্রহী পাঠক এবং নূতন নূতন তথ্য সম্পর্কে ওয়াকেফহাল।

ঃ আশা করা যায় এসব আপনার মনে দয়ার উদ্রেকের কারণ হবে।

ঃ প্রমাণ যত শক্ত হোকনা কেন, আমি তোমাদেরকে উত্তপ্ত করবোনা। কোন মানুষকে মারা আমার পক্ষে সম্ভব নয়। কিন্তু ইউরোপের তদন্ত আদালত সম্পর্কে তোমাদের কি কিছু জানা আছে

ঃ হাঁ, কিছুটা জানি বৈ কি।

ঃ এখানে যা তোমরা প্রত্যক্ষ করবে, কঠোরতার দিক থেকে তা হবে আরও মারাত্মক।

ঃ আমার সাথেও কি এমনি আচরণ করা হবে?

ঃ কেন বাদ দেয়া হবে তোমাকে?

ঃ কোন আপীল দলীল কি আমার কোন কাজে আসবেনা?

ঃ না স্বয়ং খোদাও এখানে তোমাকে কোন সাহায্য করতে পারবেনা (নাউযুবিল্লা)।

অফিসার সাঁপের মতো হুংকার ছেড়ে কথা শেষ করে বলে ঃ

ঃ এটা এমন একস্থান, যেখানে খোদা প্রবেশ করতে পারেনা। এব্যাপারে খোদার কিছু জানাও নেই (নাউযুবিল্লাহ)। আমার কথা কতটুকু সত্য আবলম্বে তোমরা তা টের পাবে।

ঃ তবে আমি কি করবো?

ঃ বলে যাবে, যা কিছু জানা আছে, শুনাবে। সব কিছু খুলে বলবে। মানে ষড়যন্ত্র কি ছিলো আর কি ছিলো ষড়যন্ত্রকারীদের সাথে তোমাদের সম্পর্ক।

www.pathagar.com

ঃ কিন্তু ষড়যন্ত্রেরতো কোন ভিত্তি নেই।

ঃ এটা বাজে কথা।

ঃ ষড়যন্ত্র বানানো হয়েছিলো, এটা তোমাদের জানা থাকা উচিৎ।

মোট কথা যেকেউ এখানে প্রবেশ করতো—তাদের বিশ্বাস অনুযায়ী সেখানে খোদাও প্রবেশাধিকার নেই—তাকে অবশ্ই সরকারের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রকারী হতে হবে, সরকারের গাদ্দার প্রমাণিত। ষড়যন্ত্রকারী না হতে চাইলে তাকে তদন্তের নামে নিজের জীবনকে বিসন্ন করতে হবে। আর এ তদন্তের ফল কি দাঁড়াবে। তা একমাত্র খোদা-ই ভাল জানেন

উপরোক্ত তদন্ত অফিসার আমার সাথে সত্য এবং মিথ্যা দুটো কথা বলেছিলেন। সত্য কথাটা ছিলো এই, আগামীতে আমি শাস্তির যে ধারা প্রত্যক্ষ করবো, তা মধ্যযুগে তদন্ত আদালতের নির্যাতনের চেয়েও মারাত্মক। সত্যি সত্যিই পরবর্তী কালে আমার এ অভিজ্ঞতা হয়েছে। আমাদের উপর এমন কঠোর নির্যাতন চলে যে, অধিকাংশ লোকই প্রতি মুহূর্তে মৃত্যু কামনা করতো। মনস্তাত্বিক শাস্তি ছিলো এতো তীব্র যে, এক ঘা চাবুকেই অনেককে দুনিয়া থেকে বিদায় নিতে দেখেছি। এসব দৃশ্য আমার মন-মানসকে বিফল করে তোলে, দেহ-প্রাণকে করে তোলে নিঃসাড়। কারণ, আমি জানি এরা নিরপরাধ। এদের মধ্যে এমন অনেক দুঃসাহসী বীরপুরুষও ছিলো, চরম শাস্তি আর উপহাস সত্বেও এরা উল্লাদের সাথে হাসিমুখে কথা বলে, ভর্ৎসনা করে। অথচ ঃ তাদের আর মৃত্যুর মধ্যে মাত্র কয়েক মিনিটের ব্যবধান।

নির্যাতনের দ্বারায় খোদার দীদার

এখানে খোদাও প্রবেশ করতে পারবেনা, এ স্থান সম্পর্কে খোদারও জানা নেই—তদন্ত অফিসারের একথাটা ছিলো মিথ্যা। আমি বলি, খোদা সেখানে বর্তমান ছিলেন। আমি অনেকবার নির্যাতনের কালো ছায়ায় খোদার দীদার লাভে ধন্য হয়েছি। বরং আমি বলবো, আগে আমি আল্লাহ তাআলার সত্যিকার পরিচয় লাভ করতে পারিনি। আমাকে এখানে আনার পরই আল্লাহর সত্যিকার পরিচয় লাভ করতে সক্ষম হয়েছি।

এখানে ছিলেন কৃষি ইঞ্জীনিয়ার এম, এন, জেড। আমার দীর্ঘ দিনের পরিচিত, আমার বন্ধু নীম-গাইন এর কাছে ইনি থাকতেন। এরা সকলেই

www.pathagar.com

কৃষি গ্রাজুয়েট। ইয়াহইয়া হোসাইনের গ্রুপের লোক। কৃষি কলেজের হতভাগার গ্রুপ। কালের চক্র তাদের মধ্যে বিচ্ছেদ ঘটিয়েছে।

আমার বন্ধু এম, এন, জেডকে তাঁর অফিস থেকে গ্রেফতার করা হয়। পায়ে লোহার শিকল পরিয়ে তাকে কারাগারে আনা হয়। কারাগারে ইখওয়ানের গোপন সংগঠন সম্পর্কে তাকে মুনকের নকীর এর মতো জিজ্ঞাসাবাদ করা হয়। তাকে দেয়া হয় কঠোর এবং ভয়ংকর শাস্তি। গ্রেফতারীর কারণ সম্পর্কে সে কিছুই জানতোনা। একদিন কারাগারে তাকে উলঙ্গ হামাগুড়ি দিতে দেখেছি। তাঁর দু'হাতে জিঞ্জীর বাঁধা। ব্যথার তীব্রতায় তার পাগল হওয়ার উপক্রম।

অকথ্য যুলুম-নির্যাতনের শিকার হয়ে অবশেষে আমার ইঞ্জীনিয়ার বন্ধুটি স্বীকার করে যে, সে ইখওয়ানের গোপন সংগঠনের সদস্য। তার বিবৃতিকে শক্ত-সমর্থ করার জন্য অনেক চেষ্টা করেও সে ব্যর্থ হয়েছে। কারণ, আসলে এমন সংগঠন সম্পর্কে সে আদৌ পরিচিতই ছিলনা। এ শক্ত সামর্থের ইঞ্জীনিয়ার বন্ধুটি তিলে তিলে ক্ষয়ে যায়। দীর্ঘ তিন বৎসর কারার অন্ধপ্রকোষ্ঠে অকথ্য নির্যাতন ভোগ করার পর তাকে যখন মুক্তি দেয়া হয়, তখন শারীরিক মানসিক মনস্তাত্ত্বিক—সব দিক থেকে সে সম্পূর্ণ বিকল।

www.pathagar.com

সপ্তম দৃশ্য

সামরিক কারাগার অভিমুখে

১৯৬১ সালের ১৩ই সেপ্টেম্বর রাত আমি বিনিদ্র যাপন করি। সারারাত আমাকে ঝুলিয়ে রাখা হয়। ভোরে নিয়ে যাওয়া হয় কারাগারের নিকটে এক বাংলোয়। চোখে পট্টি বাঁধা। বাংলোয় 'তদন্তের' নাটক মঞ্চায়ন হয়। সারাদিন ভীষণ গরমে আমার অবস্থা কাহিল। এ দিন আমাকে এমন পেটানো হয় যে, অতীতের সমস্ত শাস্তি এর কাছে হার মানে। মেজর ফা-আইন তাঁর অভিপ্রায় অনুযায়ী নূতন কিছু তথ্য সংগ্রহের জন্যই আমাকে ইক্ষুর মতো পিষতে থাকে। আমি তাকে বার বার বুঝাবার চেষ্টা করি যে, যা কিছু বলেছি, তার চেয়ে বেশী কিছু বলার নেই আমার। আমি কোন গোপন সংগঠনের সদস্য নই; এ ব্যাপারে সংগঠনের লোকদেরকে জিজ্ঞেস করা যেতে পারে। তাদের আমার সম্পর্ক ছিলো নেহায়েত মামুলী। আমাকে তাদের অন্তর্ভুক্ত করার কথা তারাও চিন্তা করেনি কখনো। আপনি নিজে তাদেরকে জিজ্ঞেস করতে পারেন। মেজর বলে—

ঃ আচ্ছা বল, হিযবুত তাহরীরিন ইসলামী—ইসলামী মুক্তি দল—এর সাথে তোমার কি সম্পর্ক?

ঃ এ কোন বিপদ! এর সাথে আমার কোন সম্পর্ক নেই।

ঃ কিন্তু তোমার গৃহ থেকে যেসব পুস্তক উদ্ধার করা হয়েছে, তাতে এ দলের লিটারেচারও ছিলো।

ঃ এসব বই কায়রোর পুস্তকালয়ে বিক্রয় হয়। আপনি একজন সেপাই পাঠান। সে এমন অনেক বই কিনে আনতে পারে।

ঃ এ বইগুলোর প্রতি তোমার আগ্রহের রহস্য কি?

ঃ সাধারণ জ্ঞান লাভের স্পৃহা। আশে পাশে কি ঘটছে, মানুষকে তা জানতে হবে।

ঃ ঠিক আছে। ইখওয়ানের সংগঠন সম্পর্কে নিশ্চয়ই তোমার জানা আছে।

ঃ লা-হাওলা ওয়ালা কুউওয়াতা ইল্লা বিল্লাহ। এ সম্পর্কে আমি কিভাবে জানবো।

www.pathagar.com

ঃ তুমি নিজেইতো বলছো যে, মানুষকে আশ-পাশের দুনিয়ার খবর রাখতে হবে। তোমার আগ্রহের পরিমন্ডলতো ইসলামী ধারার। ইখওয়ানের সংগঠনও এ পর্যায়ে পড়ে।

ঃ জনাব! আপনি যে সংগঠনের কথা বলছেন, তা গোপন না প্রকাশ্য?

ঃ হ্যাঁরে কুত্তার বাচ্চা। তা গোপন সংগঠন।

ঃ তবে সে সম্পর্কে আমি কিভাবে জানবো?

মেজর হুংকার ছেড়ে—

ঃ রে কুত্তার বাচ্চা, সকলেই বলেছে যে, তুই ৫ সদস্যের কমিটির একজন,

ঃ এক চোটেই ৫ সদস্যের কমিটিতে শামিল? এটা কিথ্যা, অযৌক্তিক। কমিটিকে জিজ্ঞেস করুন।

ঃ কমিটিকে জিজ্ঞেস করে যদি সত্য প্রমাণিত হয়?

ঃ তাহলে আমাকে গুলী করে হত্যা করবেন।

ঃ না, জুতা মেরে হত্যা করবো।

এমনি ধারার কথা হয় বার বার। বিষয়বস্তু এবং শব্দও ছিলো প্রায় এক। আছরের সময় আমাকে মেজর ফা-আইন এর সামনে হাযির করা হয় পুনরায়। কোন ভূমিকা ছাড়াই মেজর এক গাদা প্রশ্ন ছুঁড়ে মারে—

ঃ তুমি খানগার শা'বানকে চেন?

ঃ এ আবার কোন কাহিনী?

ঃ হে কুত্তার বাচ্চা! আমি কিছু জিজ্ঞেস করলে জবাব দেবে। কত ঘুষী মারা হবে? কতো চাবুক পড়ে আছে, দেখতেইতো পাচ্ছস!

ঃ আমি প্রস্তুত।

ঃ তবে বলো। তাকে চেনো?

ঃ এ নামে কোন লোককে আমি চিনিনা। এমন কোন লোকের কথা শুনিনি। এটা আমি লিখে দিতে প্রস্তুত।

ঃ ভালভাবে ভেবে চিন্তে দেখ।

ঃ হাঁ, অনেক চিন্তা করে দেখেছি। আমি পূর্ণ আস্থার সাথে বলছি। এ নামের কোন লোককে চেনতামনা আমি কোন সময়। সে যেখানেরই অধিবাসী হোকনা কেন। যেকোন শহরেরই হোকনা কেন।

ঃ তোমার উপর বেশ ভয়ংকর বিপদ আসছে।

ঃ বর্তমান বিপদের চেয়ে ভয়ংকর কোন বিপদও কি হতে পারে?

www.pathagar.com

ঃ হাঁ, একটু পরই টের পাবে।

ঃ মহান আল্লাহর শপথ করে বলছি, শা'বান নামে কাউকে চিনিনা।

ঃ বাদ দাও এসব বড় বড় বুলি। প্রস্তুত হও। আজ রাতেই তোমাকে সামরিক কারাগারে পাঠাবো। সামরিক কারাগারের কথা শুনে আমার তো আক্কেল গুড়ুম। চক্ষু ছানাবড়া। গুলি করে হত্যা করলেও এত কষ্ট পেতামনা। আমার বুকে কম্পন শুরু হয়। ভয়ে মুখ শুকিয়ে যায়। কঠোর শাস্তিতে ডুবে থাকা স্বত্ত্বেও আমাদের ধারণা ছিলো আখেরাতের আযাব বাদ দিলে দুনিয়ায় সামরিক আদালতের শাস্তির চেয়ে বড় শাস্তি আর কোথাও নেই। আমরা সামরিক কারাগারের অনেক গল্প শুনেছি। আমাকে সামরিক কারাগারে পঠোনো হবে, এটা আমি ভাবতে পারিনি। আমি এ বলে মনকে প্রবোধ দেই যে, এটা নিছক হুমকি, সেখানে যাওয়া অনেক পরের কথা। কোথায় আমি, আর কোথায় সামরিক কারাগার। এসব চিন্তা করে কিছুক্ষণের জন্য মনকে শান্তনা দেই।

লেফটানেন্ট এছাম শাওকী আমার কাছে এসে চোখের পট্টি খুলে ফেলেন। তাঁর সাথে গিয়ে প্রয়োজনীয় জিনিস নিয়ে কারাগারের পোশাক খুলে ফেলার জন্য বললেন তিনি। আমি মনে মনে বললাম, হুমকী আরও তীব্র করার এটাও একটা কৌশল বটে। সুতরাং আমি যে ভয় পাচ্ছি, তাকে তা বুঝতে দেয়া দরকার। আমি কারাগারের দিকে গমন করি। এই প্রথমবার আমি কারাগারে খোলা চোখে হাঁটি। দেখতে পাই ধারালো পাথরের স্তুপ। আমি হোচটওখাই। নানা স্থানে ছড়িয়ে পড়েছিলো অনেক কাঁটা। তা-ও পায়ে বিদ্ধ হয়। বার বার যাতায়াতের ফলে পায়ে অনেক আঘাত পাই। ফোসকা পড়ে যায়। কারাগারে স্থানে স্থানে ছিলো সসশ্র পাহারাদার। তারা ক্রুদ্ধ নেত্রে তাকায়, যেন আমি শয়তান আর কি!

কারাফটকের বাইরে একখানা গাড়ী দাঁড়িয়ে। এমন গাড়ীতে করেইতো আমাদেরকে এখানে আনা হয়েছে। গাড়ী দেখে আমার মাথায় চক্কর দেয়। আমি যা নিছক হুমকী মনে করেছিলাম, তা বোধ হয় সত্যে পরিণত হচ্ছে! লেফটানেন্ট শাওকী হুংকার দিয়ে বললেন, এখনই তোমাকে সামরিক কারাগারে পাঠানো হবে। আমি বললাম, কেন? আমি কি জানি, কি জন্য তোমাকে সেখানে তলব করা হয়েছে। অবশ্য এটুকু আমি বলে দিতে চাই যে, এখানে বলনি এমন কোন কথা সেখানে প্রকাশ করলে এর অর্থ হবে আমরা কাজ

www.pathagar.com

করতে জানিনা। এমন পরিস্থিতি হলে মনে রাখবে, পুনরায় এখানে এলে তোমাকে হত্যা করার জন্য আর কোন অধুহাত দরকার হবেনা।

তাঁর মুখে একথা শুনে আমি আতংকিতহয়ে পড়ি। ব্যাপারতো দেখি ঠিকই; হে খোদা! আমায় সাহায্য কর। আমি কারাগারে প্রবেশ করি। চোখে-মুখে পানি নেই? বিবেক বুদ্ধি আড়ষ্ট। সিড়ির পাশে আরও ২৫জন লোক বসে অপেক্ষা করছে তাদেরকেও যেতে হবে সামরিক কারাগারে। ভয়ে তাদের অবস্থা কাহিল। চেহারা বিবর্ণ। মাথা নীচু।

দুনিয়ার জাহান্নাম

লেফট্যানেন্ট এছাম আমাকে একজন মেজরের হাতে তুলে দেয়। সামরিক কারাগার বা দুনিয়ার জাহান্নাম খানে ইনিই হবেন আমাদের কাফেলার পরিচালক। তিনি আমাকে জিজ্ঞেস করলেন, গ্রেফতারীর সময় যে কাপড় পরেছিলে তা কোথায়? আমি বললাম, ওপরে ব্যারাকের ভেতর পড়ে আছে। কুত্তার বাচ্চা যাও জলদী তা নিয়ে আস। আমি ব্যারাকে গিয়ে দেখি, গোটা ব্যারাক কয়েদীতে ভরা। যারা আমার সাথে এখানে এসেছিলো, সকলেই ছিলো আমার অপেক্ষায়। এদের মধ্যে একজন বন্ধু আমার দিকে এগিয়ে এসে শান্তনা দিয়ে বলেঃ হিম্মত হারা হবেনা। শুনেছি তোমাকে এখন সামরিক কারাগারে পাঠাবে। মৃত্যু অবধারিত। কেয়ামত নিশ্চিত, সে দিন আল্লাহ তায়ালা আমাদের সকলকে একত্রিত করবেন, ইনসাফের পাল্লা স্থাপন করবেন। সেখানে সব মানুষ আপন আপন কর্মফল লাভ করবে।

আমার মুখে উচ্চারিত হয় নানান দোয়া। আমি নিজেকে সংবরণ করার চেষ্টা করি, কিন্তু ব্যর্থ হই। আমি সে পোশাক পরি। কারাগারের-পোশাক প্লেট-পেয়ালা-চামচ একটা পুটলীতে বেঁধে রাখি। ব্যারাকের সমস্ত বন্ধু আমার জন্য দোয়া আর মুনাজাত করে মৃত্যুপথ যাত্রীর মতো তারা আমাকে বিদায় জানায়। নীচে নেমে এসে ছোট পুটলীটি কারাগারের কর্মচারীদের হাতে দেই। তাদের কাছ থেকে আমার আমানত ফেরৎ নেই। এ আমানত ছিলো ত্রিশ মিশরী কোরশ। গ্রেফতারীর সময় এ অর্থই ছিলো আমার পকেটে। এ অর্থ নিয়েই আমি এক জেল থেকে আরেক জেলে গমন করি। তখন আমার মনে হয়েছিলো যে, এ কারাগারই ভাল ছিলো। এখন

www.pathagar.com

যেখানে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে, তা-তো যেন জাহান্নাম। জল্লাদরাও আমাদেরকে করুণার দৃষ্টিতে দেখছিলো। এর অর্থ হচ্ছে, সামরিক কারাগারের শাস্তি আরও ভয়াবহ। এ কারণে তাদের মতো পাষাণ প্রাণও গলে গেছে। তারাও প্রকাশ করছে আমার প্রতি সহানুভূতি। হে দয়াময় প্রভু-পরওয়ারদেগার! কবে মুক্তি হবে। নির্ধারিত সময় তোমার ফয়সালা হবে। হে নাদান মন সাহস করে বুক বাঁধ। মুরশেদ বলতেন ঃ

یہ قدم قدم بلائیں یہ سواد کوئی جاناں
وہ یہیں سی لوت جای جسی ان بجم هر پیاری

—পদেপদে বিপদ, কদমে কদমে বাধা,
জীবন যার প্রিয়, এখানেই হোক তার ইতি।

আমাদের মধ্যে দু'দুজনকে একত্রে হাতকড়া পরানো হয়। আর তা জুড়ে দেয়া হয় এক লম্বা জিঞ্জীরে। ফলে সকলে মিলে পরিণত হয় এক জিঞ্জীরে বাঁধা কাফেলায়। ব্যথা-যন্ত্রনায়ও আমরা ছিলাম একাকার। জল্লাদ আমাদের চোখ বাঁধতেও ভুল করেনি। চিরা-চরিত অভ্যাস অনুযায়ী এ সময় তারা গালি-গালাজ আর কিল-ঘুঁষি দিতেও ভুল করেনি। রওয়ানা করার সময় তারা আমাদেরকে এই বলে সতর্ক করে দেয় যে, পথে কেউ মুখ খুললে তাকে আদৌ ক্ষমা করা হবেনা। ঠিক গুলী করে হত্যা করা হবে। আমাদের কাছে এই হুশিয়ারীর কোন মূল্য ছিলনা। কারণ, আমাদের কারো কথা বলার শখ ছিলনা। ছিলনা শক্তি। আমরা চলছি সামরিক কারাগারে, মৃত্যু সেখানে অপেক্ষা করছে আমাদের জন্য। আর মৃত্যুও আমাদের কাছে এমন কিছু ছিলনা, যা দিয়ে ভয় দেখানো যায়। ভয় ছিলো কেবল আযাবে আলীম-এর—কঠোর শাস্তির।

আমাদের সাথে ছিলো দু'জন সামরিক সেপাই। তাদের মুখে বিদ্রূপ আর গালী। একজন সেপাহী বলেঃ তোমাদের গোটা কাফেলা যদি নদীতে পড়ে ডুবে মারা যায়, তবে এটা হবে তোমাদের প্রতি খোদার বিরাট মেহেরবানী। সে যখন কথা গুলো বলছিলো, তখন আমাদের গাড়ী ইসমাইলিয়া নদী অতিক্রম করছিলো। আগে-পাছে ছিলো পুলিশের গাড়ী। অপর সেপাই বলেঃ যে জাহান্নামে তোমাদেরকে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে, সেখানে তোমাদের কি দৃশ্য হবে, তা কি তোমাদের জানা আছে।

www.pathagar.com

সেপাইদের কথা শুনে আমার মুখে অস্ফুট স্বরে দোয়া আসেঃ প্রত্যেকে সেপাই-এর কথা কবুল কর। আমাদের গাড়ী নদীতে পড়ুক। আমরা সবাই ডুবে মরি। বরং আমিতো এটাও বলছিলাম যে, বিগত দিনগুলোতে আমাকে ফাঁসি দেয়া হলেই ভালো হতো! কিন্তু আল্লাহর ইচ্ছে এই যে তিনি আমাদেরকে আরও কিছু অভিজ্ঞতা অর্জনের সুযোগ দেবেন। তাই আকাংখ্যা স্বত্বেও আমরা নদীতে ডুবে মরিনি। পরে জানতে পেরেছি যে, এটা কেবল আমারই মনের আকাংখ্যা ছিলনা। বরং সকলের মনেই এমন আকাংখ্যা জেগে ছিলো।

ইসমাইলিয়া নদীর গা ঘেঁষে আমাদের গাড়ী এগিয়ে চলে। রাস্তায় পুলিশ ষ্টেশন এবং গোপন পুলিশ সেন্টারে আমাদের গাড়ী কিছুক্ষণের জন্য থামে। দু'ঘন্টা চলার পর আমরা অনুভব করি যে, হৈ-চৈ অনেকটা থেমে গেছে। গাড়ীর ইঞ্জীনের শব্দ ছাড়া অন্য কোন শব্দ আমাদের ভয় ভীতিকে বাধ সাধছিলোনা। এখানেই হচ্ছে সে ভয়ংকর সামরিক কারাগার' যার প্রাচীর পাথরের নির্মিত। আর দরজা লোহার। এখানে নিষ্ঠুর ভাবে মানুষের স্বাধীনতাকে চ্যালেঞ্জ করা হয়, মানুষের মুখে দেয়া হয় তালা।

মনে আমার ভীষণ তোল-পাড়। চিত্ত অস্থির-ব্যাকুল। আমি ভাবি আর ভাবি, একজন মানুষ অপর মানুষের উপর কতো নিষ্ঠুর আচরণ করতে পারে এ সামরিক কারাগারে। অবশেষে কেন আমাকে। তলব করা হয়েছে এখানে। কি কি ভুগতে হবে এখানে আমাকে। গাড়ী থামে। ভয়ে আমার মন গলে যায়। লোহার জিঞ্জীরের যখন শব্দ হচ্ছিলো আর হাতকড়া যখন আমাকে টেনে নিচ্ছিলো বাইরে, তখন আমার অনুভূতিতে ভীষণ তোল-পাড়। আমরা সবলে এক জিঞ্জীরে বাঁধা। শক্ত, ভারী এবং শীতল জিঞ্জীর 'নাছের বা গরের' গারম-শুষ্ক হাওয়া স্বত্তেও আমাদের মন-প্রাণকে করে তুলেছিলো শীতল!

আমরা দ্রুত গাড়ী থেকে নীচে নামি। চোখ বাঁধা। আমার কানে একটা শব্দ বাজে। শব্দটা প্রথমে ছিলো ক্ষীণ। ধীরে ধীরে বড় হয়। অনেক বড়। পরে এমন ভয়ংকর রূপ নেয় যে, আমার কান ফেঁটে পড়ার উপক্রম হয়। শরীর কেপে উঠে। মনে শিহরণ জাগে। এটাছিলো চাবুকের শব্দ। এ চাবুক দিয়ে কেবল মানব দেহকেই ছাতু করা হচ্ছিলোনা,

www.pathagar.com

বরং বায়ুকেও বিদীর্ণ করা হচ্ছিল তীব্রভাবে। এ শব্দের সাথে পাখির শব্দের মতো শব্দও উত্থিত হচ্ছিলো, যেন সারা দুনিয়ার সব পাখি এখানে এসে জড়ো হয়েছে। শব্দের সাথে মানুষের চিৎকারের শব্দও কানে বাজে এ শব্দ কি পুরুষের, না নারীর, না শিশুর তা বলা শক্ত। সামরিক কারাগারে তিন শ্রেণীর মানুষই চাবুক পেটা হচ্ছে। এ সময় আমার অনুভূতি চিৎকার করে বলে উঠে, দুনিয়া বধির হয়ে পড়েছে। সভ্যতা-সংস্কৃতির দেহকে ঘুনে ধরেছে। তার প্রাণ স্বত্ত্বা ধ্বংস করেছে। করেছে তাকে নিঃশেষ।

আমরা কারাফটকের সামনে নেমে দাঁড়াই। হাতে জিঞ্জীর, চোখে পট্টি বাঁধা। সামরিক বাহিনীর লোকেরা এসে চাবুক মেরে মেরে আমাদেরকে ভেতরে তাড়িয়ে নিয়ে যায়। এ ছিলো অবর্ননীয় দৃশ্য। আমি এ সম্পর্কে ধারণাও করতে পারিনা। অবশ্য প্রাচীন যুগের ইতিহাসে এহেন দৃশ্যের বর্ননা পাওয়া যায়। যেমন ফারাসিস দাসদের বিপ্লবী আন্দোলনকে নস্যাৎ করে দেয় এবং এদের নেতা স্পর্ক টাকসকে হত্যা করে। কারণ, এর কারণে প্রাচীন রোম ছিলো রীতিমতো শংকিত। রোমকদেই যুগে লিবিয়ার কয়লা খনীতে ও হয়তো এহেন দৃষ্টান্ত খুঁজে পাওয়া যেতো এ সব খনিতে রোমান শাসকরা দাসদেরকে দিয়ে সারা দিন এবং রাতেরও কিছু সময় কঠোর পরিশ্রম করাবার পর তাদেরকে নিঃসাড় করে হত্যা করাতো। বিজয়ী রিমেসিসও হিত্তি এবং বোল্ট অঞ্চল থেকে ধরে আনা বন্দীদের সাথেও নিতান্ত অন্যায় নিষ্ঠুর আচরণ করে। আধুনিক কলে ষোড়শ এবং সপ্তদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে তুলা ও ইক্ষু ক্ষেতে মিশরে, এমন দৃষ্টান্ত খুঁজে পাওয়া যায়। ইতিহাসের বিভিন্ন অধ্যায়ে আরও এমন দৃষ্টান্ত খুঁজে পাওয়া যাবে। কিন্তু মিশরে এহেন পরিস্থিতির পুনরাবৃত্তি সত্যিই বিস্ময়কর। তাহযীব তামাদ্দুনের ঐতিহাসিক কেন্দ্রস্থলেও এহেন অন্ধকার পরিস্থিতি সৃষ্টি হবে—এমন কথা আমি ভাবতেও পারিনি। সভ্যতার এ কেন্দ্র ভূমি থেকে যুগে যুগে নানা দর্শন আর নানা আন্দোলনের সূত্রপাত হয়েছে। উত্তোলিত হয়েছে মানুষের আযাদীর পতাকা। সভ্যতার এ কে স্থল এখন একদল ডাকাতের অধিকারে। এরা ঘর থেকে মানুষকে অপহরণ করে নিয়ে যায় অজ্ঞাত স্থানে, তাদের উপর চালায় বর্বর নির্যাতন। বিশ্বের সবচেয়ে

www.pathagar.com

বিকৃত মানুষ এডলফ হিটলারের যুগেও গ্যাস্টাপোর জল্লাদরা পর্যন্ত মানুষের উপর এমন নির্যাতন চালায়নি, যা চালায় এই ডাকাতের দল। মিশরের জন্য এ হচ্ছে এক বীভৎস-পূতিগন্ধময় পরিস্থিতি, যা গোটা পরিবেশকে করে তুলেছে বিষাক্ত।

সামরিক কারাগারকে তুলনা করা যায় মানুষ খেকো হিংস্র জন্তুতে ভরা জঙ্গলের সাথে। আমার ধারণা, হিংস্র জন্তুর মধ্যেও আল্লাহ দয়া-মায়া বলে একটা জিনিস দিয়েছেন। কিন্তু এ সব ডাকাতের দলের অন্তরে এতটুকু দয়া মায়াও নেই। এরা আমাকে এক বৎসর ধরে সামরিক কারাগারে নানাবিধ অমানুষিক নির্যাতনের যাঁতাকলে পিষ্ঠ করে। এদের ভেতরের দিক অতি বীভৎস, অতি কদর্য।

চিৎকার-আর্তনাদে ভরা পরিবেশের মধ্যে এক বিকট শব্দ উত্থিত হয়ঃ

ঃ এ কোন্ জনতা ?

ঃ পাশা সাহেব, এরা নূতন বন্দী। আবুজে'বল কারাগার থেকে আনা হয়েছে।

ঃ এদের চোখ বাঁধা কেন্ ?

ঃ পাশা সাহেব, এটাই হচ্ছে সিভিল ইন্টেলিজেন্সের নিয়ম।

পাশা সাহেব এক বিদ্রূপাত্মক অট্ট হাসি হেসে হেসে বলেঃ

ঃ "ভবিষ্যতে যাতে এরা প্রতিশোধ নিয়ে না বসে—সিভিল ইন্টেলিজেন্স এ জন্য বন্দীদের চোখ বেঁধে নেয়। কিন্তু আমরা শাস্তি দেই, হত্যা করি। কাউকে ভয় করিনা আমরা। এখানে যারা আসবে, তারা হয় অনন্তকাল ধরে জামাল নাসেরের সেবাদাস হয়ে থাকবে অথবা মৃত্যুর করাল গ্রাসে পরিণত হবে [এ সময় আমার মনে ঘুরপাক খাচ্ছিলো প্রাচীন মিশরের যাদুঘর, ফেরাউনের ছবি ও অন্যান্য দৃশ্য]। আমাদের অজ্ঞতা বহির্ভূত কোন কারণে তারা যদি মৃত্যুর হাত থেকে রক্ষা পায়, তাহলে সারা জীবন যেন আকাশস্পর্শী দুর্গকেভয় পায়। সুতরাং এসব ইতরের চোখ থেকে পর্দা খুলে ফেল।"

কারা প্রাচীরের দিকে মুখ করে আমাদেরকে সারিবদ্ধ ভাবে দাঁড় করানো হয়, হাত কড়া আর জিঞ্জীর খুলে ফেলা হয়। আমাদেরকে হুকুম দেয়া হয় চোখের পট্টি খুলে ফেলতে। চোখের পট্টি খোলা মাত্রই সকলে বিকট চিৎকার দিয়ে উঠে। আমার মনে হয় যেন আমি পরকালের দরজায় দাঁড়িয়ে

www.pathagar.com

আছি। আমি আমার সত্ত্বাকে দয়াময় মেহেরবান আল্লাহর হাতে সোপর্দ করি। তিনি আমার মঙ্গল করবেন। পরকাল হবে নিঃসন্দেহে কল্যাণকর। আমার মনের সকল আশা-আকাংখা তিরোহিত হয়ে যায়। এ সময় আমার মনে পড়ে নাম নাজানা এক কবির কবিতার চরনদ্বয় :

لا تدبر مک امر --فاولو ۔ فتد بین هلکی
سلم الامر تجد نا--تجد نا اولی مک حنک

—তোমার কোন কাজের তদবীর করবেনা, তদবীর করলে ধ্বংস হবে। তোমার কাজ আমার হাতে ছেড়ে দাও, আমি তোমার চেয়েও বেশী কল্যাণকামী।

এখানে আমি নিজেকে আল্লাহর মেহমান বলে মনে করি। অথচঃ এখানকার প্রতিটি দায়িত্বশীল ব্যক্তি মহান আল্লাহকে চ্যালেঞ্জ করেছে [নাউযু বিল্লাহ]। মহান আল্লাহর স্বত্ত্বা, বরকতময় তাঁর নাম।

সামরিক কারাগারের এক রজনী

প্রিয় পাঠকবৃন্দ, সামরিক কারাগার সম্পর্কে আপনাদেরকে কি বলবো, কি শোনাবো, সেই কালো দিনগুলোর কথা মনে পড়লে শরীরের পশম খাড়া হয়ে যায়, গায়ে শিহরণ ধরে। ভুলক্রমে এখনো সে দিনগুলোর কথা মনে পড়লে ভয়-দুঃখ-ক্ষোভে মন ফেটে পড়ে জীবনে একবার যে এখানে এসেছে সে এমন এক ভয়াবহ অবস্থা দেখেছে, মানুষ যা কল্পনাও করতে পারেনা। আমার অনুভূতি অনুযায়ী সারা দুনিয়ার সব বিপদ একত্র করলেও সামরিক কারাগারের এক রাতের বিপদের সমান হবেনা, সেখানকার সত্যিকার অবস্থা বর্ননা করা, সত্যিকারের চিত্র অংকন করা, আমি যতই চেষ্টা করিনা কেন, সম্পূর্ণ অসম্ভব।

কারাগারে অভ্যর্থনা

এখানে প্রাচীন কাল থেকে একটা ঐতিহ্য চলে আসছে। কারাগারের পরিভাষায় এ ঐতিহ্যকে বলা হয় অভ্যর্থনা। এ অভ্যর্থনা জানায় জল্লাদরা।

www.pathagar.com

উত্তরসূরীকেও তা শেখায়। ঐতিহ্যটি হচ্ছে এইঃ জল্লাদ বন্দীদেরকে গ্রহণ করেই শুরু করে দেয় চরম পিটুনী। অনেক সময় এর ফলে বন্দী মারাও যায়। প্রথম দিনই ভয় দেখানো হচ্ছে এদের উদ্দেশ্যে। যাতে ভবিষ্যতে কোন দিন এদের সামনে মাথা তোলার সাহস না পায়। আমাকেও অভ্যর্থনার এ পর্যায় অতিক্রম করতে হয়েছে। এর ভয়াবহতার কাহিনী আমরা আগেই শুনেছিলাম। আমি কি আপনাদের সামনে এর চিত্র তুলে ধরতে সক্ষম হচ্ছি? সম্ভবতঃ হবোনা। তবে চেষ্টা করবো।

আমরা যখন সামরিক কারাগারে প্রবেশ করি, তখন পরিবেশ কেমন ছিলো, তার সংক্ষিপ্ত চিত্র উপরে পেশ করা হয়েছে। চারিদিকে চিৎকার আর্তনাদ, বুকফাটা আওয়াজ আর মানুষের রক্ত মাখা চাবুকের কশ কশ শব্দ কর্ণ বিদীর্ণ করছিলো। এ অবস্থায় নিয়ে আসা হয় পাগলা কুকুর, মানুষ খেকো কুকুর। গলায় জিঞ্জীর জড়ানো। সেপাইরা হাতে ধরে রেখেছে। আমাদের কাছে এসে কুকুর ঘেউ ঘেউ শুরু করে দেয়। কুকুর পায়ের গোড়ালী থেকে কামড় দিতে শুরু করে। আমরা দেয়ালের সাথে জড়ানো, ভয়ে রীতিমতো পাথর। এরপর ডাকা হয় একদল সেপাই। এদের সংখ্যা ৫০—এর অধিক! এরাও কুকুরের মতো শিক্ষিত—প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত। এদের প্রত্যেককে নির্ধারিত ,কৃতীত্ব' দেখাতে হবে। এদের ডিউটি ছিলো আমাদের সারীর কাছ দিয়ে যাবে এবং প্রত্যেকের বুকে এক একটা ঘুঁষি মারবে। এ তো ঘুঁষি নয়, যেন এক একটা বোমা। আমার কাছে দাঁড়িয়ে ছিলো এক জড় সড় বৃদ্ধ ঘুঁষি সহ্য করতে পারেনি। সাথে সাথে মাটিতে লুটিয়ে পরলো। জানিনা বৃদ্ধ ঘুঁষি সহ্য করতে না পেরে পড়ে গেছে, না ভয়ে। আমি অস্থির হয়ে বৃদ্ধের দিকে ঝুঁকি, সহানুভূতির প্রেরণায় আমার অন্তর ফেটে পড়ছিলো। বৃদ্ধ কাতর স্বরে দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলেছিলেন আর খোদার দোহাই দিচ্ছেলেন। বিনয়ের সাথে করছিলেন দয়া ভীক্ষা। এক সময় বৃদ্ধ চুপ হয়ে যায়। চিরতরে চুপ। আমার ধারণা' ভয়ের কারণে তাঁর প্রাণ পাখী দেহের পিন্জিরা থেকে উড়ে যায়।

আমাকে সারী থেকে বিচ্ছিন্ন করে নিয়ে সকলে মিলে পিটাতে থাকে। আমি বেহুঁশ হয়ে পড়ে যাই। হুঁশ ফিরে দেখি, অন্যদের সাথে আমিও গোস্তের স্তুপের মধ্যে পড়ে আছি। আমাদেরকে এননভাবে পেটানো হয় যে, আমাদে শরীরের গোস্ত খসে পড়ে। কুকুর পৈশাচিক উল্লাসের সাথে আমা-

www.pathagar.com

দের শরীরের রক্ত চুষে খাচ্ছিলো। সে রাত কুকুর আমাদের কি পরিমাণ গোশ্ত খেয়েছে, কি পরিমাণ রক্ত পান করেছে তা বলা মুশকিল।

দুনিয়ার দোজখের প্রথম রাত

আমরা ছাইয়ের স্তূপের মতো পড়েছিলাম। এমন সময় সেপাই চিৎকার দিয়ে দাঁড়িয়ে নূতন নির্দেশ শোনার জন্য। ব্যথায় কাতর হওয়া স্বত্ত্বেও নির্দেশ পালন না করে উপায় ছিলনা। বাধ্য হয়ে দাঁড়াতে হয় আমাদেরকে। আপাদমস্তক ব্যাথায় কাতর। নূতন নির্দেশ জারী হয়। যে স্থানে রাতও কাটাতে হবে, আমাদেরকে মার্চ করে যেতে হবে সেখানে। আমাদের জন্য শুরু হচ্ছে পার্থিব দোজখের প্রথম রাত। এ নয়া নির্দেশ অনুযায়ী আমরা সেদিকে ধাবিত হই, এখানে যাকে বলা হয় বড় কারাগার।

সামরিক কারাগারের চারিদিকে উচু প্রাচীর। ভেতরে বড় বড় ইমারত। সব ইমারতের নাম্বার দেয়া। এক নাম্বার ইমারতকে বলা হয় ষেড় জেল। এখানে গাঁজা গাঁজি করে এক হাজার লোকের ঠাই হয়। ভেতরে প্রায় তিনশ কুঠরী। তিন তলা ইমারত। এক-দুই-তিন-চার.....নাম্বার একের পর এক। এরপর হাসপাতাল। যে মৃত্যুর দারে পা রেখেছে অথবা কার্যতঃ মারাই গেছে তাকেই হাসপাতালে পাঠানো হয়। এরপর প্রশাসনিক দফতর, তার পাশেই রয়েছে শাস্তির ঘর। কারাগারের ভেতরে রয়েছে একটা সুন্দর বাংলো। বড় জল্লাদ হামজ বিসিওলী এ বাংলোয় বাস করে। ইতিহাসে যুলুম নির্যাতনের কোন অধ্যায় রচিত হলে এ ব্যক্তি হবে প্রতিটি অন্যায়ের শিরোনাম। এ বিশাল ইমারতের মধ্যস্থলে আছে ছোট্ট মসজিদ। উদাস-নির্জন নিষ্প্রভ-পরিত্যাক্ত প্রায় এ মসজিদটিই নানা ঘাত পতিঘাত আর নানা ঘটনা প্রবাহের নীরব সাক্ষী। কারাগারের যে বড় অলিন্দে তিন ঘন্টা পর্যন্ত আমাদের অভ-র্থনা হয়েছে আর যে বড় জেলে আমরা এখন বাস করছি, এ দুয়ের মাঝে প্রায় ২৫০ মিটার দূরত্ব।

কোন পথপ্রদর্শক ছাড়াই বড় জেলের দিকে যাওয়ার পথ অতিক্রম করার জন্য আমাদেরকে নির্দেশ দেয়া হয়, রাস্তা ছিলো আঁকা বাঁকা, আমাদের অজানা। সেপাই চাবুক মেরে মেরে আমাদেরকে হাঁকিয়ে চলেছিলো। প্রতে-কের প্রতি নির্দেশ ছিলো সামনের লোকের গর্দানে ঘুষি মারার। এমনটি

www.pathagar.com

না করলে তার মৃত্যু নির্ঘাত। আমরা পিটুনী খেয়ে জড়সড় হয়ে বড় জেলের অলিন্দে পৌঁছি। আমাদের জন্য আরও একটা অভ্যর্থনা, অপেক্ষা করছে— এটা শুনে আমাদের মুখ শুকিয়ে যায় ভয়ে। এটা হচ্ছে স্থানীয় অভ্যর্থনা। বড় জেলের আঙ্গিনায় এ অভ্যর্থনা সম্পন্ন হবে।

বিশাল এ আঙ্গিনা, প্রস্থ একশ পঞ্চাশ মিটার। ময়দানের এক কোনে একটা কুপ আছে, এ কুপেই হত্যা করা হয়েছে অসংখ্য সূর্য সন্তানকে। ইসলামের সূর্য সন্তান। আমরা আঙ্গিনায় উপস্থিত হই এবং নির্দেশ অনুযায়ী দেয়ালের দিকে মুখ করে দাঁড়াই। এখানে একদল সেপাই খাবার খাচ্ছিলো। কয়েদীদের কাছ থেকে ছিনিয়ে নেয়া খাবার। আমাদেরকে দেখেই তারা খাবার ফেলে ছুটে আসে। কারণ, আমরাইতো তাদের বড় খাবার! এখাদ্যই তাদের অতি প্রিয়।

এখানে অভ্যর্থনা অনুষ্ঠান দু'ঘন্টা স্থায়ী হয়। এ অভ্যর্থনা অনুষ্ঠান ছিলো আগের অভ্যর্থনা, অনুষ্ঠানের মতোই। বরং বর্বরতা পৈশাচিকতার বিচারে তার চেয়েও জঘণ্য। আমাদের কাছ থেকে টাকা-পয়সা, ঘড়ি-কলম এবং কাপড় চোপড়, নিয়ে নেয়া হয়। যেসব ভালো কাপড় সেপাইদের পছন্দ হয়েছে, তা তারা নিজেরাই বেছে নেয়। এরপর আমাদেরকে আটক করা হয় ৬নং স্টোরে। আমরা তখন ব্যথা-যন্ত্রনা আর ক্ষুধা-পিপাসায় কাতর। আমাদের মনে হচ্ছিলো এখনই যদি কোন অকস্মাৎ বিপদ এসে আমাদেরকে দুনিয়া থেকে নিয়ে যেতো!

www.pathagar.com

অষ্টম দৃশ্য

৬ নাম্বার ষ্টোর

একটা বড় কক্ষ নিয়ে ৬ নাম্বার ষ্টোর। প্রধান ফটক দিয়ে প্রবেশ করলে হাত বাম দিকে পড়ে। এর সামনে রয়েছে পানির কূপ। পেছনে রয়েছে একটা জানালা, কারাগারের বড় পার্ক। বিপরীত দিকে হাসপাতাল। সামনে দূরে রয়েছে তদন্ত অফিসভবন।

দশ বার জনের বেশী লোকের স্থান সংকুলান হয়না এ কক্ষে। কিন্তু বিপুল সংখ্যক বন্দীতে কক্ষটি ঠাসা। ভোরে সূর্যের আলো আসার পর আমরা গুনে দেখি এ কক্ষে গুঁজা লোকের সংখ্যা ৪৫। অথচঃ কক্ষের মোট আয়তন হয়েছে ৩১২ মিটার। পেসাব-পাখখানা এবং রক্তের দুর্গন্ধে ভরা। কক্ষে ক্ষীণ আহাজারী। কারণ, বড় আওয়াজ কঠোরভাবে নিষিদ্ধ। এর অন্যথা হলে ভূখা কুকুর লেলিয়ে দেয়া হবে। আমরা যখন এ কক্ষে প্রবেশ করি, তখন সকলেই আহত। দেহের নানা স্থান থেকে টপ টপ করে রক্ত ঝরছিলো। ঘুট ঘুটে অন্ধকারে আমরা একজন আরেক জনের গায়ের উপর পড়ি। যে যেখানে বসেছিলো, সূর্যোদয় পর্যন্ত সেখানে সে অবস্থায় বসে থাকে। পাহারাদাররা সতর্ক করে দেয় যে, কোন আওয়াজ বা খট খট শব্দ যেন না হয়। এমনটি করলে মৃত্যু নির্ঘাত। আমরা জানতাম যে, এদের হুমকী মিথ্যা হয় না। এরা যা কয়, তাই করে।

আমাদের এক বন্ধু নীরবতা ভঙ্গ করে। বন্ধুটি পেশাব বন্ধ করে রাখে। আমাদের মধ্যে সে-ই পায়খানায় যান সবচেয়ে কম। সে পায়খানায় গিয়াছে ৩৬ ঘন্টা আগে। কিছুক্ষণ পর সে সামান্য দরজা খুলে। দরজার বাইরে দেখতে পায় দৈত্যের মতো কদাকার একজন সেপাইর ছায়া। হাতে চাবুক। সে গলা ফাটা চিৎকার দিয়ে বলছিলো, কেউ পায়খানায় যেতে চায়? আমরা সকলেই খামুশ। সেপাই বিশ্রী গালি দেয়। এরপর আবার একই প্রশ্ন উচ্চারন করে।

ঘুট ঘুটে অন্ধকার। চেহারার প্রতিক্রিয়া জানা মুশকিল। সকলেই সমভাবে ভীত, আমাদের বন্ধুটি বুকে সাহস করে পায়খানায় যাওয়ার আবেদন করে। আমাদের সাথী এ বন্ধুটি মিশরীয় সেনাবাহিনী জেনারেল ছিলো।

www.pathagar.com

কদাকার সেপাই তাকে বাইরে নেয়। ভীষণভাবে পিটায়। এরপর আসে কুকুর। আমাদের চোখের সামনেই তার শরীরের বিভিন্ন অংশ কামড়ে খায়। এত সবের পরও তাকে কূপে নিক্ষেপ করা হয়। সে মরার উপক্রম হলে সেখান থেকে তুলে কক্ষের ভেতরে ঠেলে দেয়া হয়। তার দেহ রক্ত এবং পানিতে একাকার। সে তখন কাঁপছিলো। কিছু সময় পানি শুকিয়ে যায়, কিন্তু শুকায়না রক্ত। আগামীতে আর যেন পায়খনায় যাওয়ার শখ না হয়, এজন্য তাকে এ শিক্ষা দেয়া হয়েছে। অতঃপর আর সে পায়খানায় যায়নি, যেখানে ছিলো, সেখানেই পায়খানা পেশাব করেছে। দম ফাটা গন্ধ। আশ পাশের লোকের টেকা মুশকিল। আমি ছিলাম তার পাশে। তার এ দশা দেখে সকলের ত্রিশ ; কুদশা। কারো মুখে কোন শব্দ নেই। এমনকি কেউ বড় করে নিশ্বাসও ফেলছেনা। প্রতি পনর মিনিট অন্তর দরজা খোলা হতো এবং আমাদের উপরে ছুঁড়ে মারা হতো আর একজন নূতন বন্দীকে। মানুষকে এমনভাবে নিক্ষেপ করা হতো, যেন আলুর বস্তা।

ভীষণ অন্ধকার, কেউ কাউকে চিনতে পারছেনা। মনে হচ্ছে সকলেই হাত দিয়ে মুখে চেপে ধরেছে, যাতে যন্ত্রনায় কাতর হয়ে মুখ থেকে কোন আহা-

নির্গত না হয়। ক্ষুধা-পিপাসায় আমরা ছটফট করছিলাম। কিন্তু ভয় এসব নিয়ন্ত্রন করছে। কিছুক্ষণ পর একজন মুখ খুলে চাপা গলায় বলে : ভাইস। শব্দটা মুখ থেকে নিগত হওয়ার সাথে সাথে আমাদের সামরীক সাথী বন্ধুটি বলে উঠে : তুমি কি জান ? আমরা যে অবস্থায় নিক্ষিপ্ত হয়েছি, তোমার দৃষ্টিতে তা কি যথেষ্ট নয় ? কিন্তু ক্ষীণ কণ্ঠ আবার উত্থিত হয়। লোকটা চুপি সারে বলে উঠে—

: আমি একটা জরুরী বিষয় আবিষ্কার করেছি।

: কি আবিষ্কার ?

: দরজার এক পাশে রাবারের দু'টি পাত্র পড়ে আছে।

: এর মতলব ?

: আমার মনে হয়, এর একটা পেশাব করার জন্য, আর একটা পানি পান করার জন্য। কিন্তু নিশ্চিত করে বলা মুশকিল, কোনটা পেশাব করার জন্য, আর কোনটা পানির জন্য।

এটা শুনে আমাদের একবন্ধু চুপে চুপে উঠে একটা পাত্রে পেশাব করে। অপর এক বন্ধু তার পেশাব পান করে। জীবনে এই প্রথম বার আমি পেশাব পান করি। পিপাসায় কাতর মানুষ প্রাণ বাঁচাবার জন্য কিছু না

www.pathagar.com

কিছু উপায় বের করে। কিন্তু পেশাব পান করা কি খুব সহজ কাজ? এটা বলা নিষ্প্রয়োজন যে, এ রাত আমাদের কেউ আদৌ ঘুমাতে পারেনি। এরপরও অনেক রাত এমন বিনিদ্রযাপন করতে হয়েছে। হঠাৎ আমাদেরকে তদন্তের জন্য ডাকা হলে সেখানে আমরা কি জবাব দেবো, কি ভূমিকা গ্রহণ করবো—ব্যাথা-যন্ত্রনায় আমরা এতটা কাতর ছিলাম যে, এ সম্পর্কে চিন্তাও করতে পারিনি।

খোদার এমন মর্জী যে, তদন্তের মুখোমুখী হওয়ার জন্য আমাকে দীর্ঘ চল্লিশ দিন অপেক্ষা করতে হয়। আবুজে'বলের তদন্ত আর সামরিক কারাগারের তদন্তের মধ্যে বিরাট পার্থক্য দেখতে পেয়েছি। সামরিক কারাগারের তদন্ত ধারার সার সংক্ষেপ এইঃ চাবুক মেরে বা লোহার গরম শলাকা দিয়ে দাগিয়ে বন্দীকে প্রাণে মেরে ফেলা, নখ উপরে ফেলা, কুকুর দিয়ে খাওয়ানো, বৈদ্যুতিক শক দেয়া, সামরিক বুটের লাথিতে প্রাণ ওষ্ঠাগত করা ইত্যাদি।

সামরিক অফিসারের করুন মৃত্যু

গভীর নিসুপ্তিতে রজনী নিমজ্জিত। চারিদিকে ঘন-কালো অন্ধকার। ভয়াল পরিবেশ এ সময় দরজা খোলা হয়। আরো দু'জন বন্দীকে কক্ষে ছুঁড়ে ফেলা হয়। এরপর ডাক পড়ে একজনের নাম ধরে। লোকটি ভয়ে কেঁপে কেঁপে উঠে দাঁড়ায়। তার সারা শরীর কাঁপছিলো। কাঁপছিলো দাঁতও। দাঁত কাঁপার আওয়াজ শোনা যাচ্ছিলো। অন্ধকারের মধ্যে গভীর দৃষ্টিতে আমি তাকে দেখার চেষ্টা করি। দরজা দিয়ে বাইরের ক্ষীণ আলো ভেতরে প্রবেশ করি চেষ্টা রজা দিয়ে বেরুবার সময় আমি তাকে চিনে ফেলি। ইনি হচ্ছেন গ্রেফতারকতে সামরিক অফিসার। রাতে তার উপর যে, চরম নির্যাতন চলে তার মুছে এখনও মুছে যায়নি। তাকে আবার তলব করা হয়েছে তদন্তের জন্য। এ আহত ক্ষত-বিক্ষত সাক্ষীকে এখন কোন্ অজানা পরিণতির দিকে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে। হে খোদা! তার বিপদ সহজকর আমার এ বীনিত দোয়ায় স্টোরের সকল বন্দী শরীক ছিলো।

ভোরের আলোর প্রথম আভা ফুটে উঠলে আমরা তার চেহারা দেখতে পাই। দরজা খোলা হয়। দৈত্যের মতো চারজন সেপাই তাকে হাত তুলে

www.pathagar.com

নিয়ে ভেতরে প্রবেশ করে। চাবুকের আঘাতে তার দেহ ছাতু হয়ে গেছে। কুকুর পেটপুড়ে খেয়েছে তার গায়ের গোশ্ত। সেপাইরা তাকে এনে হঠাৎ আমাদের উপর ছুড়ে মারে। যেন ঘারের বোঝা নিক্ষেপ করা হয়েছে। আমাদের হিম্মত হয়নি তাকে সপর্দ করার, তার দুঃখ লাঘব করার। সারা দেহ থেকে রক্ত ঝরছিলো, সে রীতিমতো রক্ত স্রোত। গায়ের কাপড় চোপড় সব রক্ত প্লুত। রক্তের কোন্ ধারা কোনখান থেকে বইছে, তা নিশ্চিত করে বলা মুশকিল। সূর্যের আলো উদ্ভাসিত হলে সে ক্ষণেকের তরে চক্ষু খোলে। শেষ বারের মতো দুনিয়াকে দেখে নেয় একবার। এরপর জোরে চিৎকার দেয়, আমার মনে হয়, যেন তার চিৎকারে কারাগার পর্যন্ত কেঁপে উঠেছে। এরপর সে চিরতরে ঘুমের কোলে ঢলে পড়ে।

পরে এ ভয়াল রাতের যে বিবরনী পেয়েছি, তাতে জানা যায় যে, এ রাতে দু'টি মানব প্রাণ দুনিয়া থেকে চির বিদায় নিয়েছে। চল্লিশজন আহত হয়েছে মারাত্মকভাবে। কয়েক জন সেপাই এসে একটা কম্বলে পেচিয়ে সামরিক অসিফারের লাশ নিয়ে যায়। কোথায় নিয়ে যায়, কেউ তা জানেনা। কেয়ামতের দিন সে উঠে তার উপর কৃত যুলুম সিতমের বিবরণ দিতে পারে। আমাদের তার বিবরণ দেয়া সম্ভব নয়।

দিনের উদয় হয়েছে। সূর্য রওশন হয়েছে। ঝংকার শুরু হয়েছে নির্যাতনের হাতিয়ারের। আমি আপনার কাছে একথা গোপন রাখতে চাইনা যে, রাতে যারা নশ্বর পৃথিবী থেকে বিদায় নিয়েছে, তাদের কারো জন্য কেউ শোক দুঃখ প্রকাশ করেনি। আমাদের কারো অন্তরে শোক-দুঃখের জন্য কোন স্থান ছিলনা। ব্যাথা-যন্ত্রনা আর ভয়ে ত্রাসে আমরা জড়সড়। বরং শাস্তি থেকে মুক্তি পেয়ে যারা সাহাদাত লাভ করেছে, খোদার দরবারে হাযির হয়েছে তারা হাসি মুখে, তাদের জন্য বরং ঈর্ষা জাগে আমাদের মনে। স্টোরের দরজা কিছুটা ফাঁক হলে উকি মেরে বাইরে আঙ্গিনার অবস্থা দেখার সুযোগ হয় আমার। রাতের অসম্ভব গরম অনিদ্রা, ব্যথা আর পেশাব পায়খানায় একাকার পরিস্থিতি দেখে চোখতো এমনিতেই ভারী হয়ে আছে। আর কিছু দেখার মতো অবস্থা নেই চোখের। তার পরও যে দৃশ্য দেখতে পেয়েছি, তা কিছুতেই ভুলবার নয়। একদল সেপাই হাতে চাবুক নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ে

www.pathagar.com

একজন বৃদ্ধের উপর। বৃদ্ধ চিৎকার করছে আর বার বার দোহাই দিচ্ছে। প্রতিবার দোহাইয়ের জবাব দেয়া হচ্ছে চাবুকের ঘা দিয়ে। চাবুকের আঘাতে তার দুর্বল দেহ আরও দুর্বল হয়ে পড়ে। দয়া ভিক্ষা করতে করতে এক সময় তার দু'হাত উপরে উত্থিত হয় এবং সে চুপ হয়ে যায়। চিরতরে চুপ। আসমানের দিকে তার হাত দোয়ার জন্য উত্তোলিত হয়েছিলো, না ফরিয়াদের জন্য, আমি তা অনুমান করতে পারিনি।

সামনের দেয়ালে দু'টো বড় ছবি ঝুলিয়ে দেয়া। একটা জামাল আব্দুল নাসেরের, আর অপরটা ফিল্ড মার্শাল আব্দুল হাকীম আমেরের। ছবিগুলো কোন শিল্পির আঁকা নয়। যেন প্রথম শ্রেণীর শিশুর হাতের আঁকা। ছবির উপরে বড় বড় অক্ষরে লেখা ছিলো ঃ আমি ক্ষুধার্ত মানুষকে ধোকা দেই, যেন ইচ্ছানুযায়ী জীবন যাপন করতে পারি। অবশ্য একথাটি কে লিখে দিয়েছে, তা জানা যায়নি।

আমার মনে হচ্ছিলো, যেন আমার প্রাণ গুড়িয়ে যাচ্ছে। আমার আশপাশে যা কিছু সবই। সে সম্পর্কে চিন্তা করারও আমার হুঁশ নেই। যে সব যুলুম-নির্যাতন চলছে, তারতো কোন কারণ নেই। নেই এর কোন বৈধতা। এ ভয়ংকর ড্রামা কোন্ আকারে শেষ হবে, তা কল্পনা করাও কঠিন। অনাগত প্রতিটি মুহূর্ত সম্পর্কে আমি কেবল ভাবি আর ভাবি। মানুষের শক্তি-সামর্থ সীমাবদ্ধ। তাই এ সীমিত শক্তি নিয়ে এতো নির্যাতন সহ্য করা অসম্ভব। পরিস্থিতির সামনে আত্মসমর্পন করা ছাড়া আর উপায় কি ?

ধীরে ধীরে আমি মন থেকে অবসাদ, বিসন্নতা আর হতাশার চিহ্ন মুছে ফেলতে সক্ষম হই। আমি সে সব মহাপ্রাণ ঈমানদারের কথা স্মরণ করি, যারা নিজেদের জীবন বিপন্ন করে ইসলামের ভিত্তি প্রতিষ্ঠিত করেছেন। তাঁরা আল্লাহর সাথে কৃত অঙ্গীকার পূরণ করেছেন। আমি অন্তরের গভীর থেকে দোয়া করি, আল্লাহ আমাকে তাঁদের পর্যায়ভুক্ত করুন। কোন প্রকার হা-হুতাশ ছাড়াই আমি যেন এসব কঠিন পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হতে পারি।

এক কদাকার, বদ স্বভাব এবং বদসুরত সেপাই স্টোরে প্রবেশ করে। জানা যায়, তার নাম রুবী। রুবী অকথ্য-অশ্রব্য গালীর বৃষ্টি বর্ষণ করে। কিছু গালি বুঝা যায়, অনেক গালি-ই বুঝা যায় না। দুর্বোদ্ধ। অবশ্য

www.pathagar.com

এ টুকু বুঝতে পারি যে, কে আমাদেরকে অশ্লীল গালী দিচ্ছে। তাঁর হাতে একটা ময়লা মাখা পাত্র। ময়লা যুক্ত হাতের আঙ্গুল দিয়ে সে আমাদেরকে এক টুকরা সাধারণ খাবার দিচ্ছিলো। খাদ্য বন্টন কালে দু'বার সে নাক ছাফ করে এবং গায়ের সরকারী পোশাকের সাথে তা মুছে। আমার মনে আছে তাকে দেখে আমার মনে কোন ঘৃণা জাগেনি। আমি আগেই উল্লেখ করেছি যে, পরিস্থিতি ছিলো সবকিছুর উর্ধে, কাজেই ঘৃণা সৃষ্টির কোন প্রশ্নই উঠেনা সাধারণ খাবার বন্টন শেষে আমার মাথার উপর কয়েকটি রুটি ছুঁড়ে মেরে সে চলে যায়। আমরা তা কুড়িয়ে নিয়ে দেখি, রুটি নয় রুটির টুকরো মাত্র। সব মিলে পাঁচটা রুটি হতে পারে। অথচঃ সংখ্যায় প্রায় ৫০ জন। প্রতি দশ জনের জন্য একটা রুটি। তা-ও ভীষণ ক্ষুধার পর। এ সত্ত্বেও আমাদের অনেকে তা খেতে অস্বিকার করে। এটা প্রতিবাদ হিসেবে নয়; বরং ভয়ে ত্রাসে আমাদের অবস্থা এমন দাঁড়িয়ে ছিলো যে, ক্ষুধার অনুভূতিই হারিয়ে বসেছিলাম।

কিছু দিন পর উক্ত সেপাই আবার আসে। চিরাচরিত অভ্যাস অনুযায়ী আমাদেরকে গালি দিতে ভুল করেনি। তার ডান হাতে একটা লম্বা লোহার শলাকা, বাম হাতে এলমুনিয়ামের পুরাতন পাত্র। চায়ে ভরা। লোহার শলাকা দিয়ে সে অনেকের মাথায় আঘাত করে। এ সময় পাত্রের অনেক চা মাটিতে পড়ে যায়। অবশিষ্ট চা সম্পর্কে ঘোষণা দেয়; যেটুকু চা এখনও পাত্রে অবশিষ্ট আছে, তা ৬ নম্বর ষ্টোরের অবস্থানকারী ৫০ জনের মধ্যে বন্টন করা হবে। আমরা চা পান করতে অস্বীকার করি। কারণ, আমাদের কাছে এসব জিনিষের কোন মূল্য ছিলনা। যোহর পর্যন্ত চা সেখানে পড়েছিলো, রুবী যখন জানতে পারে যে, আমরা চা পান করিনি। তখন সে তেলে বেগুনে জ্বলে উঠে। রাগে থর থর করে কাঁপছিলো সে। আমাদেরকে পিটিয়ে রুটি বানিয়ে ছাড়ে সে চা পান না করার অপরাধে।

সে যাওয়ার পর আর একজন সেপাই আসে। এ আরও বদসুরত, আরও কঠোর। সে আমাদেরকে পায়খানার জন্য বেরুতে বলে। আমরাতো শুনে আনন্দিত। পেশাব-পায়খানা করা যাবে, হাত-মুখ ধোয়া যাবে।

www.pathagar.com

এছাড়া পেশাবের পরিবর্তে নলের মুখে খাবার পানি পান করা যাবে। কিন্তু আমাদের এ আনন্দ বেশীক্ষণ স্থায়ী হতে পারেনি পায়খানা ছিলো প্রথম তলায়। আমরা পায়খানার দিকে ছুটি। পথে আমাদের উপর নিক্ষেপ করা হয় ময়লা—আবর্জনা। আমাদের প্রতি লেলিয়ে দেয়া হয় কুকুর। আমাদের প্রত্যেককে আলাদা আলাদা পায়খানায় ঢুকানো হয়। পায়খানার দশা ছিলো শোচনীয়। পায়খানা-পেশাবে সব যায়গা ভরা। সবচেয়ে বড় কথা, তাতে এক ফোটা পানিও নেই। আমি যখন দরজা বন্ধ করে মলত্যাগ শুরু করি, ঠিক তখনই সেপাই এসে দরজা খুলে আমাকে চাবুক মারতে শুরু করে। আমি পড়েছি ভীষণ বিপদে। বুঝতেই পারছিলামনা যে, সে চায় কি? কালো চেহারা, কোঠরাগত চক্ষু। তার দাঁতের মাড়ি এবং দাঁতে দীর্ঘদিন থেকে ময়লা জমে দুর্গন্ধের ডিপো হয়ে আছে। কুৎসিৎ চেহারার ধবলের সফেদদাগ। তাকে দেখে আমার মনে পড়ে ডারউইনের থিওরীর কথা। মনে পড়ে নরওয়ের খ্যাতনামা নাট্যকার ইবাসেনের কথা। সে বিশ্রী মুখ মেলে ধরে হুংকার ছেড়ে বলে ঃ

ঃ কুত্তার বাচ্চা, বেরিয়ে আয় ঃ

ঃ বাবুজি, একটু থামুন।

ঃ কম বখ্‌ত্‌.....কমীনা,.....কুত্তা,.....আমার সামনে আবারও কথা বলিস।

এ শব্দগুলোর সাথে তার চাবুক সর্বশক্তি দিয়ে আমার খবর নিচ্ছিলো। চাবুকের আঘাত খাওয়া ছাড়া পায়খানায় গিয়ে আমার কোন লাভ হয়নি। আমার মুখ স্কন্ধ এবং পিঠে এখনও চাবুকের চিহ্ন বর্তমান। সে দাগ মুছেনি এখনও। অন্যান্য সাথীদেরকে দেখেছি, অস্থির ইঁদুরের মতো তারাও এদিক-ওদিক ছুটাছুটি করছিলো। আর সেপাই জানোয়ারের মতো তাদের পেছনে ছুটাছিলো। এ সময় চাবুকের গুঞ্জরন এবং কুকুরের ঘেউ-ঘেউ পরিবেশকে করে তুলছিলো অসহনীয়।

চাবুকের আগুনে অনেকে পুড়ে ভাজা মাছ হয়ে থাকে। রাগে-ক্ষোভে আমিও তাদের মধ্যে পড়েছিলাম। আমি দেখি, একজনও মল-মূত্র ত্যাগ করতে পারেনি। সকলে গভীর নীরব। সেপাই সকলকে বেষ্টন করে আছে। একব্যক্তি ক্রুদ্ধ হয়ে হাত তুলে আত্ম বিস্মৃতির পরিবেশে কেঁদে বলে ঃ

www.pathagar.com

এটা যুলুম, মারাত্মক যুলুম। তাঁর পাশেই ছিলো আর একজন বন্দী। এক হাই স্কুলের প্রধান শিক্ষক। তাঁর চুলের শুভ্রতা প্রমাণ করছিল যে, অনেক প্রবীন, অনেক অভিজ্ঞ। তিনি বললেনঃ আমরা সকলেই জানি এটা যুলুম। কিন্তু আপনাকে আত্ম সংবরণ করতে হবে। এমন শব্দ মুখে উচ্চারণ করবেননা। আমরা জানিনা, আজ আমাদের মধ্যে কার মৃত্যু হবে। তাঁর কথাগুলো শুনে গোটা ষ্টোরে সর্বাত্মক নীরবতা বিরাজ করে। বাইরে থেকে আসা চাবুকের গুঞ্জরন এবং মযলুমদের ক্ষীণ আর্ত কিৎকার এ নীরবতা ভাংছিলো কেবল।

আমরা সকলে চিন্তায় ডুবে যাই। আমার মনে ছেয়ে যায়, কেল্লার কারাগারে সরকারী অফিসারের উক্তি—মানে খানগার শা'বান। শা'বান তুমি কোথায়! তোমার জন্যে আমার ধ্বংস অনিবার্য। তোমার সম্পর্কে আমাকে জিজ্ঞেস করা হয়। অথচঃ আমি তোমাকে জানিনা। তোমাকে না চেনার অপরাধ আমার জন্য মৃত্যুর পয়গাম বয়ে আনছে। শাবান' চাবুকের বর্ষণ ধারার মধ্যে মৃত্যু বড় যন্ত্রাদায়ক। শাবান! ঠিক এমুহূর্তে হয়তো তোমার পিঠেও চাবুক পড়ছে। কে তুমি? কোথায় তুমি, হে শবান। খানগার অধিবাসী শাবান।

আমি ব্যাকুল হয়ে ষ্টোরের লোকদেরকে এক এক করে জিজ্ঞেস করছিলাম ক্ষীণ কন্ঠে। বন্ধুগণ! তোমরা খানগার অধিবাসী শা'বানকে চেন কেউ? হিচকি ধরা এক ব্যক্তি থর থর স্বরে বলে—আমি খানগার অধিবাসী। আমার জানামতে সেখানে শা'বান নামে কেউ নেই। হাঁ, ৬০ বছরের একজন বৃদ্ধের সম্ভবতঃ এ নাম। বৃদ্ধটি সেখানে একটা ডিসপেন্সারীর চাপরাশী।

আমি আরও কাছে গিয়ে অত্যন্ত করুণার সুরে তাকে জিজ্ঞেস করিঃ ডিসপেন্সারীর শাবানের সাথে তোমার কোন সম্পর্ক আছে কি?

ঃ না। তার সাথে আমার কোন সম্পর্ক নেই। সে পড়া লেখা জানেনা। রাজনীতিতো তার মাথায় ই ধরেনা।

ঃ ইখওয়ানের সাথে তার কোন সম্পর্ক আছে কি?

www.pathagar.com

ঃ না। কখনো না।

ঃ কিভাবে জানলেন সে, ইখওয়ানের সাথে তার সম্পর্ক নেই ?

সেপাইদের আগমণের ভয়ে আরও চাপা স্বরে—

ঃ আমি ইখওয়ানের লোক। আমি নিশ্চিত করে বলতে পারি, ইখওয়ানের সাথে সম্পর্ক আছে, শাবান নামে সেখানে কেউ নেই।

আমি আরও লেপে্‌ট পড়ে খোদা রাসুলের দোহাই দিয়েজিজ্ঞেস করি—

ঃ দয়া করে কিছু বলবেন ?

ঃ আপনি কি চান ?

ঃ শাবান সম্পর্কে আমাকে কিছু তথ্য দিন।

ঃ ডিসপেন্সারীর চাপরাশী শাবান ?

ঃ হাঁ।

ঃ কেন ?

ঃ কারাগারের জল্লাদরা শাবান সম্পর্কে আমাকে জিজ্ঞেসাবাদ করবে। অথচঃ তার সম্পর্কে আমি কিছুই জানিনা।

অত্যন্ত মনমরা ভাবে কথা শেষ করে তিনি বললেন—

ঃ আমাদের প্রত্যেকেই কোন না কোন বিপদে পড়ে আছে। আমিতো আপনাকে বলেছি যে, ডিসপেন্সারীর শাবান নিরিহ লোক। রাজনৈতিক তৎপরতার সাথে তার কোন যোগাযোগ নেই। সে সম্পর্কে বর্তমানে মিশরের রাষ্ট্র প্রধানকে—এটাও হয়তো তার জানা নেই। সে শাবান সম্পর্কে আপনাকে জিজ্ঞেস করা হচ্ছে, সে হয়তো খানগার শাবান নয়। তার সম্পর্কে আপনি বেশী ভাববেননা। আমাকে ও ভাবাবেননা।

ঃ কিন্তু… … …

তিনি কথা কেটে বললেন—

ঃ দয়া করে চুপ করুন। আমার মাথা এমনিতেই অস্থির, যে টুকু বলেছি, তার চেয়ে বেশী শাবান সম্পর্কে আমার কিছু জানা নেই।

এরপর সে যথারীতি উদাস পৃথিবীর দিকে মনো নিবেশ করে, বিভ্রান্ত নেত্রে এদিক তাকায়। ভয়-শংকা আর চিন্তায় আগের মতোই ডুবে যায়।

www.pathagar.com

আমি শা'বানি সম্পর্কে তার কাছ থেকে কিছু বের করার চেষ্টা করি, কিন্তু ব্যর্থ হই। উদাস চোখের ফাঁকে আমি সাথীদের চেহারা দেখি। অধ্যয়নের চেষ্টা করে, অবচেতন ধরায় তা পর্যালোচনা করি। হিংস্রজন্তু যেমন শিকারকে চিবিয়ে খায়। মনে হচ্ছিলো, ভয় যেন তাদের চেহারাকে ঠিক তেমনি চিবিয়ে খাচ্ছে। হলুদ বর্নের চেহারায় দুঃখ-ব্যথার কালো ছাপ। তাতে গাড়ো রক্ত মাখা মাটির স্তর জমে আছে। কোন কোন চেহারায় এখনও তাজা রক্ত চক-চক করছে। ভ্রুর উপর থেকে গড়িয়ে চেহারায় রেখা টেনে তা মানবতার শোক গাঁথা রচনা করেছে। কিন্তু রক্তের এসব রেখার প্রতি তাদের কোন ভ্রুক্ষেপই নেই। তারা ছিলো সম্পূর্ন উদাস। কতো বিরল এ দৃশ্য যে, চেহারা এবং কাপড়ে রক্তের ধারা বয়ে যাচ্ছে আর তা মুখে গিয়ে পড়েছে তারা শুধু আঙ্গুল দিয়ে মুছে ফেলছে। এ ছাড়া কিছুই করতে পার-ছেনা তারা।

এক এক করে অনেক চেহারার প্রতি তাকাই আমি। সব চেহারাই ধুলো মলিন, রক্ত মাখা। এমন কোন চিহ্ন বর্তমান নেই, যা এক চেহারাকে অপর চেহারা থেকে পৃথক করে। অবশেষে আমার দৃষ্টি নিবদ্ধ হয় এ বিশেষ চেহারায়। সূর্যোদয়ের পূর্বক্ষণে এখানে তার আগমণ। জানিনা অন্ধকারের মধ্যে কেন তার উপর আমার দৃষ্টি নিপতিত হয়েছে। সূর্যের আলো বিক-শিত হলে আমি তাকে স্পষ্ট দেখে নেই। ইতিপূর্বে সামরিক অফিসারের মৃত্যুতে আমি এতটা বিসম-বিমর্ষ ছিলাম যে, বলতে গেলে আমার হুঁশই ছিলনা। এখন মন একটু শান্ত হলে এ নবাগত সাথীকে ভালোভাবে দেখার সুযোগ হয়।

আতেক নবীলার দাস্তান

আমাদের এ নূতন সাথী অতি সুদর্শন যুবক। ফুলের মতো চেহারা। বয়স পচিশের কাছাকাছি। মুখে মৃদু হাসি সদা লেগে আছে। যেন বাতি জ্বলছে আর কি। গায়ের পোশাকও তেমনি মানান সই। গোঁফ দাড়ি দুটোই ছাফ। আত্মহারা হয়ে ডান হাতের আঙ্গুলের সাথে খেলা করার চেষ্টা করছে অতঃপর দৃষ্টি নিবদ্ধ করছে একটা বিশেষ স্থানে। সে মুখে হাসি ফুটাবার চেষ্টা করেও ব্যর্থ হচ্ছিলো যেন। আমিও আত্মহারা হয়ে

www.pathagar.com

সকলকে দেখে অবশেষে তার দিকে তাকাতাম। আমি যে তাকে বার বার দেখছি, তা সে-ও বুঝতে পাচ্ছিলো। আমি মনে মনে বলছিলাম—

ঃ আমি কি তাকে ইতিপূর্বে কোথাও দেখেছি? কোথায়? কখন? একটু পরই তার কি পরিনতি হবে? আমার নিজেরইবা কি পরিনতি হবে। আমরাতো ধ্বংসের দ্বারপ্রান্তে পেঁাছেছি। মৃত্যুর তীব্র গন্ধ পাচ্ছি। এখানে আমাদের সকলকে একটা বিষয়ের মুখোমুখি হতে হবে। তা হচ্ছে মৃত্যু। নিশ্চিত মৃত্যু।

যুবকটি আমার কাছে আসে। একেবারে নিকটে। আগেও তেমন দূরে ছিলনা। কিন্তু এখন আরো কাছে এলো। অতি সঙ্গোপনে আমার কানে কানে বললো আস্থার সাথে—

ঃ আমি আপনাকে একটা অতীব গুরুত্বপূর্ণ কথা বলতে চাই।

আমারতো চক্ষু ছানাবড়া। যুবকটি কোন গুরুত্বপূর্ণ বিষয় আমাকে জানাতে চায়। আমি মনের অবস্থা গোপন করে বললাম—

ঃ আমিতো আপনাকে চিনিনা। ইতিপূর্বে কখনো দেখিনি।

সে যেন শুনেও শুনলোনা। আমার মনে হলো, তার হাসি কিছুটা সজীবতা পেয়েছে। অবশ্যই পরে জানতে পেরেছি যে, এটা ঠিক নয়। আমার নিছক কল্পনা মাত্র। সে বললো—

আমার নাম আতেফ। আমি ব্যাংক অব মিশরে কাজ করি।

ঃ না ভাই, আমি আপনাকে চিনতে পারলামনা। পূর্ব পরিচিত বলেও মনে পড়েনা।

ঃ শব্দ বড় করবেননা। আমি যা বলি, মনোযোগ দিয়ে শুনুন।

আমি মনে মনে ভাবলাম, যুবকটি বোধ হয় কোন সংকটে পড়েছে। তার ধারণা হয়তো আমি তাকে কোন প্রকারে সাহায্য করতে পারবো। মনে পাথর বেঁধে অবশেষে আমি তার কথা শুনার মনস্থ করি। সে অতীব আগ্রহ নিয়ে আমার দিকে এগিয়ে আসে। তার চিন্তাক্লিষ্ট চক্ষু দেখে আমি নিজেও চিন্তিত হয়ে পড়ি তাকে জিজ্ঞেস করি—

ঃ আপনি চান কি? আমি প্রস্তুত, যদি আপনার কোন কাজে আসি।

ঃ সত্যিই কি আপনি আমাকে চেনেননা?

ঃ না মোটেই না।

www.pathagar.com

ঃ চিন্তা করে দেখুন। আপনার চেহারা আমার কাছে পরিচিত মনে হয়না। আমার মনে হয়, কোথাও যেন দেখেছি আপনাকে।

ঃ বিশ্বাস করুন, এর আগে কোথাও দেখিনি আপনাকে।

ঃ তাহলে আপনার চেহারা আমার কাছে পরিচিত মনে হচ্ছে কেন?

ঃ তা আমি কি করে বলবো ?

ঃ আপনি কি গোপন কথা মনের কোনে লুকিয়ে রাখতে পারবেন ?

ঃ নিঃসন্দেহে। কিন্তু আমার কাছে রহস্যের কথা প্রকাশ না করে নিজের কাছে গোপন রাখাই কি ভালো হয়না ? সম্ভবত·········।

ঃহতে পারে কি আবার ? সব মানুষইতো রহস্য গোপন রাখতে পারে।

ঃ পারে বটে। যদি সে হয় চাবুকের চেয়েও শক্ত।

ঃ চাবুক কি মানুষের চেয়েও শক্ত।

ঃ হতে পারে।

ঃ যাহ হোক। আমি রহস্যের কথা তোমাকে বলছি।

ঃ আমি তো তোমাকে ধৈর্য ধারণ করার পরামর্শ দেবো।

ঃ ওসব ছাড়তো। শুন আমার কথা।

ঃ বিশেষ করে আমাকে কেন বলতে চাও এ রহস্যের কথা ?

ঃ তোমার চেহারা আমার পরিচিত মনে হয়, তাই।

ঃ তোমার ধারণা ঠিক না, ওতো হতে পারে !

ঃ হোক। কোন পরওয়া নেই।

ঃ আসলে তুমি আমার মধ্যে আকর্ষণ সৃষ্টি করছে ।

ঃ হতে পারে। কারণ আমরা বন্ধু কি না ?

ঃ অতীতে তো আমাদের বন্ধুত্ব ছিলনা।

ঃ তাতে কি ? এখন বন্ধুত্বের সম্পর্ক গড়ে তুলবো।

ঃ আসলে তুমি তামশা করছো।

ঃ না, তা-নয়। যা বলছি, ভেবে-চিন্তে বলছি।

তার কথা শুনে আমায় হঠাৎ হাসি পায়। হাসি পায় এজন্য যে, এ অবস্থায়ও সে বন্ধুত্ব করার কথা চিন্তা করতে পারছে। হয়তো অনাগত বিপদের আশংকায় সে পারস্পারিক সম্পর্ক সুদৃঢ় করার কথা ভাবছে। ভাবছে নিজেদেরকে ঐক্য সূত্রে আবদ্ধ করার কথা। হয়তো সে কোন বিষয়ের আশ্রয় নিতে চায়। হয়তো·········হয়তো·········।

www.pathagar.com

মনে হলো, তারশিশু সুলভ চেহারা দুঃখ-বেদনায় ডুবে আছে। তার চোখের চাহনিতেও ছিলো বেদনার অকৃত্রিম মিশ্রন। সে আরও একবার হাসে। প্রীতি মাখা হাসি। মিঠো-আন্তরিকতায় ভরা হাসি। তার ঐ হাসি সৃষ্টি করছে এক অনবদ্য পরিবেশ। আমারও হাসি আসে। আমি তাকে বলি—

ঃ হাঁ, ঠিক আছে। তোমার বন্ধুত্বের প্রস্তাব মনযুর। আমরা এখন থেকে বন্ধু হলাম। আমার নাম.....।

সে কথা কেটে—

ঃ আমিতো সে রহস্যের কথা ভুলে গেছি।

ঃ কি সে রহস্য ?

ঃ সে সম্পর্কে একটু আগেই তোমাকে বলেছিলাম।

ঃ ঠিক আছে। কোন অসুবিধা নেই। বল দেখি। আমি কান পেতে শুনবো, সে সতর্কতার সাথে এদিক-ওদিক দৃষ্টি নিক্ষেপ করে। বিষয় বস্তুর গুরুত্বের ছাপ ওর চেহারায় পরিপুষ্ট। সে বলে—

ঃ আমার আলোচনার মধ্যমনি নবীলা।

ঃ নবীলা ?

ঃ হাঁ নবীলা।

ঃ কোন নবীলা ? সে আবার কে ?

ঃ অপেক্ষা করুন, আমি সব কিছু খুলে বলছি।

আমার মনে নূতন করে ভয় জাগে। একটু আগে যে মনোরম পরিবেশ সৃষ্টি হয়েছিল, তা উবে যেতে থাকে। কারণ এখানে আমি কোন মেয়ের নাম শুনতে চাইনা। পরিস্থিতি ছিলো এমন যে, কারো নাম মুখে উচ্চারিত মাত্রই তাকে গ্রেফতার করে এখানে নিয়ে আসা হতো। কারা কর্মকর্তাদের অনুরাগী তা সে ভূত-প্রেত যাই হোকনা কেন, ছাড়াছাড়ি নেই। কিন্তু আমার মনে যে চিন্তা দেখা দিয়েছে, বন্ধু আতেফের সে সম্পর্কে কোন খবরই নেই ? সে যেন একেবারে বিক্ষিপ্ত। কথা বলার দিকেই তার আগ্রহ। সেদিকেই মন। রুগ্ন স্বরে সে বলে—

আমি তাকে পেয়ার করতাম। সে-ও আমাকে পেয়ার করতো।

আমার মনে পরিহাস জাগে। আমি বললাম—

www.pathagar.com

ঃ তুমি কি এখানে আমাকে প্রেমের দোস্তান শোনাতে চাও ঃ

ফেল ফেল আমার দিকে তাকিয়ে—

হাঁ, এতে দোষের কি আছে?

আমি বললাম—

ঃ ব্যাপারতো কিছুই নয়। কিন্তু এমন সব কাহিনীর জন্য এটা কি উপযুক্ত স্থান?

সে বলে—

ঃ আমিতো সম্পূর্ণ উপযুক্ত মনে করি।

আমি গভীর দৃষ্টিতে তার মুখের দিকে তাকাই। মনে হলো, সে সম্পূর্ণ দিওয়ানা হয়ে পড়েছে। আমি মনে ভীষণ আঘাত পেলাম। আমার অন্তর টুকরো টুকরো হয়ে যায়। সে তো রীতিমতো ভারসাম্য হারিয়ে ফেলেছে। যেভাবে তাকে কারাগারে নিয়ে আসা হয়েছে, তাতেইতো মানসিক ভারসাম্য হারিয়ে ফেলার কথা। আমি যার পরনাই বিস্মিত হই। ভাবি এখন কি করা যায় তার জন্য। হয়তো কিছুই করার নেই আমার এ সময় সে, ডুকরে কেঁদে উঠে। কাঁদতে কাঁদতে বলে—

ঃ তারা জোরপূর্বক তাকে নিয়ে যায়। আমি খোদার দোহাই দিয়ে তাদেরকে বলি তাকে ছেড়ে দেয়ার জন্য। কিন্তু তারা কোন কিছুই শোনেনি। কী ভালো ছিলো সে। তার ব্যথা ভরা কথামালা আমার অনুভূতিতে তোলপাড় সৃষ্টি করে। আমি কথা দেব। জিজ্ঞেস করি—

ঃ কার কথা বলছো তুমি?

ঃ নবীলার কথা। কাল আমাদের বিয়ে হওয়ার কথা ছিলো। বিয়ে পড়াবার জন্য কাজী মোল্লাও হাযির। কিন্তু হঠাৎ… …।

ঃ কিন্তু কি হলো?

ঃ আমাকে এবং তাকে ধরে নিয়ে যাওয়া হয়। তাকে নিয়ে যাওয়া হয় টেনে হেঁচড়ে।

ঃ কে?

ঃ ইন্টেলিজেন্সের লোকজন।

ঃ বিয়ের অনুষ্ঠান থেকে?

ঃ হাঁ, বিয়ের অনুষ্ঠান থেকে। তখনো বিয়ে পড়ানো হয়নি।

ঃ কেন?

www.pathagar.com

ঃ কিছুই জানিনে।

ঃ মনে হয়, ইখওয়ানের সাথে তোমাদের সম্পর্ক ছিলো?

ঃ আমরা উভয়ে মুসলমান। ইসলামকে ভালো বাসি।

ঃ এটাতো ঘন-কালো যুগ। ইন্টেলিজেন্সের লোকজন মুসলমানদেরকে পাকড়াও করছে।

ঃ কাকে খুশী করার জন্য?

ঃ রাশিয়াকে খুশী করার জন্য। আমেরিকাকে খুশী করার জন্য। ইহুদীদেরকে খুশী করার জন্য।

ঃ ইহুদীদেরকেও খুশী করতে চায়?

ঃ নিঃসন্দেহে।

ঃ আমরা কি ইহুদীদের দুশমন নই। তাদের সাথে কি আমাদের যুদ্ধাবস্থা বিরাজ করছেনা।

ঃ আমাদের গিজ গিজ-ফিসফিস শব্দ শুনে এক বৃদ্ধ কয়েদী আমাদের কাছে আসে। তার চেহারায় সিজদার দাগ থেকে রক্তের ধারা বাইছিলো। বললো—

ঃ উপরে উপরে আমরা ইহুদীদের বিরোধী, কিন্তু তালে তালে আমরা তাদের বন্ধু। সত্যিকার খাদেম।

আমি জিজ্ঞেস করি—

ঃ আমরা মানে?

ঃ ইন্টেলিজেন্সের লোকজন, জন-নিরাপত্তা বিধানকারী সংস্থা এবং তাদের পৃষ্টপোষক।

আমি বললাম—

ঃ আপনিতো মারাত্মক কথা বলছেন।

ঃ আমি সত্য কথা বলছি। শাসক শ্রেণীর কর্মপন্থা জাতিকে দুর্বল করছে। এ জাতি ভবিষ্যতে কোন যুদ্ধ করতে সক্ষম হবেনা।

ঃ কোন্ যুদ্ধ?

ঃ এ ধরপাকড় শেষ হওয়ার পর আমাদের দেশ ইসরাঈলের সাথে এক নূতন যুদ্ধে জড়িয়ে পড়বে। কিন্তু ইসরাঈলের হাতে এদেরকে চরম পরাজয় বরণ করতে হবে। পরাজয় জাতির ভিত নড়বড়ে করে তুলবে

ঃ খোদার শপথ, আপনিতো অতি কড়া কথা বলছেন।

www.pathagar.com

ঃ ভবিষ্যতে এমন কথা তোমার কানে আসবে, যা তুমি এমন কল্পনাও করতে পারছনা।

আতেফ নির্বাক বসে ছিলো আমাদের কাছে। হয়তো আমাদের কথা বুঝতেই পারছিলনা সে। সে-তো ছিলো তার ভুবনে ডুবে। বার বার তার মুখ থেকে উচ্চারিত হচ্ছিলো—

ঃ তারা তাকে টেনে হেঁড়ে কোন এক অজ্ঞাত স্থানে নিয়ে যায়। তারা বলে, আমাদের উভয়কে কারগোরে প্রেরণ করা হচ্ছে। তারা আমার হাত থেকে বিয়ের আংটিও খুলে নেয়।

বৃদ্ধ কয়েদী জিজ্ঞেস করেন—

ঃ আংটি কি স্বর্নের ছিলো?

ঃ জি হাঁ, স্বর্ণের আংটি।

বৃদ্ধ বললেন—

ঃ তোমার কি জানা নেই যে, পুরুষদের জন্য স্বর্ণ হারাম!

এবার সকলে নিজ নিজ চিন্তায় ডুবে যায়। আমি ভাবি কনগার শাবানের কথা। কে সে, কোথায় সে? আতেফ ভাবছিলো বিয়ের মজলিস থেকে গ্রেফতার হওয়ার কথা। আর বৃদ্ধ ভাবছিলেন, ইহুদীরা দেশের ওপর চড়াও হবে।

কারাগারের হজমত

গোটা ষ্টোরে নীরবতা বিরাজ করছে। এসময় হঠাৎ জোরে দরজা খোলে। নীরবতা ভেঙ্গে যায়। ভেতরে প্রবেশ করে এক আনাড়ী সেপাই। তার হাতে ক্ষুর। সে ক্ষুর দিয়ে নর সুন্দররা হজমত বানায়। সে এমন ভাবে ক্ষুর ধরে রেখেছিলো যে, তা দেখে রীতিমতো হৃদয় কেপে উঠে। তার হাতে যেন কোন এক ধারালো অস্ত্র। মানুষের গলা কাটার জন্যই যেন উদ্যত। সে বলে উঠে—

ঃ হে কমবখতের দল! কুত্তার বাচ্চা, কমিনার দল, যাযাবরের পাল! এখন তোমাদের মাথা মোড়ানো হবে। আব্দুন নবী তোমাদের সাথে কথা বলছে। আস্তী আব্দুন নবী। [কথাগুলো সে এভাবে উচ্চারন করছিলো যেন সে বলছে। আমি হচ্ছি নেপোলিয়ন]। আমি হচ্ছি সাবেক হাজ্জাম। বর্তমানে সামরিক বাহিনীর কর্মচারী। এখন আমি তোদের

www.pathagar.com

হজমত বানাবো। বুঝলে ত আমার কথা। কোন কষ্ট-ক্লেশ ছাড়াই তোমাদের বিরাট কাজ হয়ে যাবে। আয়, আমার কাছে আয়।

এই বলে সে আমাদের মধ্য থেকে এক ব্যক্তিকে বাছাই করে নেয়। তার গালি-গালাজ আর ক্ষুর ঘুরানো দেখে আমাদেরতো বেহুঁশ অবস্থা হচ্ছিলো। যাকে প্রথম বাছাই করে নেয়, সে ব্যক্তি সামনে এগিয়ে গিয়ে নিরুপায় হয়ে তার সামনে বসে। তার চক্ষু এমন ছানা বড়া। যেন মৃত্যু তাকে গ্রাস করছে। আমাদের সাথী বন্ধুটি ছিলো শমশ্রু মন্ডিত। আব্দুন নবীর দাবী ছিলো নরসুন্দরদের জগতে সে বিরাট খ্যাতির অধিকারী। আব্দুন নবী তার দিকে এমনভাবে দৃষ্টি হাসে, যেন সে হজমত বানানো নয়, বরং তাকে চিবে খেতে আসছে আর কি। কিল ঘুশি অশ্লীল গালি আর পিটানী কাটতে কাটতে সে হজমতের কাজ সমাধা করে। এতো হজমত ছিলনা, ছিলো একটা উপহাস। তার অর্ধেক দাড়ি আর সজোরে ক্ষুর ছুড়ে মেরে হজমত শোধ করা হয়। তার মাথা থেকে রক্ত বয়ে যায়। ভয়ে অপমানে সে হুঁশ হারিয়ে ফেলে।

দু'ঘন্টারও বেশী সময় হজমতের কাজ চলে। কিন্তু তার নিষ্ঠুরতার সামনে সকলে নির্বাক। শুধু ক্ষীণ কণ্ঠে দুঃখ প্রকাশ করে মাত্র বাইরে কারাগারের আঙ্গিনায় কুকুর খেউ খেউ করছিলো। আর আব্দুন নবীর ক্ষুরও রক্ত প্রবাহিত করছিলো। সেপাইরা অট্ট হাসিতে ফেটে পড়ছিলো। মযলুমদের চিৎকার আর্তনাদের চেয়ে তাদের অট্ট হাসি ছিলো অনেক জোর গলায়। ওদিকে বাইরে পাগলা কুকুরের খেউ খেউ। সব শেষে আসে হজমতের জন্য আমার পালা। আমার কপালে মারাত্মক আঘাত করা হয়। তার দাগ এখনো মুছেনি।

এভাবেই সমাপ্ত হয় এ রক্তাক্ত ড্রামা। আনন্দ চিত্তে ফিরে যায় আব্দুন নবী। যাওয়ার আগে গালী উপহার দিয়ে যায়। সত্য বলতে কি, সে দিন তার মুখে যেসব গালি শুনেছি, তার মধ্যে এমন কিছুও ছিলো যা জীবনে এ প্রথমবার শুনলাম। তার চলে যাওয়ার পর আমরা আঘাত-স্থানে পট্টি বাঁধার চেষ্টা করি। অবশ্য কারাগারে পট্টি বাঁধার মতো কিছু ছিলোনা। আমরা অন্তর্বাস ছিড়ে রক্তের ধারা বন্ধ করার চেষ্টা করি।

আমার মনে আছে, সেপাই এসময় ষ্টোরে আর একজন বন্দীকে ছুঁড়ে মারে। দু'দিন আগে এরা তার উপর এমন নির্যাতন চালায় যে, একান্ত জড়-

www.pathagar.com

সড় অবস্থায় তাকে ফেলে যাওয়া যায়। এমনকি তার আঘাত-স্থানে ক্ষত হয়ে পঁচন ধরে। পুঁজ বের হয়। ভিষণ দুর্গন্ধ ছড়ায়। তাকে ষ্টোরে ফেলা হলে গোটা ষ্টোরে দুর্গন্ধ ছড়ায়। যেন কবর থেকে মানুষ পঁচা গন্ধ আসছে।

সে কাপড়ের পুটলির মতো জড়ো হয়ে পড়েছিলো। ক্ষণেকের তরেও থামেনি তার আর্ত চিৎকার। চিৎকার করে বলছিলো সে—

বন্ধুগণ। আমার পা। বন্ধুগণ! আমাকে বাঁচাও, বাঁচাও। আগুন আগুন, হায় আগুন। আমি মরে গেলাম। তোমাদের মধ্যে কেউ মুসলমান আছে কি? আছে কি খোদাকে ভয় করার মতো কেউ? খোদার শপথ করে বলছি, ইখওয়ানুল মুসলমান সম্পর্কে আমার কিছুই জানা নেই. নেই তাদের সাথে আমার কোন সম্পর্ক। রাজনীতির উপর খোদার লানত হোক। বন্ধুগণ। আমিতো কোচওয়ান। আমায় বলো দেখি, ইখওয়ানরা কি ধরণের লোক। কি ইখওয়ান, আমায় বলো। বন্ধুগণ তোমাদের কেউ কি পায়ের আগুন নেবাবে?

তার বাম পা ছিলো পুঁজে ভরা। ফলে দুর্বল হয়ে পড়েছে। আর এ কারণে জ্বলাপোড়া করছিলে। আমরাওতো নিরুপায়। আল্লাহ তায়ালার কাছে দোয়া করা ছাড়া তার জন্য আর কি-ইবা করার আছে আমাদের।

তীব্র ব্যথায় সে ছটফট করে ভীষণ চিৎকার করলে আমাদের এক সাথীর রক্ত টকবগ করে উঠে। সে লাফ দিয়ে উঠে গিয়ে দরজার কড়া নাড়ে। দরজায় শব্দ পেয়ে জনৈক পাহারাদার হাজির হয়। তাকে দেখে আমার রক্ত শুকিয়ে যায়। আমার ধারনা, সকলেরই এ অবস্থা হয়েছে। আমাদের সাথীকে একাজ থেকে আমরা বারণ করতে পারিনি। হঠাৎ সে একাজটি করে বসে। যাই হোক, আমাদের আশংকা সত্যে পরিণত হয়েছে। দরজা খুললো। শয়তানের মূর্তিধারী বিকট চেহারার বিশজন সেপাই ভেতরে প্রবেশ করে। তাদের প্রত্যেকের হাতে লাঠি। যেন তারা আগে থেকেই প্রস্তুত হয়ে বসেছিলো। ইঙ্গিত পেয়েই তারা ভিতরে প্রবেশ করে অভিযান শুরু করবে। এদের ইনচার্জ ছিলো সবচেয়ে বিকট চেহারার। সে গলাফাটা চিৎকার দিয়ে বলে—

www.pathagar.com

রে কুকুরের বাচ্চারা। ফাঁদে আটকা পড়েছিস এবার। আমরা তোদের পক্ষ থেকে এহেন ভুলের অপেক্ষায়ইতো ছিলাম। এদিকে বেরিয়ে আয় কুত্তার বাচ্চার দল। তারা আমাদেরকে এক সারীতে পাশাপাশি দাঁড় করায়। সে আহত ব্যক্তিটির সহানুভূতিতে আমাদের সাথী এ কান্ডটি করে বসেছিলো, সে আসতে পারেনি। কারণ, সে-তো দাঁড়াতেই পারেনা। না আসার অপরাধে ইনচর্জ তার পায়ে লাঠির আঘাতে তা ছাতু করে ছাড়ে। তার এক পায়ের গোড়ালী ভেঙ্গেও ফেলে। তারা আমাদের সাথে যাকিছু করেছে। আমাদের জন্য তা ছিলো এক নূতন অভিজ্ঞতা। হাত দিয়ে কারাগারের আঙ্গিনা পরিষ্কার করতে আমাদেরকে বাধ্য করে। আঙ্গিনায় স্থানে স্থানে ছড়িয়ে ছিলো কাঁচ ভাঙ্গা। হাত দিয়ে এসব ছাফ করতে গিয়ে আমাদের অনেকের হাত কেটে যায়। লাঠির আঘাত, 'পদাঘাত আর ঘুষিতো ছিলোই। অবশেষে তারা আমাদেরকে বাধ্য করে কারাগারের সিড়ি গুলো জিহ্বা দিয়ে চেটে পরিষ্কার করতে। একাজও আমরা করেছি, মানে করতে বাধ্য হয়েছি। এ সময়তো চাবুকের ঘা আর প্রাণ সংহারী লাঠির আঘাত চলে অবিরাম ধারায়। এসময় পাগলা কুকুর আমাদের দেহের নানা স্থান কেটে খায়। এ শাস্তি ভোগ করার পর আমাদেরকে কুঠরীতে এনে বন্দী করা হয়। আমাদের শরীরের নানা স্থানই নয়, বরং আমদের জিহ্বাএ ছিলো আহত ক্ষত-বিক্ষত। অনেকের জিহ্বার দাগ এখনো মোছেনি।

যে সাথীকে আমরা ব্যথা-যন্ত্রনায় কাতর এবং রক্ত ও পুজের মধ্যে গড়াগড়ি খাওয়া ছেড়ে গিয়েছিলাম, ফিরে এসে দেখি, সে এক সাংঘাতিক কান্ড করেছে। আপন মল মূত্র পায়ে মালিশ করছে। এমনভাবে পায়ের জ্বালা-যন্ত্রনা উপশমের চেষ্টা করছে সে। এসময় সে মূর্ছা যায় এবং অবচেতনভাবে মল-মূত্র খাওয়া শুরু করে ও ভীষণ চিৎকার জুড়ে দেয়। আমরা তাকে এ থেকে নিবৃত্ত করার অনেক চেষ্টা করেও ব্যর্থ হই। এজন্য তাকে দোষ দিয়েই বা লাভ কি। এখানে মানুষের সাথে যে আচরণ করা হচ্ছে, তা কোন জন্তু-জানোয়ারের সাথে করা হলে তার পক্ষেও বরদাশ্ত করা সম্ভব হতোনা। দুঃখ-দুঃখ মানবতার জন্য দুঃখ।

তার এ অবস্থা দেখে আমার চোখে পানি আসে এবং গালের উপর দিয়ে তা প্রবাহিত হয়। আমার অন্তর টুকরো টুকরো হয়ে যায়। হতভাগা এ মযলুমের করুন অবস্থা দেখেও আমাদের কেউ তার সাহায্যের জন্য পাহারা-

www.pathagar.com

দারকে ডাকতে পারেনি। লোকটা সারাদিন এভাবে ছটফট করে। দিন গড়িয়ে রাত আসে। পাহারায় আসে নতুন লোক। সে চিৎকার স্ত্রী-পুত্র পরিজনের নাম ধরে ডাকে। বিনয়ের সাথে পাহারাদারদেরকে বলে মাফ করে দিতে। তার অজানা পাপ ক্ষমা করে দিতে। এসময় তার দেহে ভীষণ কম্পন দেখা দেয়। এক পর্যায়ে এসে তার দেহ শীতল হয়ে যায়। প্রাণ পাখী উড়ে যায় নশ্বর পিঞ্জিরা ছেড়ে। আল্লাহ তাকে মাফ করুন।

ভোরে আমরা যখন তার চেহারা দেখি, তখন স্পষ্ট নজরে পড়ে তাতে নূর বর্ষিত হচ্ছে। শান্তিতে ঘুমিয়ে আছে সে আনন্দের সাথে। সকল প্রকার দুঃখ ভোগ আর নির্যাতন থেকে মুক্তি পেয়ে চিরনিদ্রায় শায়িত সে। নিশ্চিত করে বলা যায় আল্লাহ তাকে রহমত ও মাগফেরাতের ছায়ায় স্থান দিয়েছেন। তার মৃত্যু খবর শুনে ষ্টোরের একজনতো শেষ পর্যন্ত কেঁদে ফেলে। অবশ্য তাকে কাঁদতে হয়েছে নিঃশব্দে। তার কান্না দেখে ষ্টোরের কেউ কান্না থামাতে পারেনি। স্ব-স্ব স্থানে বসে আমরা তার মাগফেরাতের জন্য দোয়া করি। মল-মূত্র আর রক্ত ও পুজের স্তূপের মধ্যে তার লাশ পড়ে থাকে। ভোরে আমরা তার চেহারায় দেখেছি স্বাস্তি আর মোমেনসুলভ হাসি।

আদৌ এক বিন্দু ঘুমুতে পারেনি সামরিক কারাগারে এটা ছিলো আমার দ্বিতীয় রাত। আবুজে'বল কারাগারের খর, এর চারদিন শুমার করলে হয় ছ'রাত। আসলেতো আমরা সবাই এটা বলেই গিয়েছিলাম যে, নিদ্রা মানুষের জীবনে এক অতীব গুরুত্ব পূর্ণ বস্তু। আজ রাত তীব্র পিপাসায় আমার অন্তরআগুনের মতো জ্বলে উঠে। শেষ পর্যন্ত অস্থির হয়ে আমি পাত্রে জমা করা আমাদের পেসাব পান করতে বাধ্য হই।

সূর্য উদয় হয়, সূচনা হয় দিনের। নূতন এক দল সেপাই আসে ডিউটিতে আমাদেরকে মেরামত করার জন্য। যেমন করেছিলো গতকাল সকালে আসা সেপাইর দল। তাদের দেখে আমাদের জনৈক সাথী ক্ষীণ কণ্ঠে বলে উঠে....

ঃ শেখজি, গত রাতে এখানে একজন মারা যায়।

www.pathagar.com

এই বলে সে নিহত ব্যক্তির লাশের দিকে ইশারা করে। তার কথা শুনে সেপাইর মুখে বিদ্রূপ হাসি দেখা দেয়। বলে—

ঃ রে কুত্তার বাচ্চা! মাত্র একজন মারা গেছে এ পর্যন্ত। আমরা ব্রিগেডিয়ার সাম্‌র্স বদরানকে মুখ দেখাবো কি করে!

আমি শুধু ভাবি আর ভাবি। সেপাইরা যে ব্রিগেডিয়ারের কথা বলছে, কেমন মানুষ সে। নিঃসন্দেহে সেতো মানুষ হতে পারেনা। ভয়ংকর মৃত্যুর চিত্র ও কি তার অন্তরে কোন রেখাপাত করেনা। এরপর দু'জন সেপাই লাশ তুলে নিয়ে যায়। তারা তখন অট্ট হাসিতে কেটে পড়ছিল। তারা এমনভাবে লাশ তুলে নিচ্ছিলো, যেন এক তুচ্ছ বস্তু দুনিয়ার সবচেয়ে কম মূল্যের জিনিস আর কি। যাই হোক, আমাদের সাথীটি চির দিনের জন্য আমাদেরকে ছেড়ে চলে যায়। সে কে ছিলো, কোন মাতা তাকে জন্ম দিয়েছিলো, কিছুই আমাদের জানা নেই। জীবনের শেষ মুহূর্তে সে স্ত্রী এবং শিশুদের নাম ধরে ডাকছিলো। আমরাতো কেবল এদের নাম জানতে পেরেছি। হতভাগা দুনিয়ার জীবন শেষ করে আল্লাহর দরবারে উপস্থিত হয়েছে।

আজ আমার মনে নানা চিন্তা তোল-পাড় করে। জীবন কি, মৃত্যু কাকে বলে, যুলুম কি, ইনসাফ কি, কি সম্মান কি, কি অসম্মান, ভালোবাসা কোন বস্তুর নাম, শত্রুতা কাকে বলে, ক্ষুধা কি জিনিস, ভয় কাকে বলে, ? এসব নানা প্রশ্ন, নানা জিজ্ঞাসা আমার মনে তোল পাড় সৃষ্টি করে। আমি ভাবি, এসব কি নিছক শব্দের গোলক ধাধা। না এসবের তাত্ত্বিক কোন মূল্য আছে। আমি আরও ভাবি, এই যে আমি, তা কি। এটা কি নিছক একটা শব্দ মাত্র? দুঃখ কি, একটা শব্দ মাত্র? তাগুত কি? এসব কি শুধু শব্দ। সত্য-মিথ্যাওতো শব্দ মাত্র। শব্দে শব্দেওতো পার্থক্য হয়। খবীছ-নাপাক বলেওতো একটা শব্দ আছে। যার উদাহারণ নাপাক বৃক্ষ। মাটি উপরিভাগ পর্যন্তই তার শিকড় প্রসারিত। তার কোন স্মৃতি নেই, স্থিরতা নেই। আবার তাইয়্যেব বা পাক বলেওতো একটা শব্দ আছে। এর উদাহারণ পাক বৃক্ষ। তার শিকর মাটির গভীরে বিস্তৃত। আর শাখা-ডাল-পালা সুদূর আকাশে বিস্তৃত। প্রভু পরয়ারদেগারের নির্দেশে এ বৃক্ষ প্রতিনিয়ত ফল দান করে

www.pathagar.com

থাকে। আল্লাহ তায়ালা মানুষকে এমন উপমা দিয়ে বুঝান। এই যে জীবন, তাওতো শব্দের মার প্যাঁচ। নাপাক কথা আর পাক কথার মধ্যে দ্বন্দ্ব-সংঘাত। আমরা মানুষ যা কখনো উভয় প্রকার শব্দের মধ্য খানে উপরে উঠি, আবার কখনো নীচে নামি। বিশ্বের বুকে শেষ পর্যন্ত তারাই টিকে থাকে, যারা পাক-পবিত্র কালেমার পতাকাবাহী। পাক কালেমা মানে কালেমায়ে তাইয়্যেবা সমুন্নতি বাণী—যা নিত্য নতুন ফল দান করে। আর এ হচ্ছে এক অনন্ত-অসীম সমুদ্র। যতদিন দুনিয়ায় মানুষের অস্তিত্ব থাকবে, থাকবে মানবীয় অনুভূতি, ততো দিন টিকে থাকবে এই কালেমা।

এই ষ্টোরে আমরা মৃত্যু প্রত্যক্ষ করেছি। বরং আমাদের মধ্যে কিছু-লোকতো মৃত্যুর সাথে গলাগলি-কোলাকুলি করেছে। এখানে আমি তিন দিন কাটাই। চতুর্থ দিন আমাকে নিয়ে যাওয়া হয় কয়েদীদের কুঠরীতে। সামরিক কারাগারে আমি এক বৎসর ছিলাম। এ দীর্ঘ সময়ে এক মুহূর্তের জন্যও মৃত্যু আমার থেকে বিচ্ছিন্ন হয়নি, দূরে সরে যায়নি। প্রতি মুহূর্তে প্রতি নিঃশ্বাসে আমি মৃত্যুকে দ্রুত প্রত্যক্ষ করেছি। মৃত্যুও আমার সাথে করেছে কানা-কানি। এ দিনগুলো আমাদের দেহ প্রাণে এমন প্রভাব বিস্তার করেছে, এমন গভীর দাগ ফেলেছে যা মুছে ফেলা সম্ভব নয়। সম্ভব নয় তা লিখে বুঝানো। সম্ভব নয় কারো পক্ষে তা ধারণা করা। অবশ্য যে ব্যক্তি এ ধরণের পরিস্থিতিতে আটকা পড়েছে তার কথা ভিন্ন।

নূতন জ্ঞান ঃ ভয়ংকর দিন

যারা এ ভয়ংকর দিনগুলো অতিক্রম করেছে, তাদের মধ্যে উন্মেষ ঘটেছে এক নূতন জ্ঞানের। এ নূতন জ্ঞানের অনেক শব্দই অন্যদের জন্য সম্পূর্ণ অর্থহীন। কিন্তু এ অর্থহীন শব্দগুলোই এখানকার সমাজে বিস্তৃত-প্রসারিত। যেমন তারের মধ্যে বিদ্যুৎ প্রসারিত থাকে। পাহারাদাররা যখন বলতো ষ্টোরের দরজা বন্ধ করে দাও—তখন এ শব্দগুলো আমাদের মনে এক নূতন ভাব সৃষ্টি করতো। আর ভোরে যখন দরজায় বেল বেজে উঠতো। তখন আমরা নূতন বিপদের জন্য প্রস্তুত হতাম। কিন্তু আমাদেরকে যখন কয়েক লোকমা খাবার দেয়া হতো, তখন খুব খারাপ লাগতো আমাদের। এই

www.pathagar.com

লোকমা পরিমাণেই কেবল উল্লেখের অযোগ্য হতোনা, বরং মানের বিচারেও পদ বাচ্য হতোনা। এরা আমাদেরকে খাবার দেয়ার সুযোগে মেরামতও করতো। সকলেই থাকতো এক ভয়ংকর মুহূর্তের অপেক্ষায়। আর তা ছিলো তদন্তের জন্য তলব করা। তদন্ত ছিলো এক ভয়ংকর বস্তু, কিন্তু এর অপেক্ষায় থাকাওতো কম ভয়ংকর ছিলনা। অনেকেতো তদন্তের অপেক্ষায় থেকে প্রাণ হারিয়েছে। কারণ, ভয়-ভীতির অধিক চাপ সহ্য করতে পারেনি তাদের অন্তর।

www.pathagar.com

নবম দৃশ্য

তদন্ত কার্যক্রমের অপেক্ষায়
২১০ নাম্বার কুঠরীতে

এসময় আমি ভীষণ মানসীক দ্বন্দ্বে ভুগছিলাম। সব সময় ভাবতাম, কেন আমাকে সামরিক আদালতে আনা হয়েছে। আমার ধারণা ছিলো, এখানে কেবল তাদেরকেই আনা হয়, 'ষড়যন্ত্রে' যাদের হাত থাকে। আমি গুপ্ত পুলিশ অফিসারের বক্তব্য নিয়েও অনেক চিন্তা করেছি, যা আমাকে লক্ষ্য করে বলা হয়েছিলো আবুজে'বল কারাগারে। দীর্ঘ দিনেও আমি তার এ বক্তব্যের কোন অর্থ হৃদয়ঙ্গম করতে পারিনি। এখানে তদন্তকালে আমাকে যে ভয়ংকর শাস্তির সম্মুখীন হতে হবে, সে সম্পর্কেও আমি চিন্তা করি। আমি মনে মনে তদন্ত কার্যক্রমের চিত্র অংকন করতাম আর ভাবতাম, তদন্ত অফিসারের সাথে কথা বার্তায় এমন কি পন্থা অবলনম্বন করা যায়, যার ফলে আমি শাস্তি থেকে রেহাই পেতে পারি। আমি এটাও ভাবতাম, বর্তমানে মিশরের দিকে দিকে কি ধরনের যুলুম ছড়িয়ে আছে। পুলিশ এবং সামরিক বাহিনীর সেসব সংস্থা নিয়েও আমি চিন্তা করতাম, ধর্ম আর বিবেক বিসর্জন দিয়ে যারা যা খুশী বলতো।

কারাগারের অন্ধ প্রকোষ্ঠে যা কিছু ঘটছে, জামাল নাসের কি তার খবর রাখে—আমার মনে এ প্রশ্ন উদয় হয়েছে বার বার। সব সময় এ প্রশ্নের ইতিবাচক জবাব পেয়েছি। এজবাবের প্রতক্ষ যুক্তি-প্রমাণও পেয়েছি। এসব যুক্তি প্রমাণতো উপেক্ষা করা যায়না। এখানে শুধু একটা উল্লেখ করেছি।

মিশরের মহান সাংবাদিক মোহাম্মদ হাসানাইন হায়কল জামাল নাসেরের দক্ষিন হস্ত ছিলেন। তিনি একমাত্র ব্যক্তি, যে জামাল নাসেরের মৃত্যু পর্যন্ত বড় পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। তিনি হচ্ছেন সোশ্যালিষ্ট ইউনিয়নের আত্মিক পিতা। মিশরে যে পরিস্থিতির উদ্ভব হয়েছে, তার অধিকাংশের পরিচালনাকারী ছিলেন এই সাংবাদিক। আমি একবার স্বচক্ষে দেখিছি যে, তিনি মহামান্য গাড়ী নিয়ে সামরিক কারাগারের ভেতর প্রবেশ করেন। গাড়ী

www.pathagar.com

ভেতরে এসে থামলে তিনি বেড়িয়ে আসেন। মিলিটারী ইন্টেলিজেন্সের প্রধান সদস্য জয়নুল আবদুল করিম দৌড়ে এসে তাঁকে স্বাগতম জানায়। এই মিলিটারী ইন্টেলিজেন্সইতো মানুষের উপর নির্যাতন চালাচ্ছে। হত্যা করছে, যা খুশী তাই করছে।

মহান সাংবাদিক কারাগারের অভ্যন্তরে প্রবেশ করেন। তখন কারাগারে চলছিলো ভীষণ নির্যাতন। একদিকে চলছিলো চাবুকের আঘাত, আর অপর দিকে উত্থিত হচ্ছিলো বুক ফাটা আর্তনাদ। তাদের এ আর্তনাদ আসামানকেও কাঁপিয়ে তুলছিলো। এ মহান সাংবাদিক কারাগারের আঙ্গিনায় এসে দাঁড়াল। জামাল নাসের কারাগারের পরিস্থিতি সম্পর্কে আগে কিছু নাজানালেও এ মহান সাংবাদিক তাঁকে অবশ্যই অবহিত করেছে। তিনি যদি তা না করে থাকেন আর জামাল নাসের যদি এ সম্পর্কে খবর না রাখেন তবে এটা আরও বিস্ময়কর।

ফেরাউন মেজাজ হাবিলদার

১৯৬৫ সালের ১৬ই সেপ্টেম্বর ভোর। শুরু হয় আমাদের উপর নির্যাতনের পালা। ভীষণ নির্যাতন। খোলা হয় আমাদের কুঠরীর দরজা। সিপাইরা গালি-গালাজ-কিল-ঘুষি আর লাঠি মেরে আমাদেরকে স্টেরের সামনে সারীবদ্ধভাবে দাঁড় করায়। জনৈক হাবিলদার আসে। এসেই বসে এক চেয়ারে। অপর এক সেপাই তার জন্য এ চেয়ার নিয়ে আসে। সম্মানের সাথে তাকে পেস করে। বড় দম্ভের সাথে সে চেয়ারে উপবেষ্টন করে। হাবিলদার হলেও গর্বে সে আত্মহারা হচ্ছিলো। তার নির্দেশ নাৎসী জেনারেলদের চেয়ে কম ছিলনা মোটেই। এ নাৎসী জেনারেলদের কাহিনী আমরা বইতে পড়েছি আর শুনেছি ইতিহাস-বেত্তাদের মুখে। যাই হোক, এটা নূতন কিছু নয়। কারো পরোওয়া না করে মযলুমদের সাথে যা খুশী আচরন করার অধিকার ছিলো এ হাবিলদারের। সকলে তার সামনে হাত জোড় করে দাঁড়িয়ে আছে। এদের মধ্যে আছে বড় বড় সামরিক অফিসারও। সুতরাং তার মনে দম্ভ আসবে না কেন? মানবতার অবমাননার স্পৃহা তার মনে কেন জাগাবেনা শয়তান।

www.pathagar.com

সারীবদ্ধভাবে দাঁড়িয়ে থাকা লোকদেরকে আচ্ছা করে চাবুক পেটা করে। সে সবকিছু করতে পারে—একথা প্রমাণ করা ছাড়া এ চাবুক পেটা করার আর কোন কারণ ছিলনা। সে প্রমাণ করতে চায় যে, তার ক্ষমতা অসীম। তার নির্দেশ অপ্রতিরোধ্য। এরপর সে নাম ধরে ডাকতে থাকে। আর কিছু না দেখে শুনেই নানাজনকে কারাগারের নানা কুঠরীতে পাঠায় প্রথমে সে নাম ধরে ডাকতো এবং তার কুঠরীর নাম্বার বলে দিতো আর অমনি সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিটি বাতাসের মতো দ্রুত বেগে সে কুঠরীর দিকে ছুটে যেতো। কেউ কিছুমাত্র অলসতা করলে, কোন প্রশ্ন তুললে বা পায়ে আঘাতের কারণে তীব্র বেগে ছুটে যেতো না পারলে তাকে দেয়া হতো কঠোর শাস্তি। হাবিলদার আমাকে ডাকে এবং আমার সাথে আরও দু'জন বন্দীকেও। সেপাইদের চড় থাপ্পড় আর এলো পাথাড়ী চাবুক বর্ষনের মধ্যে সে বলে—কুঠরী নাম্বার ২১০ অন্যদের মতো আমিও ছুটে যাই বিদ্যুতের গতিতে। আমার সাথে আর কে দৌড়চ্ছে তা জানার সুযোগ কোথায় আমার। কারাগারের আঙ্গিনায় পদে পদে চাবুক আর লাথি আমাকে অভ্যর্থনা জানায়। আমাকে বরাদ্দ করা কুঠরীটি ছিলো তিন তলায়। এদীর্ঘ সিঁড়ির স্থানে স্থানে ভরা ছিলো আযাবের ফেরেশতায়। প্রতিটি সিড়িঁতে কোন না কোন সেপাই বসা ছিলো। দৈত্যের মতো, দুর্গন্ধে ভরা। চোখ থেকে আগুন ঝরছে। মানুষকে পেটাবার জন্য তাদের হাত উপরে উত্তলিত। কারো হাতে চাবুক। দীর্ঘ কালো চাবুক। আর কারো হাত মুষ্ঠিবদ্ধ।

২১০ নাম্বার কুঠরীর দরজায় বসাছিলো শাম্বু। মানুষ নয়, যেন শয়তানের সাক্ষাৎ প্রতি মুর্তি। সামরিক কারাগারে প্রবেশ করেছে অথচঃ শাম্বুকে চেনেনা, এমন কেউ নেই। এখানে শাম্বু মানুষ খেকো কুকুরের চেয়েও বেশী প্রসিদ্ধ। শাম্বুকে মনে করা হতো তখন সামরিক কারাগারের বিশেষ প্রতীক। সে দু'হাতে বন্দীদের মুখে ঘুঁষি মারতো। তার ঘুঁষি খেলে সারাদিন মাথায় চক্কর দিতো। আমরা যখন কুঠরীর কাছে পেঁাছি, তখন শাম্বু অনেক শব্দ উচ্চারন করে। এগুলো এখন আর আমার মনে নেই। এরপর ধাক্কা দিয়ে কক্ষে ফেলে দরজা বন্ধ করে দেয়। এলো পাথাড়ী পিটুনী আর ঊর্ধ শ্বাসে ছুটে যাওয়ার কারণে আমরা হাঁফিয়ে উঠি। ভেতরে প্রবেশ

www.pathagar.com

করে আমরা কিছুক্ষণ বোকার মতো দাঁড়িয়ে থাকি। হয়ে। আমরা মনে মনে কিছুটা আনন্দিতও ছিলাম। স্টোরে থাকাকালে আমাদের ধারণা ছিলো এখান থেকে কুঠরীতে স্থানান্তর করা হলে সেখানে শাস্তি গুলি কিছুটা লাঘব হবে। তখন অন্ততঃ সেপাইদের হাত থেকে আমরা রেহাই পাবো।

আল্লাহ তায়ালা আমাদের স্বপ্ন সফল করেছেন। ৩য় তলার একটা তালা বন্ধ কুঠরীতে আমরা অবস্থান করছি। এখানে কেউ আমাদের শব্দ শুনতে পায়না, এমনকি আমাদের সম্পর্কে কেউ ধারণাও করতে পারেনা। আমরা তিনজন একে অপরের দিকে তাকাই, পাগলের মত হাসি। কয়েক মিনিট পর আমরা আবিষ্কার করলাম যে, কুঠরীতে একজন চতুর্থ ব্যক্তিও আছে। তার চেহারার দিকে ভালোভাবে তাকিয়ে বুঝতে পারলাম, এ-তো আমাদের ডাক্তার সাহেব, আবুজো'বল থল এ যার সাথে সাক্ষাৎ হয়েছিল। আমি আগ্রহের অতিসয্যে তার দিকে ছুটে যাই। জিজ্ঞাসা করি, আপনি কি সেই ডাক্তার সাহেব? তিনি বললেন হাঁ। তিনি জিজ্ঞেস করলেন, আপনি আহমদ রাফেয়? বললাম হাঁ। এরপর আমরা উভয়ে হেসে পড়ি। ডাক্তার সাহেব বেশ খুশী হলেন। তাঁর কাছে জানতে পারলাম, তিনি একা-ই কুঠরীতে বাস করে আসছিলেন। এমনকি নিঃসঙ্গতার ফলে তাঁর পাগল হওয়ার দশা হয়েছিলো। কুঠরীটা সম্পূর্ণ খালী। শুধু একটা মাত্র পাত্রে আছে পেশাব করার জন্য। ডাক্তার সাহেবের পরনে ছিলো প্যান্ট এবং পাতলা শার্ট। আমাদেরও ছিলো একই পোশাক। এ পোশাকেই আমরা শীত-গ্রীষ্ম কাটাই। কুঠরীতে আমাদের জন্য কম্বল বা চাদর কিছুই ছিলোনা। শীতের রাত আমাদের প্রচন্ড শীত অনুভূত হতো।

কয়েক মিনিটের জন্য আমরা গ্রেফতারী, তদন্ত কার্যক্রম এবং যুলুম-নির্যাতনের কথা ভুলে যাই। আমরা জুড়ে দেই দীর্ঘ কাহিনী। সব কিছু সম্পর্কে মন্তব্য করি। আমাদের এ কাহিনীতে হাস্য-কৌতুক এবং বিদ্রূপ-উপহাসও পায়। চরম নির্যাতনের মুহূর্তগুলোও বাদ পড়েনি। আলোচনা করতে করতে আমরা এতটা ঘনিষ্ঠ হই যেন বহু বছরের পরিচিত। অথচঃ বলতে গেলে আমাদের পরিচয় কিছুক্ষণ পূর্বেই হয়েছে। আমাদের উদাহরন হচ্ছে দুর্ঘটনা কবলিত তরীর যাত্রীর মতো। এ তরীর যাত্রীদের মধ্যে মাত্র

www.pathagar.com

চারজন ভাগ্য চক্রে তীরে উঠতে সক্ষম হয়েছে। প্রত্যেকেই স্ব স্ব পরিচয় ছেড়ে এসেছে তরীর মধ্যেই। বিরান অবস্থায়ই তারা কূলে উঠছে। অতীতকে তারা ভুলে বসেছে, তাদের সামনে ভবিষ্যতের কোন স্বপ্ন নেই, আশা-আকাংক্ষা নেই। এই হচ্ছে আমরা চারজন মুসাফির। রিক্ত-মুক্ত অবস্থায় দীর্ঘ দিন আমরা কুঠরীতে কাটাই। দুনিয়ার সব কিছু থেকে মুক্ত আমরা। আমাদের মাথায় নেই জীবনের কোন দায় দায়িত্বের বোঝা।

আমাদের এ নূতন বন্ধু তরুন ডাক্তার। বয়স পঁচিশের বেশী নয়। মধ্যবিত্ত পরিবারে প্রতি পালিত। তাঁর পিতা প্রাথমিক শিক্ষা বিভাগে চাকুরী করে। মধ্যবিত্ত সমাজে যে ধরণের চিন্তাধারা বিকশিত হয়, তাদের পরিবারেও তাই হয়েছে অর্থাৎ জীবন ধারণের আকাংখ্যা, সরকারের আনুগত্য—তা সরকারের রং-রূপ যাই হোক না কেন, যে কোন দর্শন আর চিন্তা ধারার পতাকাবাহী হোকনা কেন—কোন অবস্থায়ই স্থান তার বিরোধিতা না করা, অনাগত দুর্যোগ-দুর্দিনের চিন্তায় সম্পদ আহরণ করা ইত্যাদি তাদের ধারণা অনাগত কাল বিপদ মুক্ত নয়। তারা মনে করে, আগামী দুর্দিন সম্পর্কে তাদের ধারণা নির্ভুল।

যুবকটি স্কুল জীবন সমাপ্ত করে মেডিক্যাল কলেজে ভর্তি হয়। সে ছিলো তার পরিবারের আশা-আকাংখ্যার প্রতীক। মেডিক্যাল কলেজের শিক্ষা ছিলো তার পরিবারের লক্ষ্য বস্তু। সুখ-সমৃদ্ধি আর তরাক্কী ছিলো তাকে কেন্দ্র করেই। পিতার অক্লান্ত পরিশ্রম আর প্রচেষ্টার ফলে পুত্র মেডিক্যাল কলেজের পরীক্ষায় সাফল্যের সাথে উত্তীর্ণ হয়। যুবক ডাক্তারী চাকুরী নেয় একটা হাসপাতালে। হাসপাতালে এসিস্ট্যান্ট ডাইরেকটর হিসাবে তার পদোন্নতি হওয়ার কথা। এসময় তাকে গ্রেফতার করা হয়। ছাত্র জীবনে ইয়াহইয়া হোসাইনের সাথে তার পরিচয় হয়। পরিচয় হয় বিশ্ব বিদ্যালয়ের ছাত্রদের একটা পিকনিক পার্টিতে। ইয়াহইয়া হোসাইন ছিলো কৃষি কলেজের ছাত্র, আর যুবক ডাক্তার ছিলেন তখন মেডিক্যাল কলেজের ছাত্র। এ ক্ষণস্থায়ী পরিচয়ের পর তাদের মধ্যে আর যোগাযোগ ছিলনা। ইয়াহইয়া হোসাইন মিশর এয়ার কোম্পানীতে পাইলট হিসেবে যোগদান করে। ডাক্তার তখন মেডিক্যাল কলেজের শেষ বর্ষের ছাত্র। পরে একদিন তার সাথে

www.pathagar.com

ইয়াহইয়া হোসাইসের সাক্ষাৎ হয়। ইয়াহইয়া হোসাইন দ্বীনি এবং রাজনৈতিক তৎপরতায় অংশ গ্রহণের জন্য গোপনে আহবান জানালে তিনি তা প্রত্যাখ্যান করেন। কারণ, তার কাছে এটা ছিলো রাষ্ট্র-ক্ষমতার বিরুদ্ধাচরন। এরফলে সরকারের সাথে দেখা দেবে বৈরীতা। তার পিতা তাকে একাজ থেকে বিরত রাখার চেষ্টা করে আসছেন সব সময় সযত্নে।

১৯৬৫ সালের গ্রীষ্ম কাল। একরাত ইয়াহ্ইয়া হোসাইন ডাক্তারের কাছে যায়, তাকে আহবান জানায় এক বিশেষ অভিযানে অংশ গ্রহনের। গোপনে তাকে বলেও দেয় এ বিশেষ অভিযান সম্পর্কে। তাকে একটা টেলিফোন নাম্বারও দেয় এবং এ নাম্বারে যোগাযোর করতে বলে। যে অভিযান সমপর্কে জানতে চাইলে ইয়াহ্ইয়া হোসাইন বলে, এখন সে ব্যস্ত। পরবর্তী বৈঠকে এসম্পর্কে বিস্তারিত জানাবে। ইতিমধ্যে ইয়াহ্ইয়া হোসান দেশ ছেড়ে চলে যাওয়ার পরিকল্পনা করে। আদ্দিস আবাবার পথে খার্তুমে সে বিমান থেকে অবতরন করে। পুনরায় সে আর বিমানে ফিরে আসেনি।

একই কোম্পানীতে ইয়াহইয়া হোসাইনের আর একজন পাইলট বন্ধু ছিল রাজনৈতিক চিন্তাধারায়ও সে ছিলো ইয়াহইয়া হোসাইনের সাথে একমত। তার নাম জিয়া। এ জিয়া ছিলো তখন ডাক্তারের বন্ধু। ইয়াহইয়া হোসাইন ডাক্তারকে তার গ্রুপে অন্তর্ভুক্ত করার অনেক চেষ্টা করেছে তা জানতো জিয়া। ইয়াহইয়া হোসাইনের আত্ম গোপনের পর তার বন্ধুদেরকে গ্রেপতা করা হয়। পাইলট জিয়াও গ্রেফতার হয়। শারিরিক মানসিক নির্যাতনের এক পর্যায়ে জিয়া ডক্তারের নামও বলে দেয়।

হঠাৎ একদিন ডাক্তার নিজেকে দেখতে পায় কায়রোর লাজুগলি পার্কে অবস্থিত গুপ্ত পুলিশের কেন্দ্রীয় দফতরে পড়ে থাকা অবস্থায়। সেখানে একটা অন্ধকার সংকীন প্রাকোষ্ঠে তাকে আটক রেখে জিজ্ঞাসাবাদ করা হয় ইখওয়ানুল মুসলেমুনের সাথে তার কি সমপর্ক। ইখওয়ান সমপর্কে যেহেতু তার খুব একটা জানাছিলনা তাই সে কোন জবাব দিতে পারেনি। ফলে তার উপর চলে চরম অকথ্য নির্যতন অবশেষে তাকে গুপ্ত পুলিশের কেন্দ্রীয় কার্যালয় থেকে স্থানান্তর করা হয় আবুজে'বল কারা-

www.pathagar.com

গারে। এখানে চাবুকের ঘা ছাড়াও নানাবিধ নির্যাতন। চাবুক আর শাস্তির মধ্যে পার্থক্য কি আপনারা নিশ্চয়ই বুঝতে পারছেন। অবু-জেবল জাহান্নাম থেকে মুক্তির জন্য ডাক্তার উপায় খুজে। উপায় ছিল একটাই' মিথ্যা বলা। এমন কোন কহিনী রচনা করা যা শুনার জন্য আযাবের ফেরেসতারা তাকে অন্তত কিছুটা সময় বাঁচার অবকাশ দেয়। মিথ্যা কহিনী হিসাবে ডাক্তার দাবী করে যে, ইখওয়ানুল মুসলেমুনের সদস্য। সে আরও বলে যে বোমা তৈয়ার করে দিতো যে ইখওয়ানকে বোমা কিভাবে তৈয়ার করা হয় জিজ্ঞাসা করা হলে সে বলে: একটা নির্দিষ্ট পরিমাণ ইথার এবং কেরোসনের সাথে ক্লরোফর্ম মিশিয়ে বোমা তৈরী করা হয়।

ইখওয়ানী সান্ত্রাসের মনগড়া কাহিনী

ডাক্তারের এ বিবৃতির পরপরই টেলিফোন বেজে উঠে একজন ইখওয়ানী সন্ত্রাসদীকে গ্রেফতার করা হয়েছে। মিশরের দৈনিক সংবাদপত্র গুলাতে বড়বড় শিরনামে তার স্বীকারোক্তির সংবাদ প্রকাশিত হয়। পটকা এবং বোমা বিশেষজ্ঞরা এ খবর পড়ে হেসে ফেলে দৈনিক আল জমহুরিয়া ১১ই সেপ্টেম্বর ১৯৬৫ তারিখে প্রথম পৃষ্ঠায় বিরাট শিরোনামে খবর ছাপে ইখওয়ানের গোপন সংগঠনের রহস্য উদঘাঠিত। এতে বলা হয় যে একজন ইখওয়ানী সন্ত্রাসবাদী ইখওয়ানের রহস্য ফাক করে দিয়েছে সে বলে, সাইয়েদ কুতুব গোপন সংগঠনের প্রধান তাঁকে সহযোগিতা করার জন্য রয়েছে পাঁচ সদস্যের একটা কমিটি এ কমিটিতে আছে হাসান আল হোসাইবীর পুত্র ইসমাঈল হোসাইন এবং একজন মহিলা মহিলাটি হাজেন' নামে পরিচিত [যয়নব আল-গাযালী)। সে আরও জানায় যে, ইখওয়ানের কোন লোক এ হাজেনকে চেনেনা। এ সন্ত্রাসবাদী সরকারকে ক্ষমতাচ্যুত করার ব্যাপারে ইখওয়ানের অপরাধ ও ষড়যন্ত্রের কথা স্বীকার করেছে। যুবকদেরকে বিভ্রান্ত করা এবং সন্ত্রাসবাদী সংগঠনে নুতনদেরকে অন্তর্ভুক্ত করার জন্য যেসব কৌশল অবলম্বন করা হতো, সাবস্তারে তা-ও বলে দিয়েছে। এ স্বীকারোক্তি একজন নওজোয়ান ডাক্তারের। এ তরুন ডাক্তার তাদের প্রতাড়নার শিকার হয়। সে জানায় যে, ইখওয়ানী সন্ত্রাস-

www.pathagar.com

বাদীদের পরিকল্পনা ছিলো বোমা মেরে পাওয়ার হাউজ উড়িয়ে দেয়া যাতে গোটা দেশ অন্ধকারে ডুবে যায়। সে স্বীকার করে যে, ইখওয়ানের লোকেরা যুবকদেরকে বিভ্রান্ত করে তাদের সংগঠনে ভর্তি করার জন্য ধর্মকে ব্যবহার করতো। সে স্বীকার করে যে, যে দায়িত্ব সে গ্রহণ করেছিলো, তা যে ঠিক নয় এ কথা সে বুঝতে পেরেছে সময় অতিক্রান্ত হওয়ার পর। কিন্তু এখন আর তথা থেকে বের হওয়ার কোন উপায় ছিলনা। ১৯৫৯ সাল থেকে এযাবৎ ইখওয়ান যেসব ষড়যন্ত্র এটেছিলো, সে এক এক করে সব বলে দিয়েছে।

এ হচ্ছে সে খবরটি, যা মিশরের দৈনিক সংবাদপত্রগুলো বড় বড় শিরোনামে প্রথম পৃষ্ঠায় প্রকাশ করেছে। আমার মতে পত্রিকার যে সম্পাদক উক্ত ডাক্তারের স্বীকারোক্তি, সম্পর্কিত বিস্তারিত বিবরণ প্রকাশ করেছেন, আসলে তিনি মিশরের জনগণকে ধোকা দিয়েছেন। বর্তমান নাগরিক অধিকারের যুগে উক্ত সম্পাদকের হিসাব-নেকাশ হওয়া উচিৎ। পাওয়া উচিৎ তার কর্মের উপযুক্ত ফল।

আসুন এবার আমরা দেখি, কারাগারে গৃহীত তার পূর্ণ বিবরণ কি ছিলো বিস্তারিত এখানে হুবহু উল্লেখ করছি। বিবৃতিটি ছিলো এই—

১৯৫৯ সালের গ্রীষ্মকালে বিশ্ব বিদ্যালয়ের ছাত্রদের আমিও চা'স আল কার এর স্বাস্থ্য নিবাসে গমন করি। সেখানে ইয়াহইয়া হোসাইনের সাথে আমার সাক্ষাৎ। তখন ইয়াহইয়া হোসাইন ছিলো আইন শাম্‌স বিশ্ব-বিদ্যালয়ের অধীনে কৃষি কলেজের ছাত্র। আর আমি ছিলাম আইন শাম্‌স বিশ্ব বিদ্যালয়ের ছাত্র। আমরা উভয়ে একসঙ্গে সেখানে নামায আদায় করতাম। বরং এ সিদ্ধান্তও নিয়েছিলাম যে, অন্যান্য ছাত্রদেরকেও জামায়াতের সাথে নামায আদায়ের জন্য উৎসাহিত করবো। ক্যাম্প শেষ হলে আমরা নিজ নিজ স্থানে ফিরে যাই। আমাদের সাথে আর একজন ছাত্রও ছিলো। কলেজে সে ছেলো ইয়াহইয়া হোসাইনের সহপাঠী মানে ক্লাশমেঠ। তার নাম ছিলো মোস্তফা রশীদী। প্রায় দেড় বৎসর হঠাৎ এক দিন মোস্তফা রশীদীর সাথে আমার সাক্ষাৎ হয় আতিকায়। আমি তাকে

www.pathagar.com

ইয়াহইয়া হোসাইন সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করি। সে জানায় যে, ইয়াহইয়া হোসাইন কৃষি কলেজে পড়াশুনা সমাপ্ত করে ফ্লাইং ক্লাবে ভর্তি হয়েছে। অদূর ভবিষ্যতে সে পাইলট হবে। আমি মোস্তফার কাছে ইয়াহইয়া হোসাইনের টেলিফোন নাম্বার জিজ্ঞাস করি। আমার একটা নিরুপন যন্ত্রের প্রয়োজন ছিলো। এ যন্ত্রটি মিশরে পাওয়া যেতোনা। তার মাধ্যমে বিদেশ থেকে আমি এটা আনতে চেয়েছিলাম। মোস্তফা আমাকে ইয়াহইয়া হোসাইনের টেলিফোন নাম্বার দেয়—৫০৬৫। এ নাম্বারে আমি তার সাথে যোগাযোগ করি। গ্রীস্মকালীন ক্যাম্প সমাপ্ত হওয়ার পর এটা ছিলো আমাদের প্রথম যোগাযোগ। মিশর আল-জাদীদার বক্স সিনেমা হলের সমেনে আমাদের সাক্ষাৎ হয়। এটা ১৯৬১ সালের কথা। ঈদুল ফেতর এর রাত। ক্যাম্প থেকে বিচ্ছিন্ন হওয়ার পর তখনো আমাদের সাক্ষাৎ হয়নি। কথায় কথায় বক্স থেকে আবব্বাসিয়া পর্যন্ত আমরা মোটর গাড়ীতে ঘুরে বেড়াই। আলোচনা কালে ইয়াহইয়া হোসাইন আমাকে বলে, মানুষ কি ভাবে সত্যিকার অর্থে মুসলমান হতে পারে। সে বলে সে, এ ব্যাপারে মনোযোগ সহকারে কুরআন মজিদ অধ্যয়ন করতে হবে বিস্তারিত ভাবে। গ্রন্থের নাম উল্লেখ না করে সে বলে যে, আমি আপনাকে কিছু বই সম্পর্কে বলবো, যার ফলে আপনার ইসলামী চিন্তা-ধারা পরিপক্ব হবে। আমি তাকে জানাই যে, আমার একটা নিরুপন যন্ত্রের প্রয়োজন। সে আমাকে এনে দেয়ার কথা দিলেও কিছু সময় চায়। কারণ, বর্তমানে তার কাছে বৈদেশিক মুদ্রা নেই। টেলিফোনের মাধ্যমে তার সাথে নিয়মিত যোগাযোগ রাখার জন্য সে আমাকে জোর দিয়ে বলে। সে অনুপাতে কয়েকবার তার সাথে টেলিফোনে যোগাযোগ এবং কথাবার্তা হয়েছে।

একবার জুমার দিন আমি তার কাছে যাই। জুমার নামায শেষে আমরা একটা ফ্লাটে যাই। সে জানায়, এটা তার বন্ধু মোহাম্মদ আল-গামাম এর বাসা। মোহাম্মদ আল-গামাম তখন বাসায় উপস্থিত ছিলো। অপর এক ব্যক্তিও উপস্থিত ছিলো। তার নাম আহমদ রায়েফ। ক্যামি-

www.pathagar.com

ষ্ট্রিটে পি এইচ ডি ডঃ মোহাম্মদ আমীনও উপস্থিত ছিলেন। ইনি খ্যাতনামা ঔষধ কোম্পানী সেড'-এর পাবলিসিটি ইনচার্জ। আমি ডঃ মোহাম্মদ আমীনকে ইতিপূর্বে কোম্পানীর অফিসে দেখেছি। আমিও সেখানে যেতাম পাবলিসিটির জন্য। এই দ্বিতীয়বার তার সাথে আমার সাক্ষাৎ হয়। তিনি আমাকে তার ঠিকানা দিয়েছিলেন। মহল্লার নাম এখন মনে নেই। আল-বাস্তীলা মুকুলের কাছে তার বাসা। বাসার নাম্বার ৫০। তৃতীয় তলা।

আর একবার আমি ইয়াহইয়ার কাছে যাই। সে দ্বিনি বিষয় নিয়ে আমার সাথে কথা বলে। সে আমাকে জিজ্ঞাসা করে, ডাক্তার আলাউদ্দিন কে চেন? আমি বলি, ঠিক মনে পড়ছেনা। সে জানায় যে, আলাউদ্দীন তার বন্ধু জিয়া উদ্দীনের ভাই। আমি জানাই, এ নামের কোন ডাক্তারকে আমি চিনিনা। সে বলে, ডাক্তার অত্যন্ত ভালো মানুষ। আল্লাহ তাআলার নির্দেশ সম্পর্কে তার ভালো জ্ঞান আছে। তাফসীর সম্পর্কে তাঁর পড়াশুনা ব্যাপক। ইনশা আল্লাহ একদিন তার সাথে তোমাকে সাক্ষাৎ করাবো।

এক দিনের কথা, ইয়াহইয়া হোসাইন আমাকে জিজ্ঞাসা করে, ফী-যিলালিল কুরআন। এর মাধ্যমে কুরআন মজদি অধ্যায়ন সম্পর্কে তোমার কি মত? আমি বললাম, কোন অসুবিধা নেই। সে আমাকে পরামর্শ দেয় মাকতাবায়ে ওয়াহাব থেকে এটি ক্রয় করে পড়ার জন্য। সে আমাকে এটাও বলে যে, দ্বীনি জ্ঞান সৃষ্টি পরবর্তী পদক্ষেপ সমপর্কে পরে বলবো।

এরপর হয়াহইয়া হোসাইন প্রস্তাব করে যে, আমরা উভয়ে মিলে অধ্যয়ন করবো। হাসপাতালের অভ্যন্তরে এমন দ্বিনদার লোকদের সন্ধান করবো যারা আমার সাথে কাজ করে। যাদের সমপর্কে নির্ভর করা যাই যে, পরিশ্রম করে যারা ধৈর্যের সাথে দ্বিনি গ্রন্থ অধ্যয়ন করবে। আমি খোজখবর নিয়ে ইয়াহইয়াকে ডাক্তার মাজদীর নাম বলি। ইয়াহইয়া জিজ্ঞাসা করে, তিনি কি ধৈর্য সহকারে অধ্যয়ন করতে পারবেন? আমি বললাম হা। দ্বীন সমপর্কে তাঁর পড়াশোনা ব্যাপক। ইয়াহইয়া বলে, তাহলে আল্লাহর উপর নির্ভর করে তারও দৃষ্টি আকর্ষন করা হবে। একদিন ইয়াহইয়া

www.pathagar.com

আমার বাসায় এসে আমাকে বলে, এখানে এক ব্যক্তি আছে তাঁর নাম আলী। শুবরায় থম্পসন রোডে থাকেন। দীন সমপর্কে তাঁর ব্যাপক উৎসাহ উদ্দীপনা। তিনি অত্যন্ত খোদাভীরু ব্যক্তি। তিনি আপনার সাথে পরিচিত হতে চান। আপনার কোন অপত্তি নেই তো? আমি বললাম, না, আপত্তি কি আছে! সে বললো তিনি বর্তমানে বাসায় আছেন। অসুস্থ আপনি কি তাকে দেখার জন্য যেতে পারেন আমি বললাম নিশ্চয় যেতে পারি। তাহলে চলুন এই বলে আমরা তার বাসার উদ্দেশ্যে রওয়ানা হই।

আমরা সেখানে পৌছলে পরিবারের লোকেরা বলে, আপনারা কিছুক্ষন অপেক্ষা করুন। তিনি ডাক্তারের কাছে গিয়াছে। এখনই ফিরে আসবেন আমরা প্রায় এক ঘন্টা তাঁর জন্য অপেক্ষা করি। কিন্তু তিনি আসেননি ইয়াহইয়া হোসাইন আমার জন্য পোষাকের একটা ব্যাগ রেখে আসে তাতে একটা গরম কোট ছিল। এরপর আমরা চলে আসি।

এরপর ইয়াহইয়ার সাথে আমার আবার সাক্ষাৎ হয়। ইয়াহইয়া আমাকে বলে আপনি নিশ্চিন্ত মনে আমাদের সাথে সামিল হোন, কি বলেন? আমি আছি জিয়া আছে আলী আছে যার সমপর্কে আমি আপনাকে বলেছি। ইসমাঈল হোসাইন ও আছে, দীনী বিষয়ে পড়াশুনা ছাড়াও অন্যান্য বিষয়ে আমরা এক যোগে কাজ করবো। আমি বললাম, অন্যান্য বিষয় কি? সে বললো পৃথিবীতে ইসলামকে প্রতিষ্ঠিত করা। আমি বললাম এটা কি ভাবে সম্ভব সে বলে ক্ষমতার দ্বারা বর্তমান ব্যবস্থা পরিবর্তন করা সম্ভব। ইতিমধ্যে জিয়াও আগমন করে। ইয়াহইয়ার কাছে একটা লিফলেট ছিল। তা পড়ে তাতে বর্তিত বিষয় নিয়ে আলোচনা করে, বিষয় বস্তুছিলো বিপ্লব কিভাবে সম্পন্ন হবে। আমি ইয়াহইয়াকে বললাম, আপনারা যে লক্ষ্যের কথা বলছেন তাতো আমাদেরকে ধরপাকাড় এবং যুলুম নির্যাতনের লক্ষ্যবস্তুতে পরিণত করবে। ইয়াহইয়া বলে, আপনার কর্তব্য হচ্ছে অল্লাহর নামে জীবন বিলিয়ে দেয়া এ ব্যাপারে কি বিশ্বাস নেই? আমি বললাম, আমিতো কেবল এটুকুই যথেষ্ট মনে করিনা। সে বললো আপনাকে ঈমান আরও মজবুত করতে হবে যাতে আপনি আল্লাহ তায়ালার বানীঃ

www.pathagar.com

ان الله اشترى من المؤ منين انفسهم و اموا لهم بان لهم الجنة

আল্লাহ তাআলা জান্নাতের বিনিময়ে মোমেনদের জান মাল ক্রয় করে নিয়েছেন—এর তাৎপর্য হৃদয়ঙ্গম করতে পারলে আল্লাহর পথে জিহাদের কষ্ট সহ্যক্ষমতা সৃষ্টি হবে আপনার মধ্যে আমি বললাম, এতটুকু আমি না করতে পারলে? সে বললো ঃ তাহলে আপনি ডাক্তার হিসাবে কাজ করুন। কোন সংঘর্ষ বাধলে আহতদের চিকিৎসা করবেন। আমি বললাম ঃ এটাওতো নির্যাতন গ্রেফতারীর কারন হতে পারে। এটা সহ্য করার সাহস আমার নেই। সে বললো তাহলে আপনি সঙ্গীদেরকে বলুন তারা আমাদেকে গ্রামের কোন ডাক্তার খুজে দিক, আমি বললাম ঠিক আছে।

এক সপ্তাহ পর ইয়াহইয়া আবার আমার কাছে আসে। আমাকে আলীর কাছে নিয়ে যায় তার সাথে আমার পরিচয় করিয়ে দেয়ার জন্য। আলীর সাথে সাক্ষাৎ হলে তিনি বলেনঃ কর্মসূচী সম্পর্কে ইয়াহইয়া আপনাকে বলে দিয়েছেন। আমি বললাম, হাঁ। তিনি বললেনঃ ইসলামের বিজয় এবং দেশের মধ্যে তা প্রতিষ্ঠিত করতে হলে আপনাকে আল্লাহর প্রতি ঈমান দৃঢ় করতে হবে। আপনাকে বুঝতে হবে যে, জিহাদ ছাড়া দ্বীন প্রতিষ্ঠার অন্য কোন পথ নেই। তাকে জবাব দেইঃ জিহাদ মানুষকে কারাগার আর নির্যাতনের দিকে ঠেলে দেয়। জিহাদ ছাড়াও আমরা ইসলামের নীতি অনুযায়ী চলতে পারি। সুদের ভিত্তিতে ব্যাংক চলছে। রাস্তায় নারীরা উলঙ্গ এবং অর্ধউলঙ্গ পোশাক পরে পরে ঘুরে বেড়াচ্ছে। আগাগোড়া অশ্লীলতা ও কুকর্মের ডাক দিচ্ছে। আমার জবাব ছিলো এইঃ আপনার ধারণা ঠিক নয়। আপনারাইতো ব্যাংকে পুঁজি সরবরাহ করেন। এমনি ভাবে যে উলঙ্গ নারীদের কথা আপনি বলছেন, আসলে তারাতো আমার আপনার বোন। আমরাতো নিজেদের ঘর সংশোধন করতে পারি। তিনি বললেনঃ এ কথা ঠিক নয়। যতো দিন উপরের সংস্কার হবেনা। ততোদিন সমাজের সংস্কার সংশোধন হতে পারেনা। এ কারণে আমাদেরকে উপরের দিকে মনোযোগ দিতে হবে। বিপদের উৎস মূলের সংস্কার করতে হবে। এছাড়াও তিনি বললেনঃ কোন সামরিক বিপ্লব দ্বারাও এ পরিবর্তন সাধিত হবেনা। এর একমাত্র উপায় হচ্ছে বিমান এবং

www.pathagar.com

রেল যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন করে দেয়া। এটা এমন এক পন্থা, যাতে কোন মানুষের প্রাণহানী হবেনা। সর্বত্র আমাদের দৃঢ় হাত রয়েছে। সুযোগ হলে। তারা আমাদের সাহায্য করতে পারে। আপনার দায়িত্ব হবে কেবল এটুকু যে, আপনি আমাদেরকে বিস্ফোরক দ্রব্য অর্থাৎ ইথার, ক্লোরোফর্ম এবং কেরোসিন সরবরাহ করবেন শুধু। এসব জিনিস হাসপাতালে পাওয়া যায়, এছাড়া আপনার কাছ থেকে আর কোন সাহায্যের প্রয়োজন নেই আমাদের। কোন উপাদান কি পরিমাণ নিতে হবে, তা হাসপাতালে আপনার এক সাথী ডাঃ আমীন বা স্বয়ং আমার কাছ থেকে জেনে নিতে পারেন আপনি।

জরুরী নোটঃ ইয়াহইয়া হোসাইন আমাকে বলেছিলেন যে, হাসপাতালে আযমী নামে এক ডাক্তার আছেন। এ ব্যাপারে সব কিছু জানেন আপনি তার সাথে যোগাযোগ করে কথাবার্তা বলে নিতেপারেন, তদনুযায়ী আমি ডাঃ আযমীর সাথে সাক্ষাৎ করি এবং তাকে বলি যে, ইয়াহইয়া হোসাইন আপনাকে সালাম জানিয়েছেন। তিনি তখনই বলে উঠেন যে ইয়াহইয়া হোসাইন নামে কাউকে আমি চিনিনা। আমি যখন তাকে বলি যে, ইনি হচ্ছেন সে ব্যক্তি, যিনি আপনার খালার মাধ্যমে আপনার জন্য বিদেশ থেকে নিরুপক যন্ত্র এনে দেয়ার ওয়াদা করেছেন, তখন তিনি বলেন হাঁ আমি তাকে চিনি। তাকেও আমার সালাম জানাবে। এরপর তিনি আমাকে বলেনঃ আপনি এবং মাজদীকে নিয়ে হবে আপনার গ্রুপ। মাজদীর সাথে মিলেইতো আপনি অধ্যয়ন করছেন। কিন্তু আমি জবাব দেইঃ মাজদী অতিসম্প্রতি হাসপাতালে চাকুরী নিয়েছে দীর্ঘসময় তাকে ডিউটী করতে হয়। তাছাড়া তার মা অসুস্থ তাকে একাই মায়ের দেখাশুনা করতে হয়।

এরপর রুমজী প্রস্তাব করে যে, আমাদের উভয়ের মধ্যে যোগাযোগ থাকা দরকার। মাজদীর সাথে আমার পরিচয় হওয়ারও কোন দরকার নেই। বর্তমানে কেবল এতটুকুই যথেষ্ট যে, আপনি তাকে কিছুটা প্রাথমিক জ্ঞান দেবেন। আমরা ধীরে ধীরে তার সাথে সমপর্ক বৃদ্ধি করবো। সম্পূর্ণ নিশ্চিত হওয়ার পর তাকে পূর্ণ তথ্য সরবরাহ করবো। এটা শুনে আমি

www.pathagar.com

বলি, আমি আপনি এবং অপর এক জনের মাধ্যমে মাজদীকে নিয়েই হবে আমার গ্রুপ। তিনি বললেনঃ হাঁ। আমি জিজ্ঞেসা করিঃ আমাদের শৃংখলা সমপর্কে ভবিষ্যতে মাজদী কি করে জানবে? রুমজী বললেনঃ ইয়াহইয়ার মাধ্যমে, আমি ইয়াহইয়া হোসাইনের কাছে ব্যাটারী চাই, বিদ্যুতের সাহায্যে যাতে চার্জ দেয়া হয়। মাজদী যখন জানতে পারলে ইয়াহইয়া আমার জন্য ব্যাটারী সরবরাহ করবে তখন মাজদী আমাকে বলে, তাকে আর একটা ব্যাটারী আনার জন্য বলতে। ইয়াহইয়া ব্যাটারী নিয়ে এলে মাজদী আমাকে বলে যে, আমাদের উচিৎ ইয়াহইয়ার কাছে গিয়ে তার শুকরিয়া আদায় করা। এছাড়াও আমরা এক সাথে মিলে অধ্যয়ন করবো, তদনুযায়ী আমরা তার বাসায় গমন করি। সেখানে ইয়াহইয়া মাজদীর সামনে অধ্যয়নের পন্থা এবং উদ্দেশ্য বর্ণনা করে। অতপর আমার কাছে দাবী করে তার সাথে যোগাযোগ রাখার জন্য যাতে আমরা বেশী বেশী অধ্যয়ন করতে পারি এবং অন্যান্য বিষয় সমপর্কেও তাকে অবহিত করতে পারি।

একদিন মাজদী আমাকে বলেঃ বর্তমানে আমি ছুটিতে আছি। ফারুকও এখন ছুটিতে। আমরা আনন্দ বিহারে বেলাতিম যাবো সেখানে কয়েক দিন কাটাবো আমি বললামঃ ছুটি নিয়ে আমিও কয়েক দিন আপনার সাথে কাটাবো, এ সিদ্ধান্ত অনুযায়ী পরদিন আমরা বেনাতিম রওয়ানা হয়ে যাই। তিন দিনপর সেখান থেকে ফিরে আসি। গাড়ীর মধ্যে ইয়াহইয়া আমাকে পরামর্শ দেয় যে, আমাদেরকে যেসব নির্দেশ দেয়া হয়, সে সমপর্কে অবহিত থাকার জন্য আমাদের সাক্ষাতের সময় নির্ধারন করে নেওয়া উচিৎ। আমি তাকে বললাম, আমরা কোথায় মিলিত হবো? আমি বিবাহিত, আপনারা তো অবিবাহিত। আমাদের খুব বেশী সাক্ষাতের সুযোগ না হলে এ জন্য সাইয়েদা যয়নবের মসজিদকে বাছাই করে নেয়া যায় জুমার দিন মাগরিবের নামাযের পর সেখানে মিলিত হওয়া যায়। কিন্তু এসময় অনুযায়ী কাজ করা সম্ভব হয়নি। কারন ইয়াহইয়া সব সময় বাইরে সফরে থাকতো, এ দিকে হাসপাতালে আমাদের ডিউটির পালাও পরিবর্তন হতো তাই আমরা মিলিত হতে পারিনি।

www.pathagar.com

এক দিন রাত ৯টার দিকে ইয়াহইয়া আমার কাছে আসে। তার সাথে জিয়া তুয়াইসীও ছিলো। আমাকে বলে আমরা ঠিক করেছি যে ছানওয়ান থেকে কায়রো পর্যন্ত পদব্রজে গমন করবো। আমি জিজ্ঞাসা করলাম ব্যামের কর্মসূচী আছে? সে জবাব দেয়, হাইকম্যান্ডও এর পক্ষ থেকে এ নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। আমি জিজ্ঞাসা করলাম কোন হাই-কম্যান্ড? তিনি বললেন: সাইয়েদে কুতুব সভাপতি। তাঁর জন্য রয়েছে ৫ সদস্যের একটা কমিটি যাদেরকে আমরা চিনিনা। ভবিষ্যতে কোন দিন আপনি হয়তো তাদেরকে চিনবেন। এ পদব্রজে মার্চেরপর আর একটা মার্চ হবে। এটা হবে কায়রো থেকে বানছা অভিমুখে পদব্রজে মার্চ ইয়াহইয়া একথাও বলে যে, সে এবং জিয়া হাজন যয়নব গাজালীর বাসায় থাকবে। উপরোক্ত হাজন মুসলিম মহিলা সংস্থার গুরুত্বপর্ন কর্মী। আমার স্ত্রীও এ সংস্থার সদস্য। আলীর স্ত্রী এবং সাইয়েদ কুতুবের এক ভাগ্নীও এর সাথে সংশ্লিষ্ঠ। এসব মহিলারা বিভিন্ন গ্রামের মধ্যে যোগাযোগের মাধ্যম হবে। কোন গ্রুপ গ্রেফতার হলে এ মহিলারা অবশিষ্ট গ্রুপের সাথে যোগাযোগের দায়িত্ব পালন করবে।

একদিন আমি ইয়াহইয়ার সাথে কোন এক বাসায় যাই। ইয়াহইয়া আমাকে জানায় যে এটা মাহমুদ আল গানামের বাসা। সেখানে জিয়া মোহাম্মদ আল গানাম এবং অপর এক ব্যক্তি উপস্থিত ছিলো। এ শেশোক্ত ব্যাক্তি সমপর্কে বলা হয় যে, ইনি জাপানী ষ্টাইলের ব্যাম [জুডো করাতে] এ বিশেষজ্ঞ। ইনি তাদেরকে এব্যাম শিক্ষা দান করেন। এসব ব্যামে খন্জর ব্যবহার করা শেখানো হয়। খন্জারের আক্রমনের হাত থেকে আত্ম রক্ষার উপায় শিক্ষা দেয়া হয়। কোন প্রকার আহত করা ছাড়া আক্রু-মন কারিকে কিভাবে কাবু করা যায় তাও শিক্ষাদেয়া হয়। কিন্তু ইয়া-হইয়া আমাকে জানায় যে, আপনি এধরনের ব্যামের জন্য উপযুক্ত নন।

পনর দিন পরের কথা। এক দিন রাত ১১টায় ইয়াহইয়া আমার কাছে আসে। আমাকে জানায় যে, আমার স্ত্রী নিচে টাকসীতে আমার জন্য অপেক্ষা করছে। আমি আপনাকে যাকিছু বলি, আপনি তা কার্য-কর করবেন। আপনি ৬৯৬৪৬ নাম্বারে টেলিফোন করবেন এবং ফারুক

www.pathagar.com

কে ডাকবেন। ফারুক এলে তাকে বলবেন যে, আমি ওবায়েদ বলছি। অনেকেই গ্রেফতার হয়েছে। আপনি আপনার কাজ সেরে ফেলুন। ফারুক নিজে জবাব না দিলে আপনি কিছু বলবেননা। আমি তাই করি পরদিন সকালে ফারুককে আমি পাইনি। আমাকে বলা হয় যে, সে পোর্ট সাঈদ গিয়েছে। আমি তার ফিরে আসার সময় সমপর্কে জিজ্ঞেসা করলে বলা হয়, আমরা কিছু জানিনা; তিনি কখন ফিরবেন। অপর একজন বলে, আপনি ফারুকের ঠিকানা জানলে তাকে বলবেন যে, মায়ের অবস্থা খুব খারাব। এ লোক নিজেকে ফারুকের ভগ্নিপতি বলে পরিচয় দেয়। আমি তাকে বলি, ফারুকের ঠিকানা আমার জানা নেই।

গত বুধবারের কথা। জিয়া তুয়াইসী হাসপাতালে আমার কাছে আসে, আমাকে বলে যে, ইয়াহইয়া ৮৯৬৪৬ নাম্বারে টেলিফোন করিলে, সেখানেকার লোকদেরকে সে জানিয়েছে যে, সে ফিরে এলে আমাকে যেন ৬৫০৫০ নাম্বারে টেলিফোন করে। ইতিমধ্যে গোয়েন্দা দফতরের একজন কর্মকর্তা ইয়াহইয়ার খোজে তার বাসায় পৌছে। ইয়াহইয়া তখন বাসায় ছিলোনা। বাসায় ছিলো শ্যালক। এসময় ইয়াহইয়াজিয়ার কাছে যায়' তার কাছে কিছু ডলার ছিলো তা নিয়ে নেয় এই বলে সে চলে যায় যে, সে খার্তুম যাবে। এরপর সউদী আরব। গত সোমবার মাজদীর সাথে দেখা করে বলে যে, এরা বিপ্লবের পরিকলপনা করছিলো। এসময় তাদের সকলেই গ্রেফতার হয়ে যায় আমিও এদলের একজন। এদলে আমাকেও বিপ্লবে যোগ দেয়ার প্রস্তাব করে। কিন্তু আমি সরাসরী এ প্রস্তাব নাকচ করে দেই। এরপর আমাকে বলা হয় যে বিপ্লবকালে সংঘর্ষে আহতদের চিকিৎসার দায়িত্ব যেন আমি গ্রহন করি। কিন্তু ভয়ে তাতেও আমি একমত হইনি।

বিস্ফোরক পদার্থের বোতল প্রস্তুত করার প্রক্রিয়া আমি আযমীর কাছ থেকে শিখেছি। আযমী আমাকে বলেছে, এক তৃতীয়াংশ ইথার, এক তৃতীয়াংশ ক্লোরোফর্ম এবং এক তৃতীয়াংশ কেরোসিন লাল রঙ্গের ছোট ছোট বোতলে ভরে নেবে। আযমী প্রক্রিয়া শিখেছে আলীর কাছে। আমি ইয়াহইয়ার মুখে কয়েকটি নাম শুনেছি। যেমন হাজন যয়নব গাজালী। ইনি মহিলা সংগঠনের নেত্রী। তাঁর ভাতিজা ক্যাপ্টেন সা'আদ।

www.pathagar.com

হাজন যয়নাব অনেক চেষ্টা করে তার ভাতিজাকে রাজী করিয়েছে আল্লাহর পথে প্রাণ উৎসর্গের প্রতিজ্ঞায়। আহমদ রায়েফ-এর নামও শুনে ছিলাম। ইয়াহইয়ার মুখেই প্রথম বার। তাকে দুএকবার মাত্র দেখেছিলাম আমি বয়াহইয়া বলেছিলো যে, পাঁচ সদস্যের কমিটির সেও অন্যতম সদস্য। ইসমাঈল হোসায়বী এবং হাজন যয়নাবও এ কমিটির সদস্য। হাজন যয়নবের চিন্তাধারা সম্পর্কে আমার জানা নেই। আমি শুধু এটুকু জানি যে, ইয়াহইয়া হাজনের বাসায় থাকে।

স্বাক্ষর

ডাঃ ফা-আইন

৬, সেপ্টেম্বর ১৯৬৫

ডাক্তারের বিবৃতি আমরা হুবহু উধৃত করেছি। এ বিবৃতি সম্পর্কে কোন মন্তব্য করার প্রয়োজন আছে বলে আমি মনে করিনা। অবশ্য এটুকু বলে দেয়া দরকার মনে করি যে, এ বিবৃতি আদায় করার জন্য ইন্টেলিজেন্সের লোকজন ডাক্তারের উপর অকথ্য নির্যাতন চালায়। তাঁর কাছ থেকে এমন অনেক কথা আদায় করে নেয়, যা সম্পূর্ণ মিথ্যা এবং ভিত্তিহীন। যাই হোক, আমি তার গোটা বিবৃতি পাঠকরে সামসে তুলে ধরেছি এবং অনুরোধ করছি তা বার বার পাঠ করে তা থেকে যা বুঝাযায়, তা বুঝে-নেয়ার জন্য। অবশ্য আমি একটা গুরুত্বপূর্ণ তত্ত্বের প্রতি তাদের দৃষ্টি আকৃষ্ট করবো। তা হচ্ছে এই যে, আপনি এক মাত্র যে বিবৃতি পাঠ করেছেন, তার ভিত্তিতে বিপুল সংখ্যক আদম সন্তানকে সুপ্রীম কোর্টে হাজির করা হয়েছিলো। সেখানে তাদের বিরুদ্ধে অত্যন্ত কঠোর রায় দেয়া হয়েছে। এ অর্থহীন হাস্যকর কাহিনীতে কোন না কোন পর্যায়ে সে সব ব্যক্তির উল্লেখ হয়েছে, তাদের সাথে কি করা হয়েছে, পাঠক তা জানেন কি? শুনুন তাহলে—

এ কাহিনীতে বর্ণিত ব্যক্তিদেরকে মৃত্যু দন্ড দেয়া হয়েছে (সাইয়্যেদ কুতুব)।

—দু'ব্যক্তির মৃত্যুদন্ডাদেশ পরিবর্তন করে যাবৎজীবন কারা দন্ড দেয়া হয় (এদের মধ্যে এ গ্রন্থের লেখক আহমদ রায়েফ ও রয়েছে)।

—এক ব্যক্তিকে যাবজ্জীবন সশ্রম কারাদন্ড (ইসমাঈল হোদাইবী)

www.pathagar.com

—একজনকে দেয়া হয় পনর বৎসর সশ্রম কারাদন্ড (জিয়া তুয়াইসী)।

—একজন বয়স্কা মহিলাকে দেয়া হয় যাবজ্জীবন সশ্রম কারাদন্ড (যয়নাব গাজ্জালী)।

—একজন মহিলাকে (অবিবাহিতা) দশ বৎসর সশ্রম কারাদন্ড দেয়া হয় (আমীনা কুতুব)।

—একজনকে যাবজ্জীবন সশ্রম কারাদন্ড দেয়া হয়। অতঃপর বন্দী অবস্থায় তাকে হত্যা করানো হয় (সাইয়্যেদ কুতুবের ভাগ্নে সাইয়্যেদ রাফআত)।

—একজনকে দেয়া হয় তিন বৎসর সশ্রম কারাদন্ড (ডাক্তার মাজদী)।

অবশিষ্ট ব্যক্তিরা দীর্ঘ সাত বৎসর কারাগারে প'চে-গলে মরে।

আমি অনুরোধ করবো ডাক্তারের নামে কথিত এ বিবৃতিটি পুনরায় পাঠ করার জন্য। এ কাহিনী পাঠ করে তার শাস্তি সম্পর্কেও চিন্তা করুন! কাহিনী এবং শাস্তির মধ্যে কি কোন সামঞ্জস্য আছে?

যে সংবাদপত্র থেকে জন-নিরাপত্তা বিধানকারী উচ্চ আদালতে পেশকৃত এ বিবৃতিটি উদ্ধৃত করেছি। সে পত্রিকারই অপর পৃষ্ঠায় আর একটা খবর আমার চোখে পড়ে। এ খবরের শিরোনাম ছিলে—অপরাধমূলক ষড়যন্ত্র সম্পর্কে ইসলামের দৃষ্টিভঙ্গি।

আল-আজহারের শেখের লজ্জাজনক ফতোয়া।

উপরোক্ত শিরোনামের নিচে বিস্তারিত বিবরনে বলা হয়—

আল-আজহারের শেখ গতকাল এক বিবৃতি প্রচার করেন। বিবৃতিতে তিনি স্পষ্ট করে উল্লেখ করেন যে, ইসলামের দুশমনরা ইসলামের নামে ইসলামের বিরুদ্ধে যুদ্ধের চেষ্টা চালিয়েছে। তারা কিছু সরল প্রাণ ব্যক্তিকে নিজেদের ফাঁদে ফেলে। অতঃপর তাদেরকে ধ্বংসাত্মক এবং হিংসাত্মক অস্ত্রে সজ্জিত করে। কিন্তু আল্লাহ তাআলা তাদের ষড়যন্ত্র নস্যাত করে দিয়েছেন, যাতে ইসলামের মর্যাদা রক্ষা পায় এবং ইসলাম এ সব দোকানদারদের হাতের পুতুলী থেকে রক্ষা পায়। আল-আজহারের শেখ তাঁর বিবৃতিতে আরও বলেন: আল-আজহার যার গোটা ইতিহাস অতিক্রান্ত করেছে ইসলামী চিন্তাধারার প্রচার-প্রসার, ইসলামের উৎকর্ষ সাধন, কুরআনের শিক্ষাদান এবং কুরআনের নিকট থেকে পথনির্দেশ লাভের

www.pathagar.com

কাজে। আল-আজহার সব সময় রাসূলের সুন্নাহর উৎসর দিকে প্রত্যাবর্তন করে। সেখান থেকেই গ্রহণ করে হেদায়াত। আল্লাহ তাআলা তাকে এ মর্যাদা দিয়েছেন যে, সমস্ত মুসলমানের আস্থা অর্জন করেছে সে, আকীদা-বিশ্বাস আর চিন্তাধারার ক্ষেত্রে মুসলমানরা সব সময় আল-আজহারকে নির্ভরযোগ্য মনে করেছে। জীবনের সকল বিষয়ে এবং যুগের নিতে নূতন সমন্বয় আল-আজহারকে মেনে নিয়েছে ফয়সালাকারী হিসেবে। মুসলমানরা আল-আজহারের এ গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব এবং তার নিষ্ঠাপূর্ণ চরিত্রকে সব সময় মূল্য দিয়েছে। এমন কি আল-আজহারকে ইসলমের মোবারক ও পবিত্র উত্তরাধিকারের অন্তর্ভুক্ত করেছে। আল্লাহ তাআলা ভালো করেই জানেন, মিশরের উপর বর্তমানে কোন দায়িত্ব ন্যস্ত হয়েছে। তিনি জানেন, মিশরের নেতারা কোন ধরনের দায়িত্ব পালন করছেন। তিনি পরক্ষ করেছেন মিশর বাসীদের সামনে গাদ্দারদের গহ্বর, কুচক্রীদের আখড়া এবং ধ্বংসাত্মক সংগঠনগুলোকে উন্মোচিত করে দিতে, যাতে মিশর তার আগ্রযাত্রার পর্যায় গুলো অতিক্রম করতে পরে এবং আরব জাতীয়তার এমন এক ধারা সৃষ্টি করতে পারে, যার লক্ষ্য উদ্দেশ্য এক ও অভিন্ন। এমন ইসলাম জারী করতে পারে, যা ভদ্রোচিত চরিত্রের ধারকবাহক। এমন এক মানবতা বিকশিত করতে পারে, যার বাস্তব নমুনা অতি উত্তম।

এ সব ধ্বংসাত্মক সংগঠনের পতাকাবাহীরা নওজোয়ানদের মন থেকে ইসলামের ধারণা মুছে ফেলে নানা প্রকার লোভ দেখিয়ে সত্যিকার ইসলাম থেকে তাদেরকে বিচ্যুত করার ঔধ্যত্ব করে। এহেন পরিস্থিতিতে নওজোয়ানদের বিভ্রান্ত চিন্তা ধারার সংস্কার সাধন এবং কিতাব ও সুন্নাহ থেকে গৃহীত সত্যের দিকে ফিরিয়ে আনা ছাড়া আল-আজহারের সামনে অন্য কোন উপায় নেই। আঁ-হযরত ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসালাম হযরত জিবরাইল আলাইহিসসালামের প্রশ্নের জবাবে স্পষ্ট করে যা বলেছিলেন ইসলামতো তাই। হযরত জিবরাঈল আলাইহিস সালাম প্রশ্ন করেছিলেনঃ হে মুহাম্মদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহিওয়াসাল্লাম)। আমাকে ইসলাম সম্পর্কে বলুন। জবাবে আঁ-হযরত ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ ইসলাম

www.pathagar.com

হচ্ছে এই যে, তুমি সাক্ষ্য দেবে যে, আল্লাহ ছাড়া কোন মা'বুদ নেই। এবং মুহাম্মদ (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) আল্লাহর রাসূল তুমি নামায কায়েম করবে, যাকাত আদায় করবে, রমযানে রোযা রাখবে এবং সামর্থ হলে বায়তুল্লাহর হজ্ব করবে। এ জবাব শুনে জিবরাঈল আলাইহিস সালাম জিজ্ঞেস করেনঃ আমাকে ঈমান সম্পর্কে বলুন। আঁ-হযরত ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেনঃ ঈমান হচ্ছে এই যে, তুমি আল্লাহর প্রতি ঈমান আনবে, আল্লাহর ফেরেশতা, কিতাব, রাসূলের প্রতি ঈমান আনবে, শেষ দিনের প্রতি ঈমান আনবে, ভালো-মন্দ তাকদীরের প্রতি ঈমান আনবে। জিবরাঈল আলাইহিস সালাম শুনে বললেনঃ আপনি ঠিক বলেছেন। অতঃপর তিনি জিজ্ঞেস করলেনঃ আমাকে ইহ্সান সম্পর্কে বলুন আঁ-হযরত ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসল্লাম বললেনঃ ইহ্সান হচ্ছে এই যে, তুমি আল্লাহর এবাদত করবে এমন ভাবে, যেন তুমি তাকে দেখছ। তুমি যদি তাকে না দেখ, তিনি তোমাকে দেখছেন।

এ হচ্ছে আসল ইসলাম, যা আঁ-হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বিবৃতি করেছেন। এ ষড়যন্ত্রকারীর দল যদি ইসলামের মধ্যে এ শর্ত সংযোজন করে যে, মুসলমানকে তাদের দলে যোগ দিতে হবে, যে দল অবস্থার বিরুদ্ধে বিদ্রোহের পতাকা উত্তোলন করে রেখেছে' তবে তারা ইসলামে এক নূতন বেদাআত যোগ করে। মূলতঃ এদের চেষ্টা হচ্ছে এই যে, এমনিভাবে তারা নিজেদের দলের মধ্যে পবিত্রতার রং সৃষ্টি করে নওজোয়ানদের মন-মগজের উপর আধিপত্য বিস্তার করা এবং শাসন কর্তৃত্বলোভীদেরকে নিজেদের সমর্থক করে নেয়া।

এরা ইসলামকে ব্যবসার পন্যে পরিণত করে নিয়েছে। ইসলামতো মানুষকে সম্মান করা শিক্ষা দেয়। মুসলমানের জান-মাল এবং ইজ্জত হেফাযত করার নির্দেশ দেয়। আঁ-হযরত ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেনঃ যে মুসলমান সাক্ষ্য দেয় যে, আল্লাহ ছাড়া কোন মা'বুদ নেই এবং আমি আল্লাহর রাসূল, তার রক্ত অন্য মুসলমানের জন্য হারাম হয়ে যায়। কেবল তিন অবস্থায় তা মোবাহ হতে পারে। এক—বিবাহিত নারী-পুরুষের ব্যভিচারে লিপ্ত হওয়া। দুই—কোন মানুষকে হত্যা করা। তিন—

www.pathagar.com

ইসলাম পরিত্যাগ করা। মুসলিম দল থেকে বিচ্ছিন্ন হওয়া। এক হাদীসে আছে যে, আঁ-হযরত ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বিদায় হজ্ব উপ লক্ষ্যে বলেছেনঃ লোক সকল! আজ কোন্ দিন? ছাহাবা রাদিয়াল্লাহু আনহুম বলেনঃ আল্লাহ এবং তাঁর রাসূলই ভালো জানেন। তিনি চুপ থাকলেন। অতঃপর বললেনঃ আজ কি ইয়াওমুন নাহ্র-কুরবানীর দিন—নয়? ছাহাবায়ে কেরাম বললেনঃ হাঁ, ইয়া রাসূলাল্লাহ। তিনি বললেনঃ তোমাদের ইজ্জত, তোমাদের সম্পদ একে অপরের উপর এমনি হারাম, যেমনি হারাম এ শহরে, এ মাসে এ দিনটি। তোমরা অবিলম্বে তোমাদের পরওয়ারদেগারের হুজুরে হাযির হবে। তিনি তোমাদেরকে আমল সম্পর্কে জিজ্ঞেস করবেন। সুতরাং আমার পরে তোমরা পুণরায় কাফের হয়ে যাবেনা, একে অপরের গর্দান কাটায় লিপ্ত হবেনা। জেনে রেখো, যারা এখানে উপস্থিত আছে, তারা আমার কথা তাদের কাছে পেঁাছিয়ে দেবে, যারা উপস্থিত নেই। যার কাছে আমার কথা পেঁাছিয়ে দেয়া হবে, সে শ্রোতার চেয়েও উত্তম ভাবে তা হেফাযত করবে—এটা বিচিত্র নয়। সবশেষে আঁ-হযরত বলেনঃ আমি আমার কথা পেঁাছায়ে দিয়েছি।

একটা ছহীহ হাদীসে হযরত আবু হোরায়রা রাযিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ যে ব্যক্তি আমাদের বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণ করে, সে আমাদের অন্তর্ভুক্ত নয়। একজন মানুষের প্রাণ নাশ সম্পর্কে এতবড় সতর্কবানী দেয়া হলে নিরপরাধ নাগরিকদের রক্ত নিয়ে খেলা করা এবং শান্তিপ্রিয় নাগরিকদেরকে ভীত-সন্ত্রস্ত করা কতবড় অপরাধ হতে পারে? একজন মুসলমানের সম্পদ অন্য মুসলমানের জন্য হারাম হলে রাষ্ট্রের সম্পদ, জাতীয় স্বার্থ এবং জন কল্যাণমূলক প্রতিষ্ঠান ধ্বংস করা কত বড় অপরাধ হবে?

আমাকে অত্যন্ত বিস্মিত হতে হয় যে, যে ব্যক্তি ইসলামের দাবী করে এবং ইসলামের জন্য বড় দরদ দেখায়, সে কি করে ইসলামের দুশমনদের সাথে বন্ধুত্ব করতে পারে। মুসলমানদের রক্তপাতের জন্য তাদের দুশমনদের সাথে সহযোগিতা বরদাশ্ত করতে পারে সে কি করে। কতো

www.pathagar.com

ভ্রান্ত তার দাবী, কতো অনিষ্টকর তার মিথ্যাচার। সে কি আল্লাহর এ বাণী শোনেনি ঃ

—তাদের সাথে যারা বন্ধুত্ব পাতবে তাদের পর্যায়ভুক্ত হবে তারা। তার কান পর্যন্ত কি আল্লাহর এ বানী পোছেনিঃ

—"তুমি এমন লোক পাবেনা, যারা আল্লাহ ও তার রাসুলের প্রতি ঈমান রাখে অতঃপর আল্লাহ এবং তার রাসুলের দুশমনের সাথে বন্ধুত্ব পাতে সে দুশমন তাদের পিতা-পুত্র-ভাই বা স্বিয় গোত্রেরই হোক না কেন।"

মুসলমানগণ! সাম্রাজ্যবাদ তোমাদের মধ্যে টিকে থেকে তোমাদের কাজ-কারবার তাদের মর্জী মতো পরিচালিত করে তোমাদের সম্পদ লুটে নেয়ার ব্যাপারে নিরাস হয়ে পড়েছে। কিন্তু সাম্রাজ্যবাদ তোমাদের পেছনে এমন কিছু লোক ছেড়ে দিয়েছে, যারা সাফল্যকে নস্যাৎ করতে আদা-নুন খেয়ে লেগেছে। তারা তোমাদের অগ্রযাত্রার পথে প্রতিবন্ধক হচ্ছে। সুতরাং তাদের সঠতা আর ষড়যন্ত্র সম্পর্কে তোমাদেরকে ভালোভাবে সতর্ক থাকতে হবে। এমন যেন না হয়, যাতে তোমাদের বিপ্লবী আন্দোলন পেছনে পড়ে যায়, তোমরা পুনরায় পরাধীনতা জোতদার জমিদরী এবং পুঁজি-বাদের কুপে যাতে ফিরে যাও।

আজহার শরীফ এবং তার সকল কলেজ ও ইনষ্টিটিউট এবং সকল প্রচার মাধ্যম সর্বদা তোমাদেরকে সত্যিকার দ্বীন শিক্ষা দিয়ে আসছে। এ দ্বীন আল্লাহ তাআলা পসন্দ করেছেন। অর্থাৎ পরিচ্ছন্ন দ্বীন, যা বিভ্রান্ত লোকদের সংমিশ্রন মুক্ত, সত্য যথার্থ এবং বাতেল পন্থীদের তেড়া-বাঁকা কথা থেকে মুক্ত ও নিরাপদ। যে কল্যাণ মঙ্গলের ব্যাপারে সকলে একমত, এ দ্বীনের দিকে তোমাদেরকে পথ প্রদর্শন করে। যে অকল্যাণ-অনিষ্টের ব্যাপারে কারো দ্বিমত নেই, তা থেকে তোমাদেরকে রক্ষা করে। সুতরাং আপনারা বুঢ়ভাবে তাতে অবিচল থেকে রুশদ ও হেদায়াতে ধন্য হোন।

বিবৃতির পর্যালোচনা

এটা সত্য যে, গুটি কতেক ছাত্র শায়খুল আজহারের বিবৃতির পর্যা-

www.pathagar.com

লোচনা করা সহজ নয়। এজন্য একটা স্বতন্ত্র গ্রন্থ রচনার প্রয়োজন রয়েছে যাতে বিস্তারিতভাবে আলোচনা করা যায় যে, বিগত কয়েক বছরে আজহার কতটা লজ্জাজনক পরিস্থিতির শিকার হয়ে পড়েছে।

আমীরুল শোয়ারা শাওকী বেক এবং আল্লামা মোহাম্মদ আবদুহুর রূহের মাগফেরাতের জন্য দোয়া করে আমরা আরয করবো যে, শায়খুল আজহার হাসান মামুন যার নামে উপরোক্ত ফতোওয়া প্রকাশিত হয়েছে —তার জন্য উচিৎ ছিলো নিজের এবং অবস্থানের মর্যাদা দেয়া। অজ্ঞ-মুখের মতো শাসকদের একটা বিশেষ চক্রের হাতের পুতুল হওয়ার মতো নিচে নামা তাঁর জন্য শোভনীয় নয়। তার উচিৎ ছিলো সময়ের ওলট-পালটের জন্য অপেক্ষা করা। তাঁর দেখা দরকার ছিলো, মিশরে মোনা-ফেকী এবং মোনাফেকদের কি ভাবে অবসান ঘটে। ডাকাতের দল যে সব অপরাধ মূলক কর্মকান্ড শুরু করেছে তাদেরকে কিভাবে তার মূল্য দিতে হয়। নিরাপরাধ শান্তিপ্রিয় নাগরিকদের জান-মাল নিয়ে খেলা করার শাস্তি হিসেবে নিজেরা কিভাবে তারা কারাগারের অতিথি হয়।

শায়খুল আজহার তার ফতোয়ায় ইখওয়ানুল মুসলমানের বিরুদ্ধে অভি-যোগ উৎথাপন করেছেন যে, ইখওয়ান সাম্রাজ্যবাদের এজেন্ট। কিন্তু আমরা জনাব হাসান মামুনকে জিজ্ঞেস করতে চাই, তাঁর কাছে জানতে চাই যে সাম্রাজ্যবাদ বলে তিনি কোন্ সাম্রাজ্যবাদ বুঝাতে চান? মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ, পারশ্য সাম্রাজ্যবাদ, না ইহুদী সাম্রাজ্যবাদ, আফসোস হয় যে, শায়খুল আজহার হাসান মামুন এবং আল আজহারের অন্যান্য শেখেরা কতো অসহায়, তারা নিজেদেরকে কতো নিচে নামিয়ে দিয়েছেন। আফ-সোস, তাদের জন্য আফসোস।

জনাব হাসান মামুন সাহেব, আপনি বলেনতো, আমাদের সামরিক বিমান বহর যখন ইয়ামানের জনপদ উজাড় করেছিলো, শিশু বৃদ্ধ নারী পুরুষ নির্বিশেষে অসংখ্য মানুষকে মৃত্যুর মুখে ঠেলে দিচ্ছিলো, তখন কোথায় ছিলো আপনার ইসলমী দাওয়াত? তখন কি হয়েছিলো অপনার ইসলামী মূল্য বোধের? ইয়ামানের ঘটনাবলী আপনার জানা নেই, অমরা তা মনে করিনা। আপনি এমন কোন দাবী করলে আমরা কস্মিন কালেও

www.pathagar.com

তা মেনে নেবোনা। আপনার এমন দাবীকে সত্য বলে মেনে নিতে আমরা রাজী নই কিছুতেই। কারন, গোটা মিশর জাতি এ দুঃখজনক ঘটনা সমপর্কে অবহিত ছিলো, কিন্তু নীরবতা অবলম্বন করাছাড়া তাদের কোন গতন্তর ছিলনা, ছিলনা কোন উপায়। কারন, কেউ এর সমালোচনার সাহস করলে তাকে জুতো পেটা করা হতো কারাগারের কালো কুঠারীতে, নিক্ষেপ করা হতো তকে জীনের আরাম আয়েশ থেকে, তার গোটা পরিবারকে করা হতো অতিষ্ঠ। জানিনা আরো কি কি করা হতো। আমরা এটাও মনে করিনা যে, শাসক গোষ্ঠী কারাগারে ইখওয়ান কর্মীদের সাথে কি নিষ্ঠুর আচরন করেছে, তা আপনার জানা নেই। নিশ্চয়ই তা আপনার জানা ছিলো এ যুলুমের বিরুদ্ধে সত্যের বানী বুলুন্দ করাই কি আপনার জন্য শোভনীয় ছিলোনা? সত্যের ক্ষেত্রে যবান বন্ধ করে রাখা মানুষ গোঙ্গা শয়তান একথা অন্যের চেয়ে ভালো করেই জানেন আপনি। তখন কি আপনি এ হাদীস ভুলে বসেছিলেন?

যে বিবৃতিটি তিনি বেতার থেকে প্রচার করিয়েছেন, সংবাদপত্রে প্রকাশ করিয়াছেন এবং আন্তজাতিক সংবাদ সংস্থাকে সরবরাহ করিয়াছেন, শায়খুল আজহারের কর্তব্য ছিলো সুক্ষ্মানদৃষ্টিতে তা পর্যালোচনা করে দেখা। তাঁর উচিৎ ছিলো আল্লাহকে ভয় করা। তাঁর জানা কর্তব্য ছিলো যে কেবল আল্লাহইতো রিজিকদাতা। জীবন এবং মৃত্যু কেবল তাঁর হাতেই নিবদ্ধ।

শায়খুল আজহারের উচিৎ ছিলো স্বয়ং আল আজহারের কথা স্মরন করা এই আল আজহারের বদৌলতেইতো তিনি মোটা বেতন লাভ করেছে দামী গাড়ী ব্যবহার করতে পারছেন, লোকেরা তাঁর হস্ত চম্বন করছে। আল আজহারে না থাকলে তিনি এসব সুযোগ সুবিধা কেথোয় পেতেন আল আজহারের ধ্বংসের জন্য কেবল এটুকুই যথেষ্ট যে শায়খুল আজহার তাঁর দফতরে বসে মিলিটারী ইন্টেলিজেন্স বা সিভিল ইন্টেলিজেন্সের কর্মকর্তার নির্দেশের অপেক্ষা করবেন যে, তাকে কি বিবৃতি দিতে হবে, আর কি বিবৃতি দিতে হবেনা।

জনাব শায়খুল আজহার আপনার কর্তব্য ছিলো মুসলমানদের পক্ষ গ্রহন, তাদের পক্ষে প্রতিরোধ করা যুলুম সিতমের বিরুদ্ধে আন্তর্জাতিক

www.pathagar.com

জনমত সৃষ্টি করা, এ দাবী উৎথাপন করা যে, মযলুমদেরকে দেশের সাধারণ আদালতে পেশ করা হোক। আপনার উচিৎ ছিলো সত্যের পক্ষ সমর্পন করে আওয়াজ বুলন্দ করা, কোন সমালোচনা কের সমালোচা, কোন তিরস্কার কারীর তিরস্কারের তেয়াক্কা না করা। এই বুলন্দ স্হানে দাঁড়াবায় শক্তি সমর্থ তা থাকলে আপনার উচিৎ ছিলো অন্তত ঃ চুপ থাকা। কিন্তু এর বিপরীত তাগুতের সর্বাত্মক সাহায্য সহযোগিতা করা, তাকে শক্তি যোগানো, নিরপরাধ আদম সন্তানের রক্তে হাত রঞ্জিত করার ব্যাপারে যালেমকে উৎসহিত করা, তারা যাতে সর্বশক্তি দিয়ে সত্যের আওয়াজকে স্তব্ধ করতে পারে সে ব্যাপারে তাদেরকে আরও উৎসাহিত উত্তেজিত করা এটা ইসলাম নয়, বরং বাতিলের পৃষ্টপোষকতা, নিকৃষ্ট গোমরাহী।

বর্তমানে সাংবাদিকতা এবং চিন্তার রাজ্য কমিউনিষ্টরা কব্জা করে বসে আছে প্রতিষ্ঠা করে আছে সেখানেই তাদের পূর্ণ নিয়ন্ত্রন-এ সত্য সম্পর্কে নিঃসন্দেহে আপনি অনবাহিত নন। বরং এমন এক সময়ও অতিক্রান্ত হয়েছে, যখন মিশরের সব কিছুই এসে পড়েছিলো তাদের অধিকার। বিশেষ করে সে সময়টি ছিলো তাদের চরম উৎকর্ষের, যখন ইখওয়ানুল মুসলেমুনের নেতা এবং কর্মীদেরকে কারাগারে আটক করা হয়। যেদিন ইখওয়ানের বিরুদ্ধে আপনার বিবৃতি সরকারী পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছে, সেদিন একই পত্রিকার চতুর্থ পৃষ্ঠায় এ খবরও প্রকাশিত হয়েছে—"দক্ষিণ আফ্রিকান সরকার নাগরিক অধিকার হরন শুরু করেছে। নামকরা নেতা ইজাল হাইমনকে সে গ্রেফতার করেছে। এ হচ্ছে প্রথম ব্যক্তি, যার উপর দক্ষিণ আফ্রিকা সরকারের নয়া আইন কার্যকর করা হলো। এ নয়া আইন অনুযায়ী সরকার কোন প্রকার কারণ প্রদর্শন না করে যে কোন লোককে ১৮ দিন পর্যন্ত আটকে রাখতে পারে।" শায়খুল আজহারের জানা উচিৎ যে, ইজাল হাইমনের বিরুদ্ধে দক্ষিণ আফ্রিকা সরকার যে অভিযোগ উত্থাপন করেছে, তাতে বলা হয় যে, সে কমিউনিষ্ঠ। এ থেকে আপনি আঁচ করতে পারেন যে, একজন কমিউনিষ্টকে মাত্র ১৮ দিনের জন্য আটক করা হলে মিশরের সরকারী সংবাদপত্র হৈ-চৈ শুরু করে দেয়

www.pathagar.com

এ হচ্ছে সে গাঁটছড়া, সারা দুনিয়ায় কমিউনিষ্ট চক্র নিজেদের সাহায্য সহযোগিতার জন্য যা অবলম্বন করে থাকে।

এ সংবাদ এবং তার পরবর্তী বিস্তারিত বিবরণ নিয়ে আলোচনা করা আমার উদ্দেশ্য নয়। আমি শুধু এটুকু বলতে চাই যে, যে দিন ইখওয়ানের বিরুদ্ধে আপনার বিবৃতি দেয়া হয়েছে, সে দিন সে পত্রিকায়ই এ খবর ছাপা হয়েছে! একজন কমিউনিষ্ট অপর কমিউনিষ্ট সম্পর্কে যে পন্থা অবলম্বন করেছে, ইখওয়ান সম্পর্কে আপনারও উচিৎ ছিলো অন্ততঃ সে পন্থা অবলম্বন করা। যে ব্যক্তি দুনিয়া হাছিলের জন্য আখেরাত বিক্রয় করে দেয়, অতি অজ্ঞ-মূর্খ এবং ব্যর্থ সে। এর চেয়েও বড় ব্যর্থ নাদান সে ব্যক্তি, যে অন্যের দুনিয়া হাসিলের কাজে নিজের আখেরাত বরবাদ করে। ১৯৬৫ সালে মিশরে মোনাফেকী এবং মোনাফেকদের বাজার বড় গরম ছিলো। শায়খুল আজহারেয় উচিৎ ছিলো। এ গোসলখানায় উলঙ্গ হওয়া থেকে বিরত থাকা। এ ব্যাপারে তাঁকে যদি জীবনও বিসর্জন দিতে হতো, তবে তাঁর এর চেয়ে বড় মর্যাদা ও মহত্বের স্থান আর কি হতে পারে। এর চেয়ে বড় আর কোন্ পথ ছিলো তাকওয়া ও দৃঢ়তার?

বিপর্যকালের আর এক দিক

আমরা ডাক্তার সাহেবের কাহিনী বলেছিলাম। কথার পিটে কথা আসে এজন্য পাঠক বন্ধুদেরও কাছে আমরা ক্ষমাপ্রার্থী। ডাক্তার সাহেবের কাহিনীর সাথে আর একটা কাহিনী আসে আমাদের সম্মুখে। এ কাহিনীর নায়ক আমাদের জনৈক বন্ধু কারাগারের সাক্ষী। এ কাহিনীও আমাদের সামনে তুলে ধরে বিপর্যয় যুগের আর একটা দিক। আমাদের এ বন্ধুর সাংকেতিক নাম আইন।

আমাদের বন্ধু ডাক্তার সাহেবের যখন 'তদন্ত কার্য' চালছিলো, তখন আমিও সেখানে উপস্থিতছিলাম। চাবুকের ঘা কিভাবে তার গায়ের চামড়া বিগলিত করে তুলছিলো, পাগলা কুকুর কিভাবে স্থানে স্থানে তার শরীরের গোশ্ত কামড়ে খাচ্ছিলো, আমি স্বচক্ষে তা অবলোকন করিলাম। এ সব নির্যাতনের চিহ্ন এখনও তার দেহ থেকে মুছে যায়নি। তার বুকফাটা

www.pathagar.com

অর্তচিৎকার যখন পরিবেশকে ব্যাকুল করে তুলতো, তখন কুকুরের ঘেউ ঘেউ চাবুকের গর্জন আর জল্লাদের অট্টহাসি পরিবেশে সৃষ্টি করতো গুঞ্জরণ। অবশেষে তিনি আদৌ করেননি, মোটেই জানেনা—এমন সব কথা স্বীকার করে নেন জান বাঁচানোর জন্য।

ডক্তারের উপর যে নির্যাতন চালানো হয়েছে, আমাদের বন্ধু আইন তা নিজ চোখে দেখতে পাননি অবশ্য তাঁর নিজের কাহিনী নিজের মুখে শুনিয়েছেন আমাদেরকে। তাঁর কাহিনী থেকে আমরা জানতে পারি যে, তাকে গ্রেফতার করার কারন ছিলো এইযে আলী আনামাকী তদন্ত-কালে বলেছিলেন যে, তিনিও ইখওয়ানের সংগঠনের অন্যতম সদস্য। আলী আনামাকী সমপর্কে বলা হয়ে থাকে যে, তিনি ইখওয়ানের গোপন তথ্য ফাঁস করে দিয়েছিলেন। সংগঠন সমপর্কে যাকিছু জানতেন, সবই বলে দিয়েছেন। তিনি নিজে ইখওয়ানের মধ্যে যেসব সমপর্ক স্থাপন করেছেন, তাও বলে দিয়েছেন। তিনি ছিলেন একজন দায়িত্বশীল ব্যক্তি, পাঁচ সদস্যের কমিটির অন্যতম সদস্য।

এ গ্রন্থের উর্দু অনুবাদক জনাব খলীদ হামেদী ১৯৭৭ সালের মার্চ মাসের প্রথম সপ্তাহে কায়রো সফর করেন। সেখানে ইখওয়ানুল মুসলে-মুনের বিশিষ্ট নেতাদের সাথে আলোচনা কালে আলী আশমাবী সম্পর্কেও আলোচনা হয়। ইখওয়ান নেতৃবৃন্দ জানান যে, মরহুম আলী আশমাবী ছিলেন সংগঠনের অত্যন্ত নিষ্ঠাবান এবং ওফাদার সদস্য। তিনি ইখওয়ানের কিরুদ্ধে রাজ সাক্ষী হয়েছিলেন, এটা সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন। তার উপর এমন যুলুম-নির্যাতন চালানো হয় যে, তি ন মনসিক ভারসাম্য হারিয়ে ফেলেন। ইন্টেলিজেন্সের লোকেরা তাঁর কাছ থেকে অনেক অভিযোগের স্বীকৃতি আদায় করে নেন, আইন এবং নৈতিকতার দৃষ্টিতে যার কোনই মূল্য নেই।

আমাদের বন্ধু 'আইন' সাহেবকেও এহেন কর্মক্রমের জন্য তলব করা হয়। ইখওয়ানের তৎপরতা সম্পর্কে অনেক কিছুরই স্বীকৃতি আদায় করা হয়। তাঁর কাছ থেকে। এসব স্বীকৃতির পর তাঁর ধারণা ছিল কমপক্ষে তাকে পনর বৎসর সশ্রম কারাদন্ডে দন্ডিত করা হবে। কারণ, এধরণের

www.pathagar.com

অপরাধ স্বীকার করার জন্য এমন শাস্তিই দেয়া হতো। কিন্তু হঠাৎ একমাস পর তাকে মুক্তি দেয়া হয়। এর রহস্যও আমরা জানতে পেরেছি। তাহচ্ছে এই যে, তার এক ভাই ইন্টেলিজেন্সে চাকুরী করতেন। আমরা শামস বদরানের সাথে তাঁর ঘনিষ্ট সম্পর্ক ও বন্ধুত্বের সুযোগে তিনি তার ভাইকে মুক্ত করিয়ে নেন। আ : আমাদের মুক্তি দাতা তো কেবল আল্লাহ তায়ালা। অভিভাবক হিসাবে আল্লাহই যথেষ্ট।

আমাদের কুঠরীর চতুর্থ কয়েদী হচ্ছে ৩৫ বছরের এক যুবক। গরীব ঘরের সন্তান। ১৯৫৪ সালে ইইওয়ানুল মুসলিমুনকে যখন বে আইনী ঘোষনা করা হয়, তখন এ যুবক ছিলো ইখওয়ানের কর্মী। তখনও তাকে গ্রেফতার করে সামরিক আদালতে হাযির করা হয়। সামরিক আদালতে তাকে মৃত্যুদন্ড দেয়া হয়, কিন্তু এ রায় কার্যকর করা হয়নি। দু'বছর পর ১৯৫৬ সালে তাকে মুক্তি দেয়া হয়। কারাগার থেকে মুক্তি লাভের পর ধর্মীয় এবং রাজনৈতিক সম্পর্ক ছিন্ন করে সে। সবরকম রাজনৈতিক তৎপরতা ত্যাগ করে। তার মাথায় একটা চিন্তাই সওয়ার হয়- বৈধ অবৈধ যেকোন উপায়ে অর্থনৈতিক অবস্থা উন্নত করা। শিল্প সাহিত্যের সাথে তার কোন সম্পর্ক ছিল না; কিন্তু তা সত্বেও সে এক্টর হওয়ার চেষ্টা চালায়। তার কথা থেকে এক্টিং করার স্বাভাবিক যোগ্যতা তার মধ্যে সম্পূর্ণ অনুপস্থিত। নাটকে কখনও কাজ করার সুযোগ পেলেও তা ছিল দ্বিতীয় শ্রেণীর চরিত্র পর্যন্ত সীমাবদ্ধ। আর তাও কখনো এক মিনিটের কখনও দু-মিনিটের। অধিকাংশ নাটকে তাকে এমন চরিত্র দেয়া হয়, যাতে কিছু বলতে হতোনা। যা হোক কারাগার থেকে বের হওয়ার পর সে দীর্ঘ দশ বৎসর এদিক-সেদিক ছুটাছুটি করে। কিন্তু সর্বত্রই ব্যর্থ হয়। আরবীয় প্রবাদ অনুযায়ী সে সমুদ্রে চাষাবাদ করে। এসময় দ্বীন এবং রাজনীতির সাথে সম্পৃক্ত সবকিছুই সে বিস্মৃত হয়। অবশ্য মাঝে-মধ্যে সে জুমার নামাজে শরীক হতো বৈকি।

অদৃষ্টের নির্মম পরিহাস সে অকস্মাৎ একদিন নিজেকে দেখতে পায় কারাপ্রকোষ্ঠে হিংস্র জন্তু পারবেষ্ঠিত অবস্থায়। ধর্ম ও রাজনীতির সাথে তার কোন সম্পর্ক নেই—একথা প্রমান করার জন্য তবুও চেষ্টা করে

www.pathagar.com

সে। কিন্তু তার কথায় বিশ্বাস স্থাপন করেনি। কেবল তার ক্ষেত্রেই নয়, আরও অনেকের ক্ষেত্রে এমনটি ঘটেছে। কপাল যাদেরকে জেলখায় নিয়ে এসেছে। ইচ্ছায়-অনিচ্ছায় জীবনের অপর পিঠ দেখে নেয়াই ছিল হয়তো তাদের ভাগ্যলিপি। জীবনের দিকটি ছিল অত্যন্ত দুঃখপূর্ণ ও ভীতিপ্রদ। জেনারেল হামজা বিসিউকী ও অন্যান্য সামরিক অফিসারদের 'অতিথেয়তায়' জীবন যাপনের অভিজ্ঞতা। যারা আন্দোলনের সক্রিয় কর্মী ছিলো, এদের নির্যাতনের শিকার হওয়া ছিলো স্বাভাবিক ব্যাপার। কিন্তু যারা ছিলো নীরব দর্শক, ষ্টীমের কষাঘাত থেকে তারাও রক্ষা পায়নি।

আমাদের কুঠরীতে যারা ছিলো, তারা ছিলো নানা ধরণের লোক। তাদের স্বভাব প্রকৃতি ছিলো নানা রকম। এ ক্ষুদ্র প্রকোষ্ঠে প্রতিটি মুহূর্তেই তাদের উপর চলতো নির্যাতনের ষ্টীম রোলার। কিন্তু তার পরও শান্তিপূর্ণ সহ অবস্থানের নীতি অনুযায়ী তারা চলার চেষ্টা করতো। এখানে নানা মতের নানা চিন্তার লোকের অপূর্ব সমাবেশ ছিলো। এক শ্রেণীর লোক ছিলো, যারা নামাযে সর্বচেয়ে বেশী আনন্দ লাভ করতো। কুরআন মজিদের যেটুকু অংশ স্মরণ ছিলো, বারবার তা পাঠ করতো। আমারও অধিকাংশ সময় কাটতো এভাবে। আর এক শ্রেণীর লোক ছিলো, যারা সব সময় প্রেম-ভালোবাসার স্মৃতি নিয়ে বিভোর থাকতো। সব সময় আমাদেরকে প্রিয়ার কাহিনী শুনিয়ে মনকে হালকা করতো। এক একটা কাহিনী বারবার বলতে তাদের মনে বিরক্তির সঞ্চার হতোনা মোটেই। তৃতীয় শ্রেণীর লোক ছিলো, যারা উপরের স্তরের লোকদের সাথে নিজেদের বন্ধুত্বের মনগড়া কাহিনী বর্ণনা করে আনন্দ লাভ করতো।

এখানে আমার অবস্থা ছিলো, করুন। কেবল ভাবতাম, এসব কি হচ্ছে ভবিষ্যতে কি হবে। বারবার আমার মনে পড়তো গার্সিয়ার কথা। জাঁপল সবত্র তাঁর রচনায় গার্সিয়ার কাহিনী উল্লেখ করেছেন। তার কাছে চিন্তা ধারার এত বিপুল সম্ভার বর্তমান ছিলো যে, দশ হাজার বৎসর চুপচাপ তাতে ডুবে যাওয়ার জন্যও তা ছিলো যথেষ্ঠ।

www.pathagar.com

দশম দৃশ্য

তদন্তঃ রাশিয়ান ষ্টাইল

আমি প্রায় চল্লিশ দিন তদন্তের অপেক্ষায় পড়ে থাকি। আমরা শুনাম কুঠরীর পাকা মেঝেতে। বড় বড় মোটা তাজা ইঁদুর আমাদের কাছে আসতো অবিরাম। কখনো পায়ের সাথে আবার কখনো মুখের সাথে খেলা করতো এসব ইঁদুর। এসবের পরোওয়া না করেই আমরা পড়ে থাকতাম নিশ্চিন্তে। আবশ্য আমাদের কুঠরীতে আসা এক নূতন সাথী ইঁদুরকে ভয় করতো চাবুকের মতো। রাতে সে বারবার জেগে উঠতো। আমাদেরকেও জাগিয়ে তুলতো এবং দোহাই দিয়ে বলতো তারসাথেজেগে থাকার জন্য। সকলে মিলে তাকে ইঁদুরের হাত থেকে রক্ষা করার জন্য। কিন্তু কি করে তাকে ইঁদুরের হাত থেকে রক্ষা করবো, কোন উপায় খুঁজে পেতামনা। অবশ্য যেসব ছিদ্র দিয়ে ইঁদুর প্রবেশ করতো, আমরা কাপড় দিয়ে তা বন্ধ করার চেষ্টা করতাম। কিন্তু ইঁদুরগুলো বড় বেয়াড়া। আমাদের কাপড় কেটে ভেতরে প্রবেশ করতো এবং শুরু করতো তোলপাড়।

কারাগারের খাবার

কুঠরীতে একটা টুকরী ছিলো। কারা ব্যবস্থাপকরা তাদের মর্জি অনুযায়ী স্বল্প পরিমাণ খাদ্য এ টুকরীতে রেখে যেতো। নাশতার জন্য দেয়া হতো চা এবং শুকনো রুটির টুকরো। মাঝে মধ্যে দেয়া হতো বিদেশী পনীর, কালো মধু এবং পেশা চানার চাটনী। নাশতার জন্য সব দিন এসব পাওয়া যেতোনা। কোন দিন এগুলোর মধ্যে এক আধটা পাওয়া যেতো। অবশ্য দুধবিহীন চা সব দিন পাওয়া যেতো।

যে দিন আমাদেরকে মিশরের সাধারণ খাবার দেয়া হতো সে দিন চারজনের ভাগ্যে জুটতো একটুকরো রুটি। পনীর দেয়া হতো সবাইকে মিলে এক টুকরোর একচতুর্থাংশ। একটা ছোট শিশুর নাশতার জন্যও এটা যথেষ্ট ছিলনা। আমি উল্লেখ করেছি যে, নাশতার জন্য আমাদেরকে কালো মধু দেয়া হতো। আমাদের চারজনকে এক চামিচ মধু দেয়া হতো। কিন্তু তাও চামিচ পুরো নয়।

www.pathagar.com

আমাদেরকে রুটি দেয়া হতো যোহরের সময়। বাইরে থেকে ভিতরে ছুঁড়ে মারা হতো। এটাকে দুঃবেলার খাদ্য মনে করা হতো। এর পরিমাণ কি ছিলো? চারজনের জন্য দেড়টা রুটি, এটি সযত্নে রেখে দিতাম। খাবার সময় হলে আমাদেরকে দেয়া হতো তরকারীর একটা ছোট চোঙ্গা। এ তরকারী হররোজ পরিবর্তন হয়ে আসতো। আমাদের পক্ষে তা চেনা ছিলো কষ্টকর। ক্ষুধায় কাতর বিধায় আমরা তা লুফে নিতাম।

পানির ব্যাপারটাও কম চিত্তাকর্ষক নয়। দুপুরে খাবার পর বেশ সময় কেটে গেলে কারাগারের সিপাই এসে কুঠরীর দরজা খুলে দিতো আমরা লাইন ধরে দাঁড়াতাম। তারা আমাদের চারজনকে এক জগের এক চতুর্থাংশ পানি দিতো। গরমের সময় পানির সমস্যা প্রকট হয়ে দেখা দিতো কিন্তু ধীরে ধীরে এসব অসুবিধা সয়ে নিতে অভ্যস্ত হয়ে উঠি।

মাঝে মধ্যে আমাদের জন্য কিছু ফলও আসতো। কিন্তু তার পরিমাণ এত কম ছিলো যে উল্লেখেরই অযোগ্য। আমরা রোজ ভোরে পায়খানায় যেতাম। পায়খানা ছিলো নিচের তালায়। সেখানে গিয়ে পায়খানার অভিযান চালানো ছিলো আমাদের জন্য এক বিরাট পরীক্ষা, তা এত ভয়ংকর ছিলো যে, সারা রাত মনে এ চিন্তা থাকতো যে, ভোরে পায়খানার জন্য অভিযান চালাতে হবে। তা কিভাবে উত্তীর্ণ হতে হবে ভোর বেলা যখন আমোদেরকে নিচে যাওয়ার সেপাই আসত, মনের ছট-ফট বেড়ে যেতো। মুখে দোয়া উচ্চারিত হতো এ পালা যেনো ভালো-ভাবে কেটে যায়। রাত দিনে যতো পরিমাণ পেটানো হতো আমাদেরকে তার সমপরিমাণ ভুগতে হতো পায়খানায় যাওয়ার সময়।

ক্ষুধা আর পিপসায় আমরা প্রতি নিয়ত ছটফট করতাম। পায়খানায় গমনকালে আমাদের প্রত্যেকের একান্ত কামনা হতো, যতো তাড়াতাড়ী সম্ভব এ থেকে মুক্ত হওয়া যায়। মনে করুন, চক্ষের পলকে এ পর্যায় অতিক্রম করা দরকার। সে এগুলি দেখাতে সক্ষম হতোনা, আলসতার জন্য সেই দায়ী হতো। পানি পান করার সময়ও দেখা দিতো এক জটিল সমস্যা। তৃপ্তি সহকারে পানি পান করার সুযোগ পেলে তাকে

www.pathagar.com

মনে করা হতো অত্যন্ত ভাগ্যবান ব্যক্তি। সারা দিনের পিপাসা নিবারণ করতে হতো একদফায়। কেউ কেউ রোজা রেখে নিতো। কেউ কেউ পাহারাদারদের চোখে ধুলো দিয়ে পানির কলে গিয়ে নলের মুখে পানি পান করে বিদ্যুতের গতিতে ফিরে আসতো। এসময় দু'হাতে পানির নল চেপে ধরে উটের মতো পানি পান করতো। এভাবে পান করার জন্য কি মাশুল দিতে হবে তা তারা ভুলে যেতো। যারা এভাবে পানি পান করতে দেখতে পেলে সেপাইরা তাদেকে এমন প্রহার করতো যে, তারা মৃত্যুর পাড়ে পৌছে যেতো। এমনও ঘটেছে যে, এভাবে পানি পান করতে গিয়ে পাহারাদারদের হাতে ধরা পড়লে পাহারাদার বমি করিয়ে সব পানি বের করে ছেড়েছে। বেহাল হয়ে তাকে ফিরে আসতে হতো কুঠরীতে কখনো মাথা ফাটাতে হতো, দাঁত হারাতে হতো। কারা রক্ষীরা গোছল করার জন্যও একটা দিন নির্দিষ্ট করে রেখেছিলো। এটাকে গোছলের দিন বলা হলেও আমরা তার নাম দিয়েছিলাম কালো দিন। সে দিন ভীষণ পিটনী দেয়া হতো। অনেকে ভীষন ভাবে আহত হতো। অনেকে ভয়ানক কান্ড ঘটাতো। বিপুল সংখ্যক লোক আহত হয়ে পড়ে থাকতো। নিয়ম ছিলো একজনকে ৪০ বড় জোর ৫০ সেকেন্ডের মধ্যে গোছল সমপন করতে হবে। না হলে তার মঙ্গল নেই।

সামরিক কারাগারে প্রথম প্রথম আমরা কাপড় নিয়ে গোসল করতে যেতাম এবং গোসলখানার ভেতরে কাপড় খুলতাম। আমরা কাপড় খোলার আগেই শুরু হতো চাবুক বর্ষণ। আমরা গোসলখানা থেকে ফিরে আসতাম। পানির পরিবর্তে রক্ত দিয়ে গোসল করতে হতো আমাদেরকে। আমরা গোসল এড়িয়ে চলার চেষ্টা করতাম। কিন্তু তারা আমাদেরকে ভিষণভাবে প্রহার করতো—হাত দিয়েও এবং পা দিয়েও। অবশেষ আমরা গোসল করার বিপদ মাথা পেতে নিতাম। গায়ের প্রায় সমস্ত কাপড়ই খুলে যেতাম। গোসলের দিন সেপাইরা 'মার পিটের ঈদ' পালন করতো। গোসলখানার অবস্থাও ছিলো শোচনীয়। অধিকাংশ সময় সেখানে পানি থাকতোনা। এ অবস্থায় আমরা 'বড় জেল' আঙ্গিনার কুপ থেকে পানিতুলতাম এবং পেশাবের পাত্রে তা জমা করতাম। কাজটি ছিলো কঠিন এবং বিপদসংকুল।

www.pathagar.com

যেদিন ভোরে গোসল করতে হতো, তার আগের রাত অতিবাহিত হতো পরিকল্পনায়। আমরা ভাবতাম, ভোরে কি কি ঘটনা ঘটতে পারে, কি ভাবে তা এড়িয়ে যাওয়া যায়। দিনটি কিভাবে কাটবে, কি ভাবে সবচেয়ে কম কষ্ট এবং সবচেয়ে কম ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে কাজ সারানো যায়। আমাদের পরিকল্পনা হলো এমনঃ অমুক ব্যক্তি বিদ্যুতের গতিতে কূপের কাছে যাবে রাবারের পাত্র ভরাবে। অমুক ব্যক্তি পথে তার কাছ থেকে তা নিয়ে অমুককে দেবে। অমুক ব্যক্তি কাপড় খুলে গোসলখানায় অপেক্ষা করবে এবং চল্লিশ সেকেন্ডের মধ্যে গোসল সম্পন্ন করবে। তাড়াতাড়ি কাপড় পরে বাইরে আসবে। একই বিদ্যুৎ গতিতে অন্যের জন্য পানি আনবে। আমাদের রাতের এক বিরাট অংশ কাটতো এ পরিকল্পনার কাজে। প্রত্যেকের ডিউটি এবং পালা ঠিক করে দেয়া হতো, যাতে তখন কোন ভুল না হয়।

স্বল্পতম সময়ে পায়খানার কাজ সারবার অভিজ্ঞতা অনেক সাথিরই ছিলোনা এটাও ছিলো একটা বিশেষ ট্রেনিং এর বিষয়। কিছুদিনের মধ্যেই আমরা এ ট্রেনিং গ্রহণ করি। এ কাজেও পটু হয়ে উঠি। আমাদের কেউ পায়খানা থেকে ফিরে এলে তাকে সকলে জিজ্ঞাসা করতো, তুমি কি কাজ সেরে এসেছ? এ কাজে যেদিন সফল হতাম, সে দিন আমরা নিজেদেরকে অত্যন্ত ভাগ্যবান মনে করতাম। কেউ এ কাজে ব্যর্থ হলে তার চেহারা বিমর্ষ হয়ে পড়তো। আমরা পর দিন পর্যন্ত ধৈর্য ধারণের তালকীন করতাম কিন্তু এতে কি আর কাজ হয়?

কুঠরীর বাইরে কোন প্রকার কথাবার্তা ছিলো নিষিদ্ধ। কাউকে কথা বলতে দেখা গেলে তার দশা খারাব। ন্যূন পক্ষে তাকে একশ ঘা চাবুক মারা হতো। জল্লাদ অনেক সময় আনন্দে আত্মহারা গুনতোনা। একশ ঘার স্থলে পাঁচশ ঘা পর্যন্ত চাবুক মারতো। কুঠরীর বাইরে আমাদের কারো সাথে সাক্ষাৎ হলে সালাম কালামের নিয়ম ছিলো এই যে, চোখের ভ্রুকে উপরে-নিচে আন্দোলিত করা। উপরে তোলা মানে সালাম করা, আর নিচে নামানো মানে সালামের জবাব দেয়া। এই অভিনব ভঙ্গিতে সালাম কালামের পর পর কুঠরীতে ফিরে এলে হাসতে হাসতে খিল ধরে যেতো। এতো হাসি নয়, মানবীয় মূল্যবোধের অবমাননার জন্য বিদ্রূপ।

www.pathagar.com

অবাক কাণ্ড

কুঠরীর ভিতের জগৎ ছিলো শান্তিপূর্ণ। সম্ভবতঃ তখন মিশরে কুঠরীই ছিলো সবচেয়ে নিরাপদ স্থান। কুঠরীর বাইরে আসা ছিলো আযাবের সমার্থক। বাইরে আনাই হতো শাস্তি দেয়ার জন্য। এতে অনেকে নানা অঙ্গ হারায়। কেউ চক্ষু হারায়। কেউ হারায় পা। এমনও দেখা গেছে যে, পাহারাদাররা কাঁচ দিয়ে পায়ের আঙ্গুল কেটে দিয়েছে। এসব পাহারাদার এবং জানোয়ারের মধ্যে পার্থক্য করা কঠিন। অবাক কাণ্ড এই যে, কেবল আমরাই পিটুনীর শিকার হতাম না। বরং দিনে যারা আমাদের পেটাতো রাতে চলতো তাদের মেরামতের কাজ। কুঠরীর দরজায় একটা ছিদ্র ছিলো। তা দিয়ে উঁকি মেরে আমরা পাহারাদারদের মেরামতের কাজ অবলোকন করতাম। রাত হলেই শুরু হতো তাদের মেরামত। কান মলা এমন কি পিটুনির পালা। এ ধারা ফজর পর্যন্ত অব্যাহত থাকতো। ফজরের সময় একজন সেপাইকে পাঠানো হতো কারাগারের তিনশ কুঠরীতে অবস্থানকারীদেরকে পায়খানায় যাওয়ার ঘোষণা দেয়ার জন্য সকলে 'বাম হাতের কাজ' সম্পন্ন করেছে কি-না, এক ঘন্টার মধ্যে তাকে ফিরে এসে রিপোর্ট করতে হবে। এ সেপাই পাগলা কুকুরের মতো আমাদেরকে এলোপাথাড়ী পেটাতে শুরু করতো পায়খানার দিকে নিয়ে যাওয়ার জন্য, যাতে সে অর্পিত দায়িত্ব নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে সমাপ্ত করতে পারে। অনেক সময় এ অসাধ্য সাধনে সে ব্যর্থ হতো। আর মিথ্যা রিপোর্ট দেয়ারও উপায় ছিলোনা। কারণ তার উপরও তদন্তকারী ছিলো ব্যর্থতার জন্য তার নাম অপরাধীদের তালীকাভুক্ত হতো। আর এ জন্য তাকে রাতে দন্ড ভোগ করতে হতো। এমনি ভাবে নাশতা বন্টনকারী সেপাইরও দায়িত্ব ছিলো এক ঘন্টায় গোটা কারাগারের নাশতা সম্পন্ন করানো। ব্যর্থ হলে তার নামও অপরাধীদের তালিকাভুক্ত হবে। রাতের বেলা শুরু হবে তার উপর নির্যাতনের পালা। এ কারণে কারাগারের সেপাইরা আমাদের সাথে প্রতিশোধ মূলক আচরণ করতো। কারণ, তারা মনে করতো, আমরাই তাদের দুর্ভাগ্যের কারণ হয়ে এসেছি।

www.pathagar.com

সামরিক কারাগারের অনেক জল্লাদ বিরাট নাম ও খ্যাতী অর্জন করেছিলো, যেমন – জগলুল, শাম্বু, রুদী, নুবী প্রমুখ। একজন জল্লাদ ছিলো অতি নিষ্ঠুর ও হিংস্র প্রকৃতির। তার দু'হাত ছিলো পাথরকায়। যার মুখে তার হাত পড়তো, তার আর পানি তলব করার সুযো হতোনা। কারাগারের অঘোষিত যুদ্ধে আমাদের অনেককেই কান-চোখ হারাতে হয়েছে। এখানে সুস্থ এসেছিলো, বেরিয়েছে বিকলাঙ্গ হয়ে।

এখানে অভিযান সফল করার কাজে নিয়োজিত করা হতো বোকা ধরণের সেপাইদেরকে। সামরিক কাহিনীতে মানসিক এবং মনস্তাত্তিক পরীক্ষায় যারা উত্তীর্ণ হতে ব্যর্থ হতো, তাদেরকে নিয়োগ করা হতো একাজে। এসব সেপাইদের সাথে বুদ্ধি-শুদ্ধির কোন কথা বলা কেবল কষ্টসাধ্যই ছিলনা, বরং রীতিমতো অসম্ভব ছিলো। এমন কিছু সেপাইকেও ডিউটিতে নিয়োগ করা হয়, যারা ছিলো অত্যন্ত নেক দিল। তাদের মধ্যে গ্রামীন মানুষের সরলতা এবং নিঃষ্পাপ ভাব স্পষ্ট হয়ে দেখা দেয়। কিন্তু বেশী দিন যেতে না যেতেই অত্যাচার-মিযাতিনের পরিবেশে বাস করে তারাও পরিণত হতো হিংস্র জন্তু জানোয়ারে।

আহম্মদ আবু বুন্দান ছিলো একজন পবিত্র স্বভাবের সেপাই। ফজরের নামাযের পর সে দীর্ঘক্ষণ কান্নাকাটি করে আল্লাহর দরবারে দোয়া করতো খোদা আমাদেরকে এ দোজখ থেকে নাজাত দিন কিন্তু আমরা দেখেছি, শেষ পর্যন্ত তার মতো সৎ স্বভাব প্রকৃতির সেপাইও রক্তলোলুপ পিশাচে পরিণত হয়েছে। আমার মনে আছে, একবার সে কুঠরীর দরজা ভেঙ্গে ভেতরে প্রবেশ করে আমাদেরকে পিটিয়েছিলো। দরজার কাঠ দিয়ে সে আমাদেরকে এমন সাংঘাতিক পিটুনী দেয় সে, কাঠ ভেঙ্গে চৌচির হয়ে যায়।

সময় অতিক্রমনের সঙ্গে আমরা কোন কোন সেপাইকে পোষ মনিয়ে নেই। আমাদের এক বন্ধুতো জগলুলের মতো পাশান প্রাণ জল্লাদকেও তার বোতলে ভরতে সক্ষম হন। আমাদের আর এক বন্ধু রুমীকেও অনুগত করে নিয়েছিলেন। অবশ্য শাম্বু সবচেয়ে পাশান প্রাণ প্রমাণিত হয়। আমাদের যে বন্ধুটিকে এ ব্যাপারে সবচেয়ে সফল-স্বার্থক

www.pathagar.com

পুরুষ মনে করা হতো। শাম্বুকে বশ করতে তিনি ব্যর্থ ও হতাস হন। তদুপরী তাকে সেপাই থেকে হাবিলদারে উন্নীত করা হয়। এরপর আমাদের অবস্থা আরও করুন হয়ে উঠে। আমাদের সাথে আচরণ এতটা কঠোর হয়ে উঠে যেন সে জেনারেল মন্টো গোমারী আর কি!

কঠোর হওয়া সত্ত্বেও আমাদের কারা জীবনে সামরিক কারাগারের দিনগুলোকেই 'শুভ' বলে ধারণা হতো। আমরা আমাদের অবসর সময় ব্যয় করতাম ইবাদত ইস্তিগফার আর তিলওয়াতে কালামে পাকে। আমাদের এক একজন তার অভিজ্ঞতা ও জ্ঞানের সার কথা অপরের সামনে তুলে ধরতো। ২১০ নাম্বার কুঠরীতে যে ডাক্তার সাহেব আটক ছিলেন, তিনি প্রতিদিন আমাদের সামনে চিকিৎসা বিজ্ঞান সম্পকে দারস দিতেন। তিনি কলেজে যে ভাবে চিকিৎসা বিজ্ঞান শিখে ছিলেন ঠিক সে ভাবে চিকিৎসা বিজ্ঞানের অজানা কথা আমাদেরকে শোনাতেন। আমি প্রতি দিন ইতিহাস এবং ইতিহাস দর্শন বিষয়ে বলতাম। তৃতীয় বন্ধুটি আমাদেরকে শোনাতেন আইন এবং আইনের ইতিহাস। আমার মনে পড়ে, কারাগারের এক কুঠরীতে ছিলো একজন পাপোশ প্রস্তুতকারক বন্দী। তিনি আমাদেরকে শোনাতেন নানা ধরনের চামড়ার কথা। ভালো জুতো আর খারাপ জুতার প্রার্থক্য সম্পর্কে আমাদেরকে অবহিত করতেন। এ দু'প্রকার জুতা চেনার উপায় সম্পর্কেও বলতেন।

কারাগারের কালোরাত

আমরা কারাগারের কালোরাতের বিরাট অংশ কাটাতাম দিনের ঘটনা বলী বর্ণনা করে তা নিয়ে হাসাহাসি করে। আমাদের মানসিক অবস্থায় অনেক পরিবর্তন সূচীত হয়েছিলো। আমার মনে আছে, কোন কোন সময় আমরা এতটা হাসতাম যে, আমাদের পাঁজরের হাঁড় ভেঙ্গে যাওয়ার উপক্রম হতো। আমরা সব কিছু নিয়ে উপসাহ করতাম! তদন্তকারী অফিসারদের কথা এবং তদন্তকালে তাদের আচরণ নিয়ে আমরা ঠিপপনী কাটতাম। তারা যে তদন্ত আদালত কায়েম করতে চায়, তা নিয়েও আমরা হাসাহাসি মাতামাতি করতাম। আমরা হিসাব কষে দেখতাম, কে কত বছর

www.pathagar.com

কারা ভোগ করবে। কোন কোন বন্ধুকে আমরা উৎসাহিত করতাম, কুঠরীর ক্ষুদ্র ছিদ্র দিয়ে উঁকি মেরে বাইরের অবস্থা দেখতে। চলমান সড়ক এবং নয়া মিশরের অবস্থা দেখতে ছিদ্র পথে উঁকি-ঝুঁকি শেষ করে নিচে নেমে এসে স্বদেশের অবস্থার জন্য অশ্রু বিসর্জন করে স্ব-স্ব স্থানে ফিরে যেতাম।

দুনিয়ায় কি হচ্ছে কি ঘটছে, তার কোন খবরই ছিলোনা আমাদের। পত্রিকা পড়া ভাগ্যে জুটতো না, রেডিও শোনার সুযোগ হতোনা, সাক্ষাৎ করার জন্যও কারো আগোমন হতোনা, দুনিয়ার সাথে সম্পর্ক রাখার কোন মাধ্যমই ছিলোনা। মাঝে মধ্যে পায়খানার কাছে পড়ে থাকা পুরানো কাগজের টুকরো কুড়িয়ে নিয়ে তা থেকে পূর্বাপর সম্পর্কহীন খবর পড়ার চেষ্টা করতাম। কারাগারে গুজবেরও বেশ প্রচলন ছিলো। এসব গুজবের কোন হাত পা ছিলোনা। থাকতোনা এসবের পেছনে কোন সত্যতা। জীবনের কর্মকান্ড থেকে যারা বিচ্ছিন্ন, এসব গুজব ছিলো তাদেরই মনের বহিঃপ্রকাশ, আসা-আকাংখ্যার প্রতীক।

আমি কুঠরীর বন্ধুদের সাথে তদন্ত কালে ঘটতে পারে এমনসব সম্ভাব্য বিষয় নিয়ে আলাপ আলোচনা করতাম। ভাবলাম সেসব প্রশ্ন নিয়ে, যা সেখানে জিজ্ঞাসা করা যেতে পারে। কপ্পনারাজ্যে তা মনের কোনে হাযির করার কোশেশ করতাম। কোণ সেপাই হাতে কোন কাগজ নিয়ে কারাগারে প্রবেশ করলে গোটা কারাগারে হতবুদ্ধিতা বিরাজ করতো। তদন্তের জন্য যাদেরকে তলব করা হবে, এসব কাগজে তাদের নাম থাকতো। কুঠরীর বাইরে দাঁড়িয়ে সেপাই যখন এসব নামধরে ডাকতো, তখন আমাদের কোন সাথী কুঠরীর দরজার ফাক দিয়ে উকি মেরে তাকিয়ে থাকতে তার মুখে ঘোষণা শুনে আমোদেরকে জানাতো? আমরা ভীত সন্ত্রস্ত হয়ে বসতাম মনোযোগ সহকারে। এক দিন আমাদের বন্ধু ডাক্তার সাহেব সমপর্কে ইতিপূর্বে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে দরজার ফাঁক দিয়ে উকি ঝুকি মারার ডিলটি ত ছিলো। বাইরে যা কিছু দেখতে পাচ্ছিলে আমাদেরকে বলে যাচ্ছিলো। সে বলছিলো সেপাই আমাদের দিকে তাকাচ্ছে

www.pathagar.com

সে আমাদের কুঠরীর দিকে উঁকি মারছে। এখন সে গাড়ীতে উঠছে ....মনে হচ্ছে আজ আমাদের কাউকে তদন্তের জন্য তলব করা হবে। আমার মনে হলো সময় বুঝি ঘনিয়ে এসেছে। এবার আমার ডাক পড়বে বুঝি। আমি হঠাৎ উঠে দাঁড়ালাম। সেপাই কাছে আসে, কুঠরীর দরজা খুলে যায়। সেপাই আমার নাম ধরে ডাকে। আমি কারাগারের নির্দেশ অনুযায়ী কয়েক মিনিটের মধ্যেই সিঁড়ির দিকে ছুটে যাই। দেয়ালের দিকে মুখ করে ৬ নাম্বার ষ্টোরের কাছে দাঁড়াই। এখানে কিছুক্ষন অপেক্ষা করে কাটাই, যাতে অন্যান্যদেরকেও সেপাই ডেকে জড়ো করতে পারে। এসময় আমার কাছ দিয়ে যাওয়া প্রতিটি সেপাই আমাকে সজোরে এক থাপপড় মারে। সকলকে জড়ো করার পর চাবুক মারতে মারতে আমাদেরকে হাকিয়ে নিয়ে যাওয়া হয় তদন্ত স্থলের দিকে। হাকিয়ে নেয়ার ধরন ছিলো পুরাতন। আমাদের জন্য তখন এটা আর নূতন কিছু নয়।

তদন্ত দফতরের দৃশ্য

তদন্ত কার্যক্রম শুরু হয় কয়েকটা দফতরে। সব দফতর থেকেই ভেসে আসছিলো আর্ত চিৎকারের শব্দ। চাবুকের গুন্জরন কান ফাটবার উপক্রম। আমাদেরকে মাটিতে বসানো হয় দেয়ালের দিকে মুখ করে। আমরা শব্দ শুনতে পেতাম, কিন্তু কাউকে দেখতে পেতামনা। আমাদের পালা আসা পর্যন্ত এভাবে বসে থাকার নির্দেশ ছিলো আমাদের প্রতি। যখনই আমাদেরকে তদন্তের জন্য ডাকা হয়েছে, এভাবে দেয়ালের দিকে মুখ করে মাটিতে বসিয়ে রাখা হয়েছে। এ অবস্থায় গোটা দিন--রাত আমরা বসে কাটাতাম। এরফলে আমাদের স্নায়ু যন্ত্র সম্পূর্ণ বিকল হয়ে পড়তো। এই অসহায় জড়পড় অবস্থায় আমাদেরকে উপস্থিত করা হতো তদন্তকারীর সম্মুখে।

কঠোরতা নিষ্ঠুরতা আর মানুষের জীবন নিয়ে খেলা করার ব্যাপারে সিভিল ইন্টেলিজেন্স থেকে মিলিটারী ইন্টেলিজেন্স ছিলো কয়েক কদম অগ্রসর। তদন্ত কার্যক্রমের ফল স্বরূপ মিলিটারী ইন্টেলিজেন্সের লোকেরা যাদেরকে মৃত্যুর মুখে ঠেলে দিয়েছে, তাদের সংখ্যা সিভিল ইন্টেলিজেন্সের তুলনায় দ্বিগুণ। সামরিক তদন্তকারীদের নিয়ম ছিলো, প্রথমে কেবল ভয় ভীতি দ্বারা কথা আদায় করার চেষ্টা করতো। এমন নির্মম

www.pathagar.com

ভাবে চাবুক মারা হতো যে, অধিকন্তু অভিযুক্ত ব্যক্তি প্রাণ হারাতো। এছাড়া তাদের তদন্তের আরও একটা নিয়ম ছিলো লোহার শলা দিয়ে অভিযুক্ত ব্যক্তিকে দাগানো। এই শলা ছিলো যেন কাবাব ভাজি করার শলা। তা আগুনে পুড়িয়ে লাল করা হতো, অতঃপর অভিযুক্তদের দেহে ঠান্ডা করা হতো। বৈদ্যুতিক শক দ্বারাও শাস্তি দেয়া হতো। তদন্তকারী অফিসারের সামনে টেবিলে রাখা হতো বিদ্যুতের খোলা তার। অফিসার অভিযুক্ত ব্যক্তিকে নির্দেশ দিতো কাছে এসে তার স্পর্শ করার জন্য। ভয়ে সে তা স্পর্শ না করলে মানুষরূপী কুকুর আর প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত কুকুর দিয়ে তাকেতা স্পর্শ করতে বাধ্যকরা হতো। শাস্তি দানের জন্য কুকুর ব্যবহার করা হতো দেদার। দেহ কুকুরে কেটে কেটে খায়নি এমন ভাগ্যবান ব্যক্তি বিরল। অভিযুক্ত ব্যক্তিকে উলঙ্গ করে ডোবায় নামিয়ে দেয়া হতো। সেখানে তাকে বাধ্য করা হতো ময়লা পানি পান করতে। এ উলঙ্গ আবস্থায়ই তাকে তাকে ঠেলে দেয়া হতো কুকুরের মুখে।

পিটুনীর জন্য অভিযুক্ত ব্যক্তিকে উলেটা ঝুলানো হতো। মানে মাথা নিচের দিকে, পা উপরের দিকে। এরপর তার দিকে ছুটে আসতো চারজন মানুষরূপী শয়তানের গ্রুপ। এরা চাবুক মেরে মেরে তাকে নিষ্প্রাণ করে ছাড়তো। চারজন বড় ইবলিসের কতৃত্বে এ কার্যক্রম চলতো। এক জন হচ্ছে মিলিটারী ইন্টেলিজেন্সের ডাইরেক্টর জেনারেল সাআদ জগলুল অপরজন হচ্ছে হামজা বিসিউফী মিশরের প্রধান জল্লাদ সামরিক কারাগার সমুহের ইন্সপেক্টর জেনারেল। আর তৃতীয় শয়তান হচ্ছে ফিল্ড মার্শাল আব্দুল হাকিম আমের এর অফিস সেক্রেটারী।

আমি তদন্ত কার্যক্রমের অপেক্ষায় যেখানে বসেছিলাম সেখানে অনেককে এ জটিল সমস্যার সম্মুখীন হতে দেখেছি, আর অনেকের বক্তব্য শুনেছি। আমার অপরিচিত একজন অভিযুক্তকে তদন্তের জন্য আনা হয়। সামরিক অফিসার তাকে জিজ্ঞেস করে, কিজন্য তোমাকে গ্রেফতার করা হয়েছে? সে জবাব দেয়ঃ কিজন্য গ্রেফতার করা হয়েছে, তা আমি জানিনা। এ জবাব শুনে তাকে উল্টো লটিয়ে নিষ্ঠুরভাবে চাবুক পেটা করা হয়। অতঃপর আবার একই সামরিক অফিসারের সম্মুখে উপস্থিত করে একই প্রশ্ন করা হয়। কিন্তু তার একই জবাব—আমার জানা নেই। এ যালে-

www.pathagar.com

মরা সন্ধ্যা পর্যন্ত তার খাল খুলে ফেলে। গ্রেফতারীর কারণ, বলতে না পারলেই তাকে উল্টো টাঙ্গিয়ে চাবুক পেটা করা হতো। বিকেল পর্যন্ত তার মৃত্যুর উপক্রম হয়। অবশেষে সামরিক অফিসার নিজে তাকে বলেঃ তোমাকে গ্রেফতার করা হয়েছে এ জন্য যে, তুমি ইখওয়ানুল মোসলেমুনের সদস্য। মোটকথা, মিলিটারী ইন্টেলিজেন্সের তদন্তের খবরে পড়ে শুরুতেই এ কথা স্বীকার করতে হতো যে সে ইখওয়ানুল মুসলেমুনের গোপন সংগঠনের সদস্য। এ স্বীকারোক্তির বদৌলতে অন্ততঃ উদ্বোধনী আযাব থেকে রক্ষা পেতো।

বিস্ময়কর দৃশ্য

সেখানে বসে আমি তদন্তের জন্য অপেক্ষা করছিলাম, সেখান থেকে আমি এক বিস্ময়কর দৃশ্য অবলোকন করি। আমি দেখি, একটা মূল্যবান টেক্সী কারাগারের আঙ্গিনায় প্রবেশ করে। গাড়ীতে উড়ছে সামরিক পতাকা। গাড়ীটি দেখেই টাওয়ার থেকে সেন্ত্রী সালামীর নহবত বাজায়। গাড়ী থেকে নেমে আসে উচ্চ পর্যায়ের একজন সামরিক অফিসার। বিগ্রেডিয়ার বা মেজর জেনারেল হতে পারে। কারাগারের চীফওয়ার্ডের ছফওয়াত রুবী এ সামরিক অফিসারের কাছে আসে। তার মুখে বসিয়ে দেয় এক চপোটাঘাত। অফিসারটি শিশুরমতো কেদে ফেলে। অতঃপর তার স্কন্ধথেকে সামরিক বেজগুলো খুলে ফেলা হয়। উল্টো লটকিয়ে তারপার পেটাতে শুরু করে। এরপর তার চেহারা আর কখনো দেখিনি। খুব সম্ভব তাকে ফেরৎ পাঠানো হয়, তাকে যেখান থেকে এসেছিলো, সেখানে। এদৃশ্য দেখে আমার বিস্ময়ের সীমা ছিলনা?

যয়নব গাজালীর চিৎকার

আমি সেখানে হাজন যয়নব গাজালীকেও দেখিছি। শুনেছি তার মর্মবিদারক চিৎকার। জল্লাদরা এ মহান মহিলাকেও ক্ষমা করেনি। তাঁকে উল্টো ঝুলিয়ে তাঁর পায়ে মারা হয় চামড়ার চাবুক। মহিলাটি দুঃখ যন্ত্রনা সহ্য করিতে না পেরে এমন চিৎকার করতেন যে, তা শুনে শ্রোতার প্রাণ ফেটে যেতো। এসব চিৎকারের মধ্যেও তিনি কালেমায়ে তাইয়্যেবা পাঠ করতেন। মাঝে মাঝে জ্ঞান হারিয়ে ফেলতেন। সম্বিত ফিরে

www.pathagar.com

এলে বলতেন ঃ ষয়নব। তুমি হবরত সমাইয়্যা রাযিয়ল্লোহু আনহার চেয়ে শ্রেষ্ঠ নও।

পুরুষের উপর নারী সওয়ার

এ পালা তদন্তকালে আর একটা বিস্ময়কর দৃশ্য দেখতে পেয়েছে। আমার বন্দী জীবনে এটাই ছিলো আমার কাছে সবচেয়ে বেশী অসাধারণ দৃশ্য এ দৃশ্য দেখে আমার মুখ থেকে অলক্ষ্যে উচ্চারিত হয়ঃ আমার মাতা যদি আমাকে জন্ম না দিতেন। মনে পাথর বেধে এ দৃশ্যের সারসংক্ষেপ পাঠকের সামনে উপস্থাপনের দুঃসাহসিক চেষ্টা চালানো।

কারাগারের আঙ্গিনায় হঠাৎ হৈ চৈ শুরু হয়। ভেতরে প্রবেশ করে পুলিশের গাড়ী। নতুন গ্রেফতারকৃত অভিযুক্তে ঠাঁসা। তাদেরকে গাড়ী থেকে নিচে নামানো হলে দেখা যায়, কেবল পুরুষই নয় নারীও রয়েছে অনেক। পুরুষগুলো সবই কৃষক শ্রেণীর—ফাল্লাহীম। তাদেরকে দাঁড় করানো হয় চতুষ্পদী জন্তুর মতো দু'পায়ে এবং দু'হাতে ভর করে। আর নারীদেরকে নির্দেশ দেয়া হয় পুরুশদের পৃষ্ঠে সওয়ার হতে। নারীরা পুরুষদের পিঠে সওয়ার হলে পুরুষদেকে দৌড়তে নির্দেশ দেয়া হয়। এসময় উভয়ের উপর চলে বৃষ্টির মতো কোড়া বর্ষন। পুরুষরা নারী-দেরকে পৃষ্ঠে ধারন করে পাগলপ্রায় হয়ে ছুটাছুটি করে এদিক ওদিক। চিৎকার করে, জানোয়ারের মতো শব্দ করে। সৃষ্টি হয় কেয়ামত সাদৃশ হৈ চৈ। এ ঘটনায় গোটা কারাগার কেপে উঠে পাঁচশ পুরুষের পিঠে পাঁচশ নারী। মানবতার সব মিছিল যেন, দৃশ্যটা এমনই উত্তেজক এবং মর্মবিদারী যে বনী অদম এটা ধারণাও করতে পারেনা এমন এমন কাহিনী শুনে সহজে বিলাপ করতে। কিন্তু এপাপী স্বচক্ষে অবলোকন করেছে এ দৃশ্য। এ হাজার নারী পুরুষ মিশরের একটা পোড়া জন পদের অধিবাসী। কৃষক সম্প্রদায়ের লোক পোড়াজনপদ কারদাসতা। এ কারদা-সতা জনপদেরও একটা কাহিনী আছে। এবার শুনুন সে কাহিনী।

কারদাস্‌তা জনপদের কাহিনী

কারদাসতা জনপদ আল-জীজা জেলায় অবস্থিত। সামরিক শাসক যখন ইখওয়ানের বিরুদ্ধে তদন্ত শুরু করে, তখন তদন্তের প্রথম পর্যায়েই এখান

www.pathagar.com

কার জনৈক ইখওয়ান কর্মীকে গ্রেফতার করার নির্দেশ জারী করা হয়। অদৃষ্টের নির্মম পরিহাস, সে ইখওয়ান কর্মীকে গ্রেফতারের নির্দেশ জারী করা হয়, এক বৎসর আগে তার বিয়ে হয়েছে এমন পাত্রীর সাথে, যার দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ হয় মিলিটারী ইন্টেলিজেন্সের জনৈক কর্মকর্তার। তিনি নিজেই এ পাত্রীকে বিয়ে করতে আগ্রহী ছিলেন। কিন্তু পাত্রীটি মিলিটারী ইন্টেলিজেন্স কর্মকর্তার কাছে বিয়ে বসতে অস্বীকার করে। কারদাসতার ইখওয়ান কর্মীকে সে অগ্রাধিকার দেয়। তখন থেকেই এ প্রতিদ্বন্দ্বীর বিরুদ্ধে তার মনে বিদ্বেষ সৃষ্টি হয়। তাকে গ্রেফতার করার পরওয়ানা জারী হলে সে এটাকে এক মোক্ষম সুযোগ বলে মনে করে। তাকে গ্রেফতার করার অভিযানে কারদাসতা যাওয়ার অনুমতি গ্রহণ করে ঊর্ধতন কর্মকর্তাদের কাছ থেকে।

দু'জন সেপাইকে সঙ্গে নিয়ে সামরিক অফিসার সে জনপদে গমন করে। অভিযুক্ত ব্যক্তির গৃহে উপস্থিত হয়ে দরজার কড়া নাড়ে। সে তখন ঘরে ছিলনা। সামরিক অফিসার সেপাইদেরকে নির্দেশ দেয় তার স্ত্রীকে নিয়ে আসার জন্য। তার স্বামী হাযির না হওয়া পর্যন্ত স্ত্রীকে আটক রাখা হবে। এ সংবাদ জানতে পেরে গোটা জনপদে লোকজন উত্তেজিত হয়ে উঠে। তারা সামরিক অফিসারের এহেন পদক্ষেপের তীব্র বিরোধিতা করে। মানুষের প্রচন্ড ভিড় হয়। পরিবেশ হয়ে উঠে উত্তপ্ত। সামরিক অফিসার তার নির্দেশে অটল। তিনি মহিলাকে গ্রেফতার করে নেবেন যে করেই হোক। মানুষের ভিড় দেখে উত্তেজিত জনতার প্রতি গুলি বর্ষণের নির্দেশ দেয়। ফলে নিহত হয় একজন কৃষক। এতে জনতা আরও ক্ষিপ্ত হয়ে উঠে। তারা সামরিক অফিসারকে উচিৎ শিক্ষা দেয়। সেপাইদ্বয় পালিয়ে যায়।

ঘটনার সংবাদ পৌছে ঊর্ধতন কর্মকর্তাদের কাছে। মেজর জেনারেল মুহম্মদ ফাওজীর নেতৃত্বে এক ব্যাটালিয়ান সৈন্য তৎক্ষনাৎ কারদাসতা জনপদে পৌছে। তারা গোটা পাড়া গ্রেফতার করে ফেলে। দেখতে না দেখতেই কারদাসতার দিনকে পরিণত করা হয় রাতে। পাঠক চিন্তা করে দেখুন। ১৬ হাজার সৈন্য একটা গ্রাম ঘেরাও করে নিলে সে গ্রামের

www.pathagar.com

কি দশা হতে পারে। দীর্ঘ তিন দিন পর্যন্ত সেনাবাহিনী সেখানে তুলকালাম কান্ড ঘটায়। সকলের মান-ইজ্জত লুটে নেয়। নারীদের সম্ভ্রম হানী করে। গরু-ছাগল জবাই করে খায়। কিছু লোককে হত্যা করে। গ্রামের মাধ্যমিক স্কুলে গ্রামবাসীদেরকে ধরে এনে চাবুক পেটা করে। সব শেষে চাবুক মারে মাদবরদেরকে। যাদের সম্পর্কে সন্দেহ ছিল যে, সামরিক অফিসারকে মারার সঙ্গে এরা কোন না কোন ভাবে জড়িত ছিলো, অবশেষে তাদেরকে জড়ো করে ধরে নিয়ে যায়। এদের সংখ্যা এক হাজার—পাঁচশ পুরুষ, সাতশ নারী।

মিশরে এ ধরণের একটা ঘটনা ঘটেছিলো ১৯০৬ সালে। তখন মিশর ছিলো ইংরেজদের শাসনাধীন। ইংরেজরা আর যাই হোক, অন্ততঃ ব্রিগে-ডিয়ার মুহাম্মদ ফাওজীর চেয়ে দয়ালু ছিলো—তার মতো এতটা নিষ্ঠু-রতার পরিচয় দেয়নি তারা সে দিন। সম্ভবা যে, ১৯৬৭ সালে আরব-ইসরাইল যুদ্ধেও ব্রিগেডিয়ার মুহাম্মদ ফাওজী নেতৃত্ব দেয়। গোটা মিশর জাতিকে সেদিন অবমানার সাগরে ডুবে মারে। সত্যবটে :

ইযা কানাল গোরাবো দালীলা কাওমিন
সাইয়াহদীহিম তারীকাল হালেফী না

—কাফ যদি হয় কোন জাতির নেতা, নিয়ে যাবে তাদেরকে ধ্বংসের পথে।

সামরিক কারাগার, আবুজে'বল কারাগার এবং তাররার কারাগারে কার-দাসতার অধিবাসীদের মুখে- আমি এ কাহিনী শুনেছি।

একবার আমার তদন্ত কালে জনৈক সামরিক অফিসার আমাকে পিটাতে পিটাতে হঠাৎ থেমে যায়। প্রায় এক ঘন্টা এঅবস্থায় কাটে। এ সময় সে আমাকে জিজ্ঞেস করে, তুমি কি মনে কর, আমার তদন্ত ধারা আমেরিকান? অন্যান্য, দফতরতো রাশিয়ান ষ্টাইল অনুযায়ী কাজ করে।

সামরিক কর্মকর্তারা বলতো, তাদের তদন্ত ধারা রাশিয়ান ষ্টাইলের। তাদের মতে মার্কিন ষ্টাইলের তদন্ত হচ্ছে অভিযুক্ত ব্যক্তিকে, একটানা না মেরে থেমে থেমে মারা, আসলে সামরিক কতৃপক্ষের পন্থা ছিলো সম্পূর্ণ ভিন্ন ধরনের। তাদের তদন্তের পন্থা এতটা কঠোর, নির্মম এবং মানবতা বিরোধী ছিলো যে, তাকে প্রাচ্যের বা প্রতিচ্যের—কোন নামেই

www.pathagar.com

অভিহিত করা যায় না। তদন্তের যে পর্যায় অন্যদেরকে অতিক্রম করতে হয়েছে, আমাকেও সম্মুখীন হতে হয়েছে সে পর্যায়ের। এ পর্যায়ের নির্মম নিষ্ঠুর নির্যাতন সম্পর্কে বিগত অধ্যায়ে কিছু আলোচনা করা হয়েছে। বারবার তার পুনরুক্তি অর্থহীন। তদন্তকালে কঠোর নির্যাতনের মুখে আমিও অন্যদের মতো সে সবকথা স্বীকার করি, যা করাতো দূরে থাকুক, ধারণাও করিনি আমি কোনদিন। কিন্তু পাঠক মহল নিশ্চিত থাকতে পারেন যে, শত যুলুম-নির্যাতনের মুখেও অনেক মৌলিক এবং গুরুত্বপূর্ণ বিষয় সামরিক কর্তৃপক্ষের কাছে গোপন রাখতে সক্ষম হয়েছি। তারা আমার কাছে থেকে সে সব কথা বের করতে পারেনি, পারেনি অন্য কোন ইখওয়ানীর কাছে থেকেও।

তদন্তের নামে শাস্তি আর নির্যাতনের প্রাণান্তকর সময় অতিক্রমনের পর আমরা কুঠরীতে ফিরে আসি। আমাদের ধারণা ছিলো, এবার বুঝি আমাদেরকে সরকারী উকিলের হাতে সোপর্দ করা হবে। শুরু করা হবে আমাদের বিরুদ্ধে মামলা। আমরা শুনেছিলাম পাবলিক প্রসিকিউটর অভিযুক্ত ব্যক্তিদেরকে পুলিশ এবং ইন্টেলিজেন্সের নির্যাতনের হাত থেকে রক্ষা করে। আমরা মনে করেছিলাম, এবার আমাদেরকে পাবলিক প্রসিকিউটরের কাছে নিয়ে যাওয়া হবে। আমরা তাকে যুলুম-সিতমের গোটা দাস্তান শোনাবো। আমরা এ খোশখেয়ালেও ডুবেছিলাম যে, পাবলিক প্রসিকিউটর আমাদের প্রতি সহায়নুভূতি দেখাবেন, আমাদের দুঃখ হালকা করবেন এবং আমাদের প্রতি কৃত যুলুমের হিসেব নেবেন। এহেন খোশ খেয়ালের মধ্যেই আমাদের রাত-দিন অতিবাহিত হয়।

আমার পাশের কুঠরীতে বন্দী ছিলেন শারকিয়ার জনৈক অভিযুক্ত ব্যক্তি আমরা তাকে ডাকতাম চাচা আহম্মদ কুত্তাওয়ালা বলে। জিন্দান খানায় তাকে এ উপাধী দেয়া হয়। কারণ তার দেহে এমন কোন নরম অংশ ছিলনা, যা কুকুর কেটে খায়নি। একদিন আমি চাচা আহমদকে দেখি, তার পরনে রক্তে রঞ্জিত পোশাক। আপদমস্তক রক্তেরাঙ্গা। আমি পাহারাদারদের চোখ এড়িয়ে তার কানে কানে বলি ঃ

ঃ চাচা আহমদ ! কি বিপদ হয়েছে আপনার? আমারতো মনে হয়, অনেক আগেই আপনি তদন্তের পর্যায় থেকে নাজাত পেয়েছেন।

www.pathagar.com

ঃ হাঁ, তদন্তের পর্যায় থেকে নাজাত পেয়েছি বটে। কিন্তু গতকাল আমাকে হাযির করা হয় পাবলিক প্রসিকিউটরের সামনে।

ঃ বুঝতে পারলাম কিছু?

ঃ নির্যাতনের মুখে আমার কাছ থেকে যেসব বিবৃতি এবং স্বীকারোক্তি আদায় করা হয়েছে, আমি সেখানে সে সবই অস্বীকার করি। কারণ, আমার ধারণা ছিলো, তিনি আমাকে সাহায্য করবেন।

ঃ তারপর কি হলো?

ঃ প্রসিকিউটর মিলিটারী ইন্টেলিজেন্সকে খবর দিয়ে একদল জল্লাদ তলব করেন। তারা সারা দিন আমাদেরকে চাবুক পেটা করে।

ঃ পাবলিক প্রসিকিউটরও এ কাজ করতে পারে?

ঃ অবশ্যই পারে। এতে অবাক হওয়ার কি আছে!

ঃ তাঁর দফতর কোথায়?

ঃ কেন, আপনি কি তার দফতর চেনেন না?

ঃ না, চিনিনা।

ঃ তদন্ত শেষে ফেরার পথে হাসপাতাল এবং বাবুর্চিখানার মধ্যস্থলে সাদা তাঁবু টাঙ্গানো দেখেননি?

ঃ হাঁ, সাদা তাঁবুতো, দেখেছি।

ঃ সেখানে প্রাতাট তাঁবুতে একজন প্রসিকিউটর বসেন।

ঃ কে বলেছে?

ঃ আমি বলছি। আপনি সেখানে গিয়ে দেখতে পারেন।

ঃ আমতো তা মানতে পারিনা। সামরিক কারাগারের ভেতরে পাবলিক প্রসিকিউটরের দফতর?

ঃ আপনি কি করে অস্বীকার করছেন? আপনি কি মিশরে বাস করবেননা এখানে আইন নিয়ম আর শাসনতন্ত্র বলতে কোন কিছুর অস্তিত্ব নেই। নেই আইন সঙ্গত এবং মানবতা সম্মত কোন কিছু। হাঁ স্বাধীনভাবে নৃত্য করছে যুলুম নির্যাতনের দেবতা।

ঃ চাচা আহমদঃ আমাদের জন্য আপনার কি পরামর্শ?

ঃ কোন ব্যাপারে?

ঃ আমাদেরকে যখন প্রসিকিউটরের সম্মুখে হাযির করা হবে।

ঃ সকল মিথ্যা বিবৃতি স্বীকার করে নেবেন। অন্যথায়.....।

www.pathagar.com

ঃ অন্যথায় কি হবে ?

চাচা আহমদ হেসে দিলেন। বললেন--

ঃ কি হবে, তা আপনিও জানেন। আমিও জানি।

চাচা আহমদের কথাগুলো আমার মাথায় বজ্রাঘাত করে। তদন্তকারী কর্তৃপক্ষ আমাদের সম্পর্কে কিছু কিছু কার্যক্রম শুরু করে দিয়েছে। যেমন, তারা আমাদেরকে নানা দলে ভাগ করে নিয়ে যায়, আমাদের নানা ধরনের ছবি তোলে, আমাদের ষ্টেরীশিট, পুরন করে, আমাদের নাম ঠিকানা, ভাইদের নাম ঠিকানা, নিকটবর্তী এবং দূরবর্তী আত্মীয়দের নাম ঠিকানা লিখে নেয়। যাদেরকে এখনও প্রসিকিউটরের সামনে হাযির করা হয়নি তারা ভীষন উদ্বেগ ও উৎকণ্ঠার মধ্যে কালাতিপাত করছিলো। উপরে উল্লেখ করেছি যে, সামরিক অফিসাররা আমাদেরকে পৃথক পৃথকভাবে নিয়ে যেতো, ছবি তুলতো। এ সম্পর্কে একে অপরকে জিজ্ঞেস করতো, ছবি তোলার সময়ও কি পিটুনী দেয়া হতো এ প্রশ্নের জবাবও ছিলো ইতি-বাচক। যাদের দেহে নির্যাতনের বড় ধরনের কোন চিহ্ন ছিলনা সামরিক কর্তৃপক্ষ তাদেরকে টেলিভিশনে হাযির করে তাদের বিবৃতি গ্রহন করতো সরকারের সুবিচার আর ন্যায়নীতির ঢাক ঢোল পেটাতো। এ ব্যাপারে একে অপরকে প্রশ্ন করতো যে, টেলিভিশনে বিবৃতি গ্রহন কালেও কি ধোলাই, করা হয় ? সাধারণত ঃ এ প্রশ্নেরও ইতিবাচক জবাব পাওয়া যেতো। সব ব্যাপার সম্পর্কে প্রশ্ন শুনে আমাদের এক রসিক বন্ধু বলে ঃ আপ-নারাতো দেখছি আজীব মানুষ। এখানে কথায় কথায় ধোলাই আর মেরা-মত চলে। এসব তো হচ্ছে এখানকার মুলনীতি। আপনারা যখন পায়খানায় যান, তখন কি পিটুনী হয়না, গোসল করার জন্য যখন ডাকা হয়, তখন কি পিটুনী হয়না ? যখন খাবার দেয়া হয়, তখন কি পিটুনী বন্ধ থাকে ?

যাই হোক, এক দিন আমাদের কুঠরীর দরজা খুলে যায়। আমাদের মনে হয়' আবার বুঝি কোন বিপদ নাযিল হচ্ছে। কারন কুঠরীর দরজা খোলা ছিলো বিপদ নাযিলের আলামত। সামনে দেখতে পাই একজন সেপাইকে, কারাগারের অভ্যন্তরে যাকে আর কখনো দেখিনি। নির্দেশ

www.pathagar.com

অনুযায়ী তাকে দেখেই আমরা দাঁড়াইয়া যাই। সে আমার সম্পর্কে অন্যদেরকে জিজ্ঞেস করে। অতঃপর আমাকে হাত ধরে নিয়ে যায়। আমি তার সাথে বেরিয়ে পড়ি। কারাগারের বাইরে চলে যাই। সামনে চোখে পড়ে হাসপাতাল এদের ভাষায় শেফাখানা। সাদা তাবুও দেখা যায়। এ সাদা তাবুতেই বসে প্রসিকিউটর এবং তাঁর সহকারীরা। নিষ্ঠুরতা আর বর্বরতায় প্রসিকিউটর এবং সিভিল ইন্টেলিজেন্স ও মিলিটারী ইন্টেলিজেন্সের মধ্যে কোন তফাৎ নেই। সেপাই আমাকে নিয়ে একটা তাবুর সামনে দাঁড়ায়। আমার বুঝতে বাকী রইলোনা যে, এবার আমার পালা এসেছে। হঠাৎ মনে মনে দোয়া কালাম পড়া শুরু করে দেই।

প্রসিকিউটরের দফতরে

সেপাই তাবুর দরজায় ঝুলানো পর্দা তুলে ভেতরে প্রবেশ করে। অফিসারকে স্যালুট দিয়ে আমার উপস্থিতি সম্পর্কে অবহিত করে। আমিও ভেতরে প্রবেশ করি। ছোট একটা টেবিল সামনে নিয়ে একজন লোক বসে আছে। তার একপাশে বসে আছে একজন যুবক। খুব সম্ভব ষ্টেনো। টেবিলের সামনে একখানা কাঠের চেয়ার। আমাকে চেয়ারে বসতে ইশারা করা হয়। কিন্তু আমি চেয়ারে না বসে মাটিতে বসে পড়ি। বন্দী জীবনে আমাদেরকে এ নির্দেশ দেয়া হয়েছে। বলা হয়েছে আমাদের অফিসারদের সামনে চেয়ারে বসবেনা, বসবে মাটিতে। কিন্তু প্রসিকিউটর চেয়ারে বসার ইঙ্গীত করে। আমি মাটি থেকে উঠে চেয়ারে বসি। চুপ চাপ ও হতাশ।

আমি টেবিলের দিকে তাকিয়ে দেখি, জবরদস্তি সে বিবৃতি আমার কাছ থেকে আদায় করা হয়েছে, তা টেবিলের উপর পড়ে আছে। আমি আমার লেখা দেখে বুঝতে পারলাম, আমার লেখা তো আমার কাছে আমার মতোই পরিচিত। টেবিলের উপর পড়ে আছে পলমল সিগারেটের প্যাকেট। গ্রেফতারীর আগে আমি এ সিগারেট পান করতাম। এখন তো সিগারেট দূরের কথা খাবারই জুটেনা। জীবনের অন্যান্য জিনিসের মতো সিগারেটও ভুলে গেছি। এখন প্যাকেট দেখে মনে পড়লো।

প্রসিকিউটর আমাকে জিজ্ঞেস করলেন ঃ

ঃ আপনি ধূম পান করা পছন্দ করবেন ?

www.pathagar.com

ঃ আমি ?

ঃ হাঁ আপনি।

ঃ আপত্তি নেই, যদি আপনি দয়া করেন।

তিনি আমার দিকে সিগারেট বাড়িয়ে দেন পরে নিজেই তা জালিয়ে দেন। আমার হঠাৎ হাসি পায়।

ঃ হাসছ কেন ?

ঃ যা কিছু দেখছি, তাতে হাসি পাচ্ছে।

ঃ কি দেখছ ?

ঃ আমি দেখছি, তদন্ত মার্কিনী ষ্টাইলে চলছে।

ঃ আপনার মতলব ?

আমি গোটা কাহিনী শুনাই। তিনি অবাক হয়ে কুঞ্চিত করে বলেন ঃ

ঃ আপনি কি বলতে চান, এখানে আযাব দেয়া হয় ?

আমাদের যখন এ কথা হচ্ছিলো তখন পাশের খীমা থেকে ভেসে আসে আর্তনাদ। এতে আমি উপহাসের হাসি হেসে দেই। প্রসিকিউটর নিজেও মৃদু হাসলেন। বললেন।

ঃ চা খেতে চান ?

ঃ এ কি কাহিনী ? আগে সিগারেট, পরে চা। বিপ্লব হয়েছে নাকি ?

ঃ যা আপনি একটু আগে বলেছেন। মার্কিন ষ্টাইলের তদন্ত।

তিনি সেপাইকে নির্দেশ দেন এক পেয়ালা চা আনার। সেপাই সেলুট দিয়ে বাইরে চলে যায়।

প্রসিকিউটর আমাকে বললেন ঃ

ঃ আপনি জানেন, আমি কে ?

ঃ ইতি পূর্বে আপনার সাথে পরিচয়ের সুযোগ হয়নি।

ঃ আমার নাম মুহাম্মদ হোসাইন লবীব। আমি ষ্টেট সিকিউরিটি কোর্টে পাবলিক প্রসিকিউটর।

ইতি মধ্যে উত্থিত হয় চাবুকের গর্জন আর চিৎকারের শব্দ। মনে হচ্ছিল আমি যেন খীমার বাইরে ছিটকে পড়ছি। অপর একজন বিজ্ঞ প্রসিকিউটর বাইরে আর একজন অভিযুক্তকে চাবুক পেটা করছিলেন মনে করছিলেন ভয়ে ত্রাসে আমার যবান বন্ধ হয়ে গেছে। আমি বোবা হয়ে

www.pathagar.com

গেছি। আমি উঠে দাঁড়াই। কিন্তু তিনি আমার পানে হাসি মাখা দৃষ্টিতে তাকিয়ে বসতে ইঙ্গীত করেন। বললেন, আপনি উঠে দাঁড়াচ্ছেন কেন? তাশরীফ রাখুন। আমি বসে পড়ি। তিনি অপর সাক্ষীর দিকে তাকিয়ে বললেন—কার্যক্রম শুরু হচ্ছে।—জনগণের নামে—অমুক দিনের কথা—এই শব্দগুলো দ্বারা তিনি তাঁর সচিবকে দিয়ে গতানুগতিক ভূমিকা লিখেন। অতঃপর আমার নাম, বয়স, পেশা ঠিকানা ইত্যাদি জিজ্ঞেস করেন। আমার বিগত বিবৃতির কপি নিয়ে তা আমার চোখের সামনে মেলে ধরে জিজ্ঞেস করেন—

ঃ এ পৃষ্ঠাগুলোর কথা আপনার মনে আছে?

ঃ জি-হাঁ।

ঃ এখানে কি লিখছিলেন, মনে আছেতো?

কিছু মনে আছে কিছু নেই।

ঃ মানে আপনি বলতে চাচ্ছেন, এ স্বীকারোক্তি আপনি লিখেছেন?

ঃ জি হাঁ, কিন্তু—

(আমার কথায় বাধা দেন। তাঁর চক্ষু থেকে গোশশার স্ফুলিঙ্গ বেরুচ্ছে)

ঃ কিন্তু মানে?

ঃ অর্থাৎ আমি বুঝতে চাচ্ছি যে, আপনার কান শুনছে আর চোখ দেখছে যে চাপ, সে চাপের মুখে আমার কাছ থেকে এ স্বীকারোক্তি নেয়া হয়েছে। আমি যখন জবাব দিচ্ছিলাম, তখন বাইরে চাবুকের গর্জন আর প্রহৃতদের আর্তচিৎকার শোনা যাচ্ছিলো।

বিদ্রূপ আর হুমকীর ভঙ্গিতে আমার দিকে তাকিয়ে তিনি বললেন—

ঃ আপনি তাহলে চাবুককে ভয় পাননা?

জবাব প্রসিকিউটর সাব দয়া করে আমাকে স্পষ্ট কথা বলতে দিন।

ঃ আমিওতো তাই চাই।

ঃ চাবুকের আঘাতকে ভয় পায়না, দুনিয়ায় এমন কেউ নেই। স্বয়ং আপনিও এর ব্যতিক্রম নন।

ঃ আমিও?

ঃ জি-হাঁ। চাবুকের ভয় না থাকলে আপনি আমার সাথে এ আচরণ অবলম্বন করতেননা।

www.pathagar.com

ঃ মানে ?

ঃ আপনি মিলিটারী ইন্টেলিজেন্সের হাতের ক্রীড়নক মাত্র। তাদের বে আইনী কার্যকলাপ আর অপরাধকে আপনি আইনের লেবাস পরাবার চেষ্টা করেছেন মাত্র।

সেপাই চা নিয়ে ভেতরে আগমন করে এবং আমার সামনে রাখে। সাবকে সালাম জানিয়ে বাইরে চলে যায়। আমি বুকে সাহস বেঁধে প্রসিকিউটরকে বলি—

ঃ আমার স্পষ্ট কুটক্তির পর আপনি হয়তো চা পানের অনুমতি দেবেন না আমাকে।

ঃ না, তা কেন হবে। আপনি নিশ্চিন্তে চা পান করতে পারেন।

আমার মনে হলো, আমার কথা অন্তরে আঘাত হেনেছে। কিন্তু তাকে চুপ থাকতে দেখে আমার মনের সাহস বেড়ে যায়। আমি বললাম—

ঃ আপনারা যে সব কার্যক্রম চালাচ্ছেন, তার কি প্রয়োজন ছিলো, প্রসিকিউটিং-এর অনেক সদস্য তদন্ত কাজে নিয়োজিত। রাত-দিন কাজ করার জন্য তাদেরকে অতিরিক্ত পরিশ্রমিক দিতে হচ্ছে। কাগজ-কালীর অপচয় হচ্ছে। এ সব কাঠ-খড় পোড়াবার আদৌ কোন প্রয়োজন ছিলোনা। মিলিটারী ইন্টেলিজেন্স বা সিভিল ইন্টেলিজেন্সের কোন অফিসার বন্দীদের স্বীকারোক্তির সামনে কোন দন্ড প্রস্তাব করবে আর তা ছদরে জমহুরিয়ার কাছে প্রেরণ করবে—কেবল এটুকু হয়তো যথেষ্ট ছিলোনা। বরং ছদরে জমহুরিয়ার কাছে পাঠাবারও প্রয়োজন নেই। এটাওতো হবে এক ধরনের আনুষ্ঠানিকতা। তিনি যে দন্ড প্রস্তাব করবেন, তা কার্যকর করা হোক। এমনিভাবে আপনারা সরকারী অর্থের অপচয় রোধ করতে পারেন আর পারেন আমাদেরকে ভিত্তিহীন ও মিথ্যা আশার চক্কর থেকে রক্ষা করতে।

ঃ আপনি কি আমার সাথে উপহাস করছেন ?

ঃ না, খোদার কসম করে বলছি, আমি উপহাস করছিনা। জাতীয় সম্পদ নষ্ট করা আর অযথা সময় ও শ্রম ব্যয় করার কি প্রয়োজন রয়েছে। এটা অন্য কোন কল্যাণকর কাজে ব্যয় করা যেতে পারে।

www.pathagar.com

ঃ আমরা এ সব করছি এজন্য, যাতে আপনারা বুঝতে পারেন যে, সরকার চান যে, সিদ্ধান্ত যাই হোক, আইনের ভিত্তিতে হোক। অন্যথায় তোমাদের সাথে··· ···করা আমার জন্য সহজ ছিলো। ··· ··· এবার বলো আমাকে।

ঃ বলুন, কি বলবো।

ঃ তোমাদের সংখ্যা কত?

ঃ আমার জানা নেই।

ঃ দু'হাজার, সাত হাজার, যাই হোক, তোমাদের সকলকে হত্যা করলে কি হবে?

ঃ ইতিহাস চিরকাল এহেন ঘটনা স্মরণ করবে।

তিনি উপহাসের হাসি হেসে—

ঃ ইতিহাসের কি গুরুত্ব আছে?

ঃ এহেন আচরণের পর আল্লাহ আপনাদেরকে কিছুতেই ক্ষমা করবেন না।

ঃ তোমাদের জানা উচিৎ যে, আমরা তোমাদেরকে নিঃশ্বেস করে ফেলতে পারি কিন্তু তা করবোনা কখনো। আমাদের এখানে আইনের কর্তৃত্ব আছে। পাবলিক প্রসিকিউটিং-এর ব্যবস্থা আছে আর সুবিচারের জন্য রয়েছে দায়িত্বশীল আদালত।

আমি প্রসিকিউটরের কথা শুনে হেসে ফেলি। এটা স্বীকার করতে আমার কোন দ্বিধা নেই যে, আমার সাথে তাঁর আচরণ ছিলো অত্যন্ত সহনশীলের আচরণ।

ঃ আপনি হাসছেন কেন?

ঃ আপনি নিরপেক্ষ আদালতের কথা বলেছেন। আপনারা কবে আমাদেরকে সে নিরপেক্ষ আদালতে পেশ করবেন। দয়া করে আপনি স্পষ্ট জানিয়ে দিন যে, আদালতে কি আমাদেরকে ধোলাই করা হবে?

ঃ আপনি আমার মধ্যে ধৈর্য উপলব্ধি করেননি?

ঃ জনাব! আমি আপনার ধৈর্য স্পষ্ট উপলব্ধি করছি। আমি কখন তা অস্বীকার করলাম? কিন্তু এ ধৈর্য কতক্ষণ বহাল থাকবে?

ঃ দেখুন, কতক্ষণ থাকে।

মোটকথা, দীর্ঘ কুড়ি ঘন্টা কাল ধরে আমার জিজ্ঞাসাবাদ চলে। সত্য কথা এই যে, জিজ্ঞাসাবাদ কালে তিনি আমার প্রতি আদৌ কোন হস্তক্ষেপ

www.pathagar.com

করেননি। কিন্তু আমি স্বীকারোক্তির ভিত্তি সম্পর্কে যে কটাক্ষ করেছি, তা তিনি শুনেও শুনেননি। তদন্ত রিপোর্টে আমার দেহের নানা স্থানের আঘাতের কথাও সন্নিবেশ করার চেষ্টা করলে তিনি বলেনঃ আপনি নিশ্চিত জেনে নিন এ ধরণের সন্নিবেশের আদৌ কোন মূল্য নেই। অতঃপর তিনি তাঁর সচিবের সামনে আমার কানে কানে বলেনঃ এহেন সন্নিবেশের ফলে তোমার উপর আরও বিপদ নেমে আসবে। এতে তোমার আদৌ কোন ফায়েদা হবেনা। এতে আমি বুঝতে পারলাম যে, প্রসিকিউটরের অবস্থাও আমার মতো। মিশরের অধিবাসী হিসেবে তার আইনগত মর্যাদায় এবং আমার মর্যাদায় কোন পার্থক্য নেই। কিন্তু প্রশ্ন দাঁড়ায় তাহলে এসব অপকর্মের জন্য দায়ী কে? মিশরের অভ্যন্তরের অপরাধমূলক। নির্যাতনমূলক কাঠী কে নাড়ছে? এক বিরাট মেশিনারী যুলুম-অবিচার আর বিপর্যয়-বিকৃতির বিকাশ সাধনে নিয়োজিত রয়েছে। এর চাবি একটাই। এ চাবী একজন মাত্র ব্যক্তির কব্জায় রয়েছে, যাকে সকলেই জানে। সকলেই তার ইজ্জত-সম্মানে নিয়োজিত। কেউ তার বিরুদ্ধে মুখে একটা শব্দও উচ্চারণ করতে পারেনা।

প্রসিকিউটর যা কিছু করেছেন, তা মানুষ হিসেবে তার বিবেক আর সরকারী উকিল হিসেবে তার পেশার পরিপন্থি ছিলো। তিনি যা কিছু করেছেন, আমার ধারনায় তাতেও তিনি সন্তুষ্ট ছিলেননা। তাঁর এ অসন্তুষ্টি পরে আমি বুঝতে পেরেছি কয়েক বৎসর অতিক্রান্ত হওয়ার পর, যখন যুলুম অবিচার অনিষ্টের স্রোতাদের দন্ড যা নিশ্চিহ্ন হয়েছে। বরং জীবনের মঞ্চ থেকে তারা হয়েছে অপসারিত, সোপর্দ করা হয়েছে এক ভয়ংকর সংকীর্ণ স্থান অর্থাত কবরে।

বিকেলে আমাকে কুঠরীতে ফেরৎ পাঠানো হয়। প্রসিকিউটিং আইন এবং অমুক অমুকের উপর প্রাণ ভরে অভিশম্পাতকারী বরং এ দেশের অভ্যন্তরে সব কিছুইতো অভিশম্পাতযোগ্য হয়ে পড়েছে। ১৯৬৩ সালে সামরিক কারাগারে যে নাটক মঞ্চস্থ হয়েছে, মূলতঃ তা ছিলো ১৯৬৭ সালে ইসরাইলের মোকাবিলায় সংঘটিত শোচনীয় পরাজয়ের সূচনা পর্ব। তখন বার বার মুখে উচ্চারিত হয় আরবী এ প্রবাদ—

—আমার সামনে সে বাঘ, কিন্তু যুদ্ধে প্রমাণিত হয় উটপাখী বলে!

www.pathagar.com

একাদশ দৃশ্য

তদন্তের পালা শেষে

তদন্ত কার্যক্রম শেষ। এটাকে আমরা এক দিকে এলাহী হিসেবে মেনে নেই। এটাকে গ্রহণ করা ছাড়া আমাদের কোন উপায় ছিলনা, করার ছিলনা কিছু। মহান আল্লাহ আমাদের কিস্‌মতে যা কিছু লিখে রেখে-ছেন, তাতে আমাদেরকে সন্তুষ্ট হতেই হবে। এ পর্যায় অতিক্রম শেষে আমা-দের প্রত্যেকে ফিরে আসে নিজ নিজ কুঠরীতে। সেখানে আমরা সরকারী উকীলের প্রতীক্ষায় কাটাই, আমাদেরকে আদালতে পেশ করার জন্য। অবশ্য আমরা জানতামনা যে, এ আদালত কেমন হবে, কোথায় বসবে।

১৯৫৪ সালে উইংকম্যান্ডার জামাল সালেমের নেতৃত্বে যে দন্ড-আদালত প্রতিষ্ঠা করা হয়েছিলো, তার স্মৃতি এখনো আমাদের মন থেকে মুছে যায়নি। সে স্মৃতির কথা মনে পড়লে এখনো আমাদের চোখের ঘুম উড়ে যায়। জামাল সালেম সেদিন অভিযুক্তদের কাছে দাবী করেছিলেন সূরা ফাতেহা উল্টা দিক থেকে পড়ে শুনাতে। অবশ্য এই ভেবে আমরা মনে শান্তনা পাই যে, শাসক গোষ্ঠী এখন আর জামাল সালেমের মতো নিষ্ঠুর লোক পাবে কোথায়। জামাল সালেমের গণ-আদালতের জন্য তখন আমাদেরকে সূরা ফাতেহা উল্টা পড়ার অনুশীলন করতে হয়েছিলো। সবয়েচে গুরুত্বপূর্ণ যে দিকটি আমাদের মনে ছেয়ে থাকে, তা হচ্ছে এই যে, আমাদের আইনগত পজিশন কি? আমাদের বিরুদ্ধে কি এ মর্মে মামলা দায়ের করা হবে যে, ছদরে জমহুরিয়া—প্রজাতন্ত্রের প্রেসিডেন্টের ব্যক্তিগত সমালোচনা করেছি, না দেশের অভ্যন্তরের সরকারকে গদীচ্যুত করার অভিযোগে আমাদেরকে গ্রেফতার করা হয়েছে। আমরা ঘন্টার পর ঘন্টা ভাবি আর ভাবি। ছদরে জমহুরিয়া বা সরকারের কোন সদস্যের ব্যক্তিগত সমালোচনা করেছি—এমন কোন ঘটনা বা প্রমাণ তো আমাদের জানা নেই। তবে কিসের ভিত্তিতে মামলা দায়ের করা হবে আমাদের বিরুদ্ধে?

একদিন রাত এভাবে একথা-সেকথা বলতে বলতে আমরা ঘুমিয়ে পড়ি। নিঝুম রাতে গভীর ঘুমে আমরা নিমগ্ন। ইতি মধ্যে হঠাৎ কুঠরীর দরজা

www.pathagar.com

খোলা হয়। আমরা হত চকিত হয়ে উঠে দাঁড়াই। এমনটি ঘটতো সব সময়। দরজা খোলা হলেই আমরা বিচলিত হয়ে পড়তাম। কিন্তু এবার রাতের শেষ প্রহরে দরজা খোলায় আমরা আরও বেশী বিচলিত হয়ে পড়ি। দরজা খোলায় বাইরের ক্ষীণ আলো ভেতরে প্রবেশ করে। আবছা আবছা আলোয় আমরা দেখতে পাই, হৃষ্টপুষ্ট একজন সেপাই ভেতরে প্রবেশ করছে। ভেতরে পা রেখেই সে আমার নাম ধরে ডাকে। তার শব্দ শুনেই কুঠরীর সকলের মনে ছেয়ে যায় চরম অস্থীরতা। রাতের শেষ প্রহরে আমাকে তদন্তের জন্য তলব করার অর্থ আমার বুঝি আর ফিরে আসা হচ্ছেনা। কুঠরীর সকলে দ্রুত ছুটে এসে তাদের কাপড় খুলে আমাকে পরাবার জন্য ব্যস্ত হয়ে পড়ে। কারণ, শীতের মওসুম। বাইরে প্রচন্ড ঠান্ডা। আমি শুকরীয়া জানিয়ে তাদের কাপড় ফেরত দেই। অসম্ভব ঠান্ডা থেকে বাঁচার জন্য তাদের সকলেরওতো কাপড় দরকার। আমার নিজের সম্পর্কে ভাবি, লাশের জন্য ঠান্ডা আর গরমতো এক সমান!

পাহারাদারের সাথে আমি বড় জেলের আঙ্গিনায় পৌছি। তখন কুকুর ঘেউ ঘেউ করছিলো পথে তাদের পক্ষ থেকে গালিগালাজ, কিল ঘুষি লাথি আর বিদ্রূপ উপহাসে কোন ত্রুটি হয়নি—একথা উল্লেখ করার কোন প্রয়োজন নেই। আমি ভাবছিলাম, তদন্তের পালা শেষ। এখন সরকারী উকীলের পক্ষ থেকে আপিল পেশ করার পালা। এখন কি পুনরায় তদন্তের দ্বার খুলে দেয়া হয়েছে। এ আবার কোন নূতন বিপদ দেখা দিয়েছে।

আমাকে তদন্ত দফতরে নিয়ে যাওয়া হয়। মানুষের উপর চাবুকের বর্ষণ চলছে ভেসে আসছে তাদের বেসুরো আর্ত চিৎকার এটা জানতে পেরে আমার দেহে শিহরণ জেগে উঠে। কুকুর তাদের দেহকে কেটে খাচ্ছিলো। এখন আমি বুঝতে পারি, সামরিক কারাগারে তদন্ত বন্ধ থাকেনা ক্ষনেকের তরেও। কারণ সরকারকে গদীচ্যুত করার ষড়যন্ত্র চলছে প্রতিদিন। আর ষড়যন্ত্র কারীরা গ্রেফতার হয়ে আসছে। তাই এখানে প্রতিদিন চলে নির্যাতনের পালা। কুকুরদের জন্য সরবরাহ করা হয় নূতন গোস্ত। আর একটা ভিন্নতর দৃশ্য এখানে চোখে পড়ে। এখানে আনা হয় কিছু উচ্চ পদস্থ সামরিক অফিসারকে। উচিৎ শিক্ষা দিয়ে ফেরৎ

www.pathagar.com

পাঠানো হয় ব্যারাকে। কিন্তু মার্শাল আবদুল হাকীম আমাদের অফিস সেক্রেটারী শামস্ বদরান সামরিক কারাগারকে আস্তাবখানায় পরিণত করেছে। এখানেই জাতির সবশ্রেণীর লোককেই ধোলাই করা হয়।

এবার আমাকে বসানো হয় এক অন্ধকার স্থানে। পাশেই একটা কক্ষে চলে তদন্ত কার্য। আমার কাছেই এক স্থানে দাঁড়িয়ে শামস্ বদরান কথা বলছিলো মেজর মুহাম্মদ আবদুল ফাত্তাহর সাথে। কিন্তু মার্শাল আবদুল হাকীম আমেরের নাম ভাঙ্গিয়ে চুরি আর চোরাচালানীর অভিযোগে মেজর আবদুল ফাত্তাহকে গ্রেফতার করা হয়েছে। মেজর ফাত্তাহ আবদুল হাকীম আমাদের দফতরের কর্মচারী। বড় বড় চোর ডাকাত আর জল্লাদে ভরা ছিলো তার দফতর এটা কোন গোপন কথা নয়। এরা দুনিয়ায় মুখ কালো করে ছেড়েছে মিশরের। শামস বদরান আর মেজর আবদুল ফাত্তাহর কথোপকথন ছিলো এরকম:

শামস বদরান : আবদুল ফাত্তাহ!

আবদুল ফাত্তাহ : জনাব।

শামস বদরান : কাল তোমাকে মিলিটারী কাউন্সিলের সামনে হাযির করা হবে। সেখানে তোমার কোর্ট মার্শাল হবে।

আবদুল ফাত্তাহ : আবদু হুযুর।

শামস বদরান : তোমাকে ২৫ বছরের কারাদন্ডাদেশ দেয়া হবে।

আবদুল ফাত্তাহ : কিন্তু হুযুর……………

শামস বদরান : (কথা কেটে) ভয় পাবেনা। কিছুকাল কারাগারে কাটাতে হবে। পরে তোমাকে ছেড়ে দেয়া হবে।

আবদুল ফাত্তাহ : যা আপনার হুকুম, হুযুর।

শামস বদরান : সিগারেট টানবে?

আবদুল ফাত্তাহ : কি বলবো হুযুর।

শামস বদরান আবদুল ফাত্তাহকে সিগারেট বাড়িয়ে দেয়। আমি আঙ্গুল মুখে দিয়ে এ চিত্তাকর্ষক কথোপকথন শুনছিলাম। ইতিমধ্যে শামস বদরান আমার কাছে এসে আমার দিকে ইঙ্গিত করে কারাগারের একজন অফিসারকে আমার সম্পর্কে জিজ্ঞেস করে: এ কে অফিসার জবাব দেন

www.pathagar.com

আহমদ বারেক। শামস বদরান আমার আরো কাছে আসে। তার মুখে এক ঝলক হাসি। আমাকে বলে কি অবস্থা?

ঃ আলহামদুলিল্লাহ।

ঃ সুখে, আছ?

ঃ আলহামদুলিল্লাহ।

ঃ কোন কিছুর প্রয়োজন আছে?

ঃ আলহামদুলিল্লাহ।

আমার মুখে একই জবাব শুনে শামস বদরান পাশে দাঁড়ানো কারাগারের জনৈক অফিসারের দিকে তাকিয়ে তাকে নির্দেশ দেয়, পনর মিনিট পর তাকে আমার দফতরে নিয়ে আসবে। সে তখনই বলে ঃ আচ্ছা জনাব।

অপসৃত হয়ে যায় সকল মানুষের ছায়া। শামস বদরান আমাকে তলব করার পর শুরু হয় আমার মানস জগতে ভীষন তোলপাড়। শুরু করি আসমানের সাথে কানাকানি। আমি ডুবে যাই মহান আল্লাহর অসীম ক্ষমতার লীলা সাগরে। বিষয়টি আল্লাহর দরবারে দোয়া আর কান্নাকাটি ছাড়িয়ে যায়। মনে মনে ফরিয়াদ করি, এ অচেনা স্থানে আমার সাথে কি ঘটতে পারে, তা আল্লাহ আলেম গায়েব ভালো করেই জানেন। সব চেয়ে বড় যে অভিযোগ আমার বিরুদ্ধে উল্লেখিত হতে পারে তা হচ্ছে এই লা শরীক আল্লাহর ইচ্ছা অনুযায়ী আমি তার ইবাদত করার চেষ্টা করেছি। আমরা ইখওয়ান কর্মীরা চেষ্টা করেছি, দেশের বর্তমান অবস্থার পরিবর্তন সাধন করে তার জন্য উন্নততর ও উত্তম ভবিষ্যত নির্মান করার জন্য—এটাও আমাদের অপরাধ। বিশ্বের সর্বশ্রেষ্ঠ মহা মানব যে ধারায় হতাশা আর অধঃপতন দূরকরে উম্মাতে মুসলেমার সংস্কার সাধন করেছিলেন, আমরাও চেষ্টা করেছি সে ধারায় জাতিকে গড়ে তুলতে! সরকারকে খুশি করার জন্য খোদার সাথে কুফরী করাকি আমাদের উচিৎ হবে? শাসক গোষ্ঠী আমাদের যা খুশি আচরন করুক আমরা কোন অবস্থায়ই খোদার বন্দেগীর পথ ত্যাগ করে অন্য কোন পথ অবলম্বন করতে পারিনা। নূতন পরিস্থিতিতে আমি এহেন চিন্তার মধ্যে ডুবে যাই অবচেতন ভাবে। এ অবস্থায় কতক্ষণ ডুবে ছিলাম,

www.pathagar.com

জানিনা। যখন সম্বিত ফিরে আসে দেখি, একখানা লোহার হাত আমার সকন্ধে স্থাপিত। কানে শব্দ ভেসে আসে—চল, তোর মৃত্যু হাযির।

সামরিক কারাগারের দফতরে

শামস বদরান তার দফতরে আমাকে তলব করেছে, তা তো জানি। এখন দেখা যাক কি হয়। আমাদের সম্পর্কে তার কাছে কি নূতন কোন তথ্য এসেছে আর তার ভিত্তিতে কোন নূতন ফয়সলা হতে যাচ্ছে। যাই কিছু ঘটক, কয়েক মুহূর্ত পরই দেখতে পাবো। এসব চিন্তায় বিভোর হয়ে হাপাতে হাপাতে আমি শামস বদরানের কক্ষে প্রবেশ করি সে হাসিমুখে আমাকে বরন করে—আসুন, আসুন। তশরীফ রাখুন। আমি রীতি অনুযায়ী মাটিতে বসে পড়ি।

না না এভাবে বসবেননা। কুরসীর উপর তশরীফ রাখুন—এই বলে শামস বদরান তার প্রশস্ত সুসজ্জিত কক্ষের মূল্যবান টেবিলের সামনে রাখা কাঠের কুরসীটি আমার দিকে এগিয়ে দেয়, কিন্তু আমার ধারনা জন্মে, কুরসীতে বসা আমার বেআদবী বলে গৃহীত হবে। কিন্তু সে হাত দিয়ে কুরসীর প্রতি ইশারা করে বলে, কুরসীতে বসুন। এটা কোণ বেআদবী বা ঔধ্যত্য হবেনা আমিতো অবাক। শামস বদরানের সামনে কি কুরসীতে বসা যায়? দুনিয়ায় এ কি বিপ্লব ঘটেছে। যাই হোক, আমি কুরসীতে বসে পড়ি। আমার মন সব রকম চিন্তা ও শংকা মুক্ত হয়ে পড়ে।

শামস বদরানের আওয়াজ ভেসে আসে:

কি পান করতে মন চায়?

আমিতো রীতি মতো অবাক। কি তার মতলব। সে আমাকে চা খাওয়াতে চায়, না অন্য কিছু? তার এ প্রস্তাবের কোন ভাবই বেরুলনা আমার মুখ থেকে: আবার প্রস্তাব করে:

এক কাপ গরম চা আনবো?

হে আসমান যমীনের পরওয়ারদেগার! গরম চা'র প্রস্তাব?

আমার মনে সাহস হলো। বললাম:

পান করতে পারি। অসুবিধা কি।

www.pathagar.com

শামস বদরান একজন সামরিক অফিসারকে নির্দেশ দেয় তাড়াতাড়ি এক কাপ গরম চা নিয়ে আসার জন্য। অফিসারটি আদেশ পালনার্থে তৎক্ষোনাৎ ছুটে যায়।

শামস বদরান নূতন করে তীক্ষ্ন দৃষ্টিতে আমার প্রতি দৃষ্টি নিবদ্ধ করে আপনি আমাকে চেনেন?

ঃ মুহতারাম কর্নেল সাহেব' এখানে এমন কে আছে, যে আপনাকে চেনেনা। সে অট্ট হাসিতে ফেটে পড়ে। এ হাসিতে কক্ষে গুন্জরন ধরে দূর থেকে নির্যাতনের সেসব শব্দ ভেসে আসছিলো, তার হাসির মুখে তাও চাপা পড়ে যায়।

ঃ শুনুন। আমি আপনার সাথে নিবিষ্ট ভাবে কথা বলতে চাই। তদন্ত কার্যক্রমের এর কোন সম্পর্ক নেই। আপনি জানেন, তদন্ত কার্যক্রম সমাপ্ত হয়েছে।

ঃ বলুন।

ঃ আপনি কি আমার সাথে খোলা মনে নিঃসংকোচে কথা বলতে পারেন? আপনি এ মুহূর্তে ভুলে যান, আমার পদ মর্যাদা কি, আমি কোথায় বসে আছি।

ঃ ব্যাপারটাতো রীতিমতো অসম্ভব। কিন্তু আমি চেষ্টা করবো। ইতিমধ্যে সামরিক অফিসার চা নিয়ে আসে। শামস বদরান তাকে বলে, চায়ের পেয়ালা ওস্তাদ আইমদ রাসেকের সামনে রাখো চায়ের- পেয়লা। আমিতো রীতিমতো বিস্ময়ে বিমূঢ়। চা কাপড়ে পড়ার উপক্রম। আমি স্বাদে আনন্দে ডুবে চায়ের পেয়ালায় চুমুক দেই। শীতের মওসুম। আমাদের মতো পোড়া কপালদের ভাগ্যে জুটে কোথায় এমন চা! শামস বদরান আবার শুরু করে কথা বলা সে বলেঃ

ঃ বলতে পারেন, কিছু লোক গোপন পন্থা কেন অবলম্বন করে?

ঃ আপনি বলুন।

ঃ আমি আপনার কাছ থেকে শুনতে চাই।

ঃ আপনারা নাগরিকদের মুখ বন্ধ করে রেখেছেন, মানুষের উপর চাপিয়ে দিয়েছেন এক দলীয় কতৃত্ব। নিজেরাই বলে গেছেন এ দলের হর্তা-কর্তা

www.pathagar.com

বিধাতা। আপনারা বারবার ভুল করেছেন। মানুষ স্বভাবতঃই স্বাধীনচেতা স্বাধীনতাকে ভালোভাসে তারা দীর্ঘদিন মানুষকে দাবিয়ে রাখা অসম্ভব না হলেও দুষ্কর অবশাই।

ঃ একটু স্পষ্ঠ করে বলবেন!

ঃ আপনারা যদি গোপন সংগঠনের ধারা বন্ধ করতে চান তার একটাই পথ আছে। মানুষকে নিরাপত্তা নিশ্চয়তা দিন। তারা গোপনে যা করতে চায়, প্রকাশ্যে তা করার সুযোগ দিন।

ঃ আপনি কি বলতে চান?

ঃ আপনারা এটা চিন্তা করেননা যে, মিশরে এমন লোকেও রয়েছে, যারা আপশাসন মেনে নিতে রাজী নয়।

ঃ মানুষের বিরোধিতা একটা স্বাভাচিক ব্যাপার। কোন বিষয়ে সকলে একমত হতে পারেনা কখনো।

ঃ এটা স্বাভাবিক কাজটা আপনারা বন্ধ করতে চান কেন? এতে কি আপনারা সফল হবেন?

ঃ আমি আপনার কথা নির্দিষ্ট করে বুঝতে চাই।

ঃ আমি বলতে চাচ্ছি যে আপনারা যদি মানুষকে অনুমতি দেন, তারা যা চায়, প্রকাশ্যে করতে পারবে, আপনারা যদি তাদের নাগরিক অধিকারের নিশ্চয়তা দেন তবে গোপন সংস্থা স্থাপন করার প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করবেনা কেউ।

ঃ তাহলে কি আমরা রাজনৈতিক দল গঠনের অনুমতি দেবো?

ঃ গোপন তৎপরতা বন্ধ করার এটাই হচ্ছে এক মাত্র উপায়।

ঃ আপনি কি মনে করেন, যারা গোপন তৎপরতায় অভ্যস্ত হয়ে পড়েছে। তারা প্রকাশ্যে মানুষকে তাদের লক্ষ্যের- শিকারে পরিণত করবে?

ঃ আইনগত নিরাপত্তা লাভ করলে তারা লোকদেরকে নিজেদের লক্ষ্য উদ্দেশ্য সম্পর্কে অবহিত করবেনা কেন?

ঃ আপনি তো অনেক দূরের কথা জুড়ে দিয়েছেন। আপনি চাচ্ছেন আমরা রাজনৈতিক দল বহাল করি। আমাকে এটা বলুন যে আপনারা কেন গোপন তৎপরতার আশ্রয় নিয়েছেন?

www.pathagar.com

ঃ আপনি কাদের কথা বুঝাতে চাচ্ছেন ?

ঃ আমি বলছি ইখওয়ানুল মুসলেমানের কথা।

ঃ কিন্তু আমি তো ইখওয়ানের গোপন সংগঠনের সদস্য নই।

ঃ আপনি কি বলেননি যে, একথা স্বীকার করেছেন।

ঃ আপনি বলেননি যে, আমরা রাখি ঢাকি ছাড়াই বলবো।

ঃ হাঁ হাঁ।

ঃ তাহলে সত্যকথা এই যে, আমি ইখওয়ানের গোপন সংগঠনের সদস্য নই।

ঃ যাই হোক, তদন্ত কার্যক্রমের সাথে আমাদের এসব কথাবার্তার কোন সম্পর্ক নেই। আমরা শুধু এটাই চাই যে, এ পরিস্থিতির পরিবর্তন হোক।

ঃ কোন পরিস্থিতি ?

ঃ গোপন তৎপরতা।

ঃ শুনুন।

ঃ বলেন।

ঃ আমি অপনার সাথে খোলাখুলী কথা বলছি, আপনিও খোলাখুলী কথা বলছেন আমার সাথে। এটা কি অবাক কান্ড নয় ? আপনি আমার কাছে স্পষ্ট উক্তির দাবী করছেন। আপনি কি আর্ত চিৎকার শুনতে পাচ্ছেননা ? আপনার নির্দেশেই কি এসব কিছু হচ্ছেনা ?

ঃ যারা চিৎকার করছে, তারা ইখওয়ানের লোক নয়, সামরিক বাহিনীর লোক।

ঃ আমি তো বলছি নীতিগত ভাবে (মানে নির্যাতন চালিয়ে যাখুশী স্বীকার করিয়ে নিতে পারেন তাদের দ্বারা)।

ঃ এমন কার্যক্রম চালাতে আমি বাধ্য। আপনি নিজেকে আমার স্থানে রেখে চিন্তা করুন, মিশরের মতো দেশে রঅভ্যন্তরে শান্তি শৃংখলা বজায় রাখার জন্য আপনারও কি কর্তব্য হবে ? আমরা এটাও জানতে পেরেছি যে, সরকারকে গদীচ্যুত করার জন্য ইখওয়ান পরিকল্পনা গ্রহন করেছে। এসব খবরের মূল সত্যতা যাচাই করার জন্য অবশেষে আমার কি করা উচিৎ ? কঠোরতা আর নির্যাতন ছাড়া আমার জন্য কোন উপায় ছিলনা। এ উপায়েই আমি ষড়যন্ত্রের বিস্তারিত তথ্য অবগত হতে পারি।

www.pathagar.com

: এ বিষয়টিইতো আমাদেরকে নিয়ে যায় গোপন সংগঠন গড়েতোলার বিষয়ের দিকে।

: এ ব্যাপারেইতো আমি কথা বলতে চাই আপনার সাথে।

শামস বদরান এ বলে সজোরে অট্টহাসিতে ফেটে পড়ে।

: আমি আরজ করছিলাম যে, এটাই হচ্ছে আমার অভিমত।

: শামস বদরানের চক্ষু চমকে উঠে। সে আমাকে বলে :

: আমরা মানুষের ধর্মীয় আবেগ অনুভূতিও তৃপ্ত করবো আবার সরকারের বর্তমান কাঠামোও ঠিক রাখবো—এটা কি করে হতে পারে?

: আপনারা যদি সোশ্যালিষ্ট ইউনিয়নের অধীনে ধর্মীয় তৎপরতার একটা বিভাগ স্থাপন করতেন তাহলে সাধারণ মানুষের ধর্মীয় পিপাসা অনেকাংশে নিবৃত হতো।

: এমন বিভাগ সোশ্যালিষ্ট ইউনিয়নের সাথে কি করে চলতে পারে?

: যাই হোক, অনেকাংশে এটাই হচ্ছে সমস্যার সমাধান। ধর্ম বিষয়ক দফতর ইউনিয়ন থেকে পৃথক করা হলে তা এক নূতন দলের বুনিয়াদ হতে পারে। এরপর কি মানুষ ইখওয়ানুল মুসলেমুনকে ভুলে যাবে?

শামস বদরান তার কথা সমাপ্ত করতে পারেনি। সামনে রাখা কাগজপত্রে ডুবে যায় সে। সেখান থেকে অবসর হয়ে পুনরায় আমার দিকে লক্ষ্যকরে বলে:

: এসব কথাতো অর্থহীন। আমরা কখনো দল বহাল করবোনা, আপনার প্রস্তাব অনুযায়ী কোন বিভাগও স্থাপন করবোনা।

: আমি স্পষ্ট করে বলবো যে, তাহলে আপনারা গোপন তৎপরতা বন্ধ করতে পারবেননা কিছুতেই। যথারীতি গড়ে উঠবে গোপন সংগঠন। একের পর এক তা প্রতিরোধে কোন যুলুম নির্যাতনই সফল হবে না। কর্ণেল সাহেব আপনি আমার কথায় বিশ্বাস করুন। যুলুম নির্যাতন আর চাপ প্রয়োগ সফল হতে পারেনা কখনো।

: যুলুম নির্যাতন আর চাপ প্রয়োগ কার সাথে?

: মানুষের সাথে।

www.pathagar.com

এ আলোচনার পর রাত্রে আমি কুঠরীতে ফিরে যাই এবং বন্ধুদেরকে এ কাহিনী শুনাই। এতে আমি নিজেও অবাক হই। অবাক হয় আমার বন্ধুরাও।

তদন্ত পর্যায়ের দিনগুলো আমাদের জন্য অত্যন্ত কঠিন ঠেকায়। ইতি-পূর্বে আমরা কুঠরী থেকে মাত্র কয়েক মিনিটের জন্য বেরুতাম। তাও পায়খানায় যাওয়ার জন্য। অবশিষ্ট গোটা সময় আমরা কুঠরীতে বন্দী থাকতাম। আমাদের প্রত্যেকের সবচেয়ে বড় আকাংখ্যা ছিলো, ভোরে যদি কারাগারের আঙ্গিনায় যাওয়ার সুযোগ পাওয়া যেতো। প্রচন্ড শীতে কুঠরীর অভ্যন্তরে বন্দী দশায় আমাদের অস্থি-মজ্জা পর্যন্ত শীতল হয়ে যেতো। তাই রৌদ্র তাপে দেহ গরম করার আকাংখ্যা ছিলো আমাদের সকলেরই।

একদিন আমরা কারাগারের আঙ্গিনায় অস্বভাবিক গতিবিধি লক্ষ্য করি। পাহারাদারদের বিরাট টীম ভেতরে প্রবেশ করে। তারা কুঠরীর দরজা খুলে বন্দীদেরকে বের করে নিয়ে সারীবদ্ধভাবে দাঁড় করায়। একান্ড দেখে আমরা বিস্মিত হই। এ সময় একজন পাহারাদার আমাদের কুঠরীতে আসে। দরজা খুলেই সে আমাদেরকে নিচে নামার হুকুম দেয়। আমরা তো আনন্দে আত্মহারা। কারন, এ প্রথম বারের মতো আমাদের একস্থানে মিলিত হওয়ার সুযোগ হচ্ছে। আমরা পরস্পরকে দেখে মুখে কিছু না বলে সহাস্য বদনে ইশারা ইঙ্গীতে সালাম কালাম বিনিময় করি।

পরে একটু সাহস সঞ্চয় করে আমরা একে অপরকে জানার চেষ্টা করি। একই বিষয়ে অপর বন্ধুরা কি বিবৃতি দিয়েছে, তাও জানার চেষ্টা করি। একটা বিষয়ে সকলে একমত যে, আদালতে মামলা দায়ের করে তাদের এ বিবৃতি পরিবর্তন করা হবে।

এ সমাবেশে আমরা দেশী বিদেশী অনেক খবর জানতে পারি। যেমন আমরা জানতে পারি যে, জামাল নাসের আলী ছাবরীকে পদচ্যুত করে জাকারিয়া মহিউদ্দীনকে প্রধান মন্ত্রী নিযুক্ত করেছে। এ গুজবও শুনতে পাই যে, পাকিস্তানে জামাআতে ইসলামীকে বেআইনী ঘোষনা করা হয়েছে জামাআতের আমীর মাওলানা সাইয়্যেদ আবুল আলা মওদুদীসহ সুবার

www.pathagar.com

সদস্যদেরকে গ্রেফতার করা হয়েছে। এটাও জানতে পারি যে, মার্কিন কেন্দ্রীয় গোয়েন্দা সংস্থা এশিয়া আফ্রিকার অনেক দেশেই সামরিক অভ্যুত্থান ঘটিয়াছে।

দিনটি ছিলো আমাদের জন্য সুখকর। আমরা প্রাণ ভরে সূর্যের তাপ উপভোগ করি। পায়খানায় প্রয়োজন অনুযায়ী সময় কাটাবার সুযোগ পাই। প্রয়োজন মতো পানিও পান করতে পারি। সূর্যাস্তের আগে কারা ব্যবস্থাপকরা ঘোষনা করে যে, আমরা প্রতিদিন ভোরে এখানে আসবো সন্ধ্যায় কুঠুরীতে ফিরে যাবো। ঘোষনাটি ছিলো আমাদের জন্য অত্যন্ত আনন্দদায়ক। রোদ্রতাপে এমন সমাবেশ আমাদের জন্য ছিলো বিরাট গনীমত। এখানে এটাই ছিলো আমাদের বড় কাম্য। তখনো আমরা বুঝে উঠতে পারিনি যে, কেন হঠাৎ আমাদের প্রতি কারা কতৃপক্ষের এ দয়া হয়েছে। সন্ধ্যায় আমরা কুঠরীতে ফিরে যাই। সকলেই আনন্দিত এ সুখকর দিনটিকে স্মরণ করে সকলেই বন্ধুদের সাথে খোশগল্প করছিলো।

আমার স্মৃতি শক্তি দুর্বল না হয়ে থাকলে বলবো যে, খোশগল্প-গুজবের মধ্যেই আমরা সে রাতটি অতিবাহিত করি এবং অস্থির হয়ে পরদিন সূর্যোদয়ের অপেক্ষায় কাটাই। যাতে কুঠরীর অন্ধকার শীতল পরিবেশ থেকে বেরিয়ে খোলা প্রান্তরে বসতে পারি। সেখানে উপভোগ করতে পারবো রৌদ্রের তাপ, বন্ধুদের সান্নিধ্য আর শান্তিতে সমাধা করতে পারবো বাম হাতের কাজ। ভোরে সূর্যোদয়ের অনেক আগে পাহারাদাররা কুঠরীর দরজা খুলে সকলকে পায়খানার জন্য নিয়ে যায়। আমাদেরকে বলা হয়, আঙ্গিনায় যাওয়ার আগেই এ অভিযান সমাপ্ত করতে। আমরা সূর্যোদয়ের অনেক আগেই এ কাজ সারাই। কুঠরীতে ফিরে এলে নামকাওয়াস্তে নাস্তাও দেয়া হয়। কিন্তু বাইরে যাওয়ার আনন্দে আমার ক্ষিধা লোপ পায়।

কারাগারের চীপ ওয়ার্ডার হাবিলদার আলী আবু যাওমা কারাগারের আঙ্গিনায় পৌছে ভোর সাড়ে ছটায়। সেখানে পৌছেই সে হুইসেল বাজায় এর অর্থ হচ্ছে, আমরা যেন সতর্ক হয়ে কুঠরীর অভ্যন্তরে দাঁড়িয়ে যাই। হুইসেল বাজলে এমনটি করার নির্দেশ ছিলো আমাদের প্রতি। দ্বিতীয়বার হুইসেল বাজলে আমরা নির্দেশ মতো এক পলকে বাইরে

www.pathagar.com

বেরিয়ে এসে দেয়ালের দিকে মুখ করে দাঁড়াই। তৃতীয়বার হুইসেল বাজলে আমরা দ্রুত আঙ্গিনার দিকে চলে যাই। সেখানে গিয়ে পূর্ব ঘোষনা অনুযায়ী স্ব স্ব স্থানে অবস্থান গ্রহন করি। এখন পর্যন্ত আমাদের ধারণা এ নূতন নিয়ম আমাদের দুঃখ কষ্ট কিছুটা হলেও লাঘব করবে। আমরা বাধাধরা নিয়মের পরিবর্তন আমাদের সহ্য শক্তি কিছুটা বৃদ্ধি করবে। কিন্তু আমাদের ধারনা মিথ্যা প্রমাণিত হয়েছে। কেন হয়েছে তা শুনুন।

কারাগারের আঙ্গিনায় সমস্ত বন্দী দাঁড়ায়। সেখানে তাদেরকে বিভিন্ন গ্রুপে বিভক্ত করা হয়। এক একটি গ্রুপে এক বা তার চেয়েও বেশী বন্দী আমাদেরকে বলা হয় যে, সর্বপ্রথম কাজ হচ্ছে দৌড়ানো। তারা এটাকে বলে প্রাতকালীন দৌড়। যাই হোক, শুরু হয় দৌড়। আমরা বড় জেলের আঙ্গিনা থেকে বেরিয়ে বাইরে আসি, সেখানে আছে হাসপাতাল, বাবুর্চিখানা এবং অন্যান্য ইমারত। এসব ইমারতের সামনে দিয়ে ছিলো দৌড়ের লম্বা পথ।

সাইয়েদ কুতুব শহীদের সাথে সাক্ষাৎ

গ্রেফতারীর পর আজ প্রথম দেখতে পাই মুজাহিদে কারীর মশহুর মুফাসসিরে কুরআন আলেমে রাব্বানী সাইয়েদ কুতুব শহীদ রহমতুল্লাহ আলাইহেকে। হাসপাতালের নিকট দিয়ে তিনি ধীর কদমে এগুচ্ছিলেন। তাঁর প্রশস্ত কপাল থেকে অন্তরের স্বস্তি স্পষ্ট ঝিলিক মারছিলো। চোখের চমক থেকে সরে পড়ছিলো নূরের ধারা। এমন ভাবে টেনে টেনে মাটির উপর পা ফেলেছিলেন, যেন তা শক্তি হারিয়ে ফেলে ছিলো। পায়ের অস্বাভাবিক ফুলা জল্লাদদের নিষ্ঠুরতার জন্য যেন আর্তনাদ করছিলো। তিনি আমাদের প্রতি ভালোবাসা মিশ্রিত দৃষ্টি নিক্ষেপ করতেন আর চোখে চোখে আরও দৃঢ়তা স্থিরতার সবক দিচ্ছিল সাথীদেরকে।

আমরা যখন দৌড় শুরু করি, তখন ধারণা ছিলো, কয়েক মিনিটের মধ্যেই এ ব্যাম সূচক কর্মসূচী সমাপ্ত হবে। কিন্তু দৌড় শুরু করে বুঝতে পারি যে, দীর্ঘ দিন কারা প্রকোষ্ঠে বন্দী দশায় কাটাবার ফলে আমাদের দৌড়ানোর ক্ষমতাই লোপপেয়েছে। আমাদের ধারণা ছিলো, এ দৌড়

www.pathagar.com

বাধ্যতামূলক নয়। বরং আমাদের মধ্যে যার খুশী, সেপাইদের কাছ থেকে অনুমতি নিয়ে দৌড় থেকে দূরে সরে থাকতে পারে। কিন্তু আমাদের এ ধারণা ভুল প্রমাণিত হয়। আসলে দৌড় ছিল শাস্তির একটা নূতন উপায়। কোন বন্দী দৌড়তে দৌড়তে কাহিল হয়ে মাটিতে লুটিয়ে পড়লে সেপাইরা তাকে চাবুক পেটা করতো। তাকে খুব মেরামত করতো। কেউ কেউতো এমনভাবে কাহিল হয়ে মাটিতে লুটে পড়েছিলো যে, চাবুক খেয়েও উঠে দাঁড়াতে পারেনি। অবশ্য কিছু লোক ছিলো, যারা চাবুক খেয়ে পুনরায় দৌড়ানোর চেষ্টা করে। কেউ থেমে গেলে সেপাই তাদেরকে পেটাই করতো। দীর্ঘ দু'ঘন্টা চলে এ ধারা কোন বিরাম-বিরতি ছাড়াই। এরপর আমরা ফিরে আসি বড় জেলে। সেখান থেকে আমাদেরকে ফেরৎ পাঠানো হয় কুঠরীতে। আজ তো আমাদেরকে দৌড়াবার আগে নাশতা নামক পদার্থটা দেওয়া হয়, পরবর্তী দিনগুলোতে তা-ও দেওয়া হয়নি। এর ফলে আমাদের কষ্ট আরও বৃদ্ধি পায়। দৌড় শেষে আমর যখন কুঠরীতে ফিরে আসি, তখন আমরা এতটা অবশ ছিলাম যে, খাবারের প্রতি হাত বাড়ানোও সম্ভব ছিলোনা। ভীষণ শীতের মধ্যেও আমাদের ঘাম বেরুতে থাকে। দশটা বাজলে আবার আমাদেরকে ডাকা হয় দৌড়াবার জন্য। আমরা নিরুপায় হয়ে আবার কারাগারের আঙ্গিনায় জড়ো হতাম। শুরু করতাম দৌড়ানো। আমাদের প্রতি নির্দেশ ছিলো এভাবে দৌড়াবার। অবশ্য সব সময় এ নির্দেশ পালন করা সম্ভব হতোনা।

সামরিক কারাগারের কমান্ডার হামজা বিসিউনি সফেহ ঘোড়ায় সওয়ার হয়ে বড় জেল.....-এর আঙ্গিনায় উপস্থিত হতো। সমস্ত বন্দীরা তার সামনে উপস্থিত হয়ে সমষ্টিগত মোনাফেকী প্রদর্শন করতো, তাকে দেখে সকলে তুমুল করতালী দিতো। দম্ভ আর অহমিকায় সে হয়ে পড়তো আত্মহারা। সেপাইদেরকে নির্দেশ দিতো, সকলেই যেন তার সামনে দৌড়ায়। তাদেরকে এমনভাবে দৌড়ানো হতো যে, তাকে হাটটা-ফটটা ব্যক্তিও দৌড়াতে দৌড়াতে অস্থির হয়ে পড়ে যেতো। সেপাইরা তাদের বড় কর্তার সন্তুষ্টির জন্য অসহায়দেরকে ভালোভাবে শায়েস্তা করতো। নির্মমভাবে চাবুক

www.pathagar.com

পেটা করতো। আর কম্যান্ডার হামজা ঘোড়ার পিঠে সওয়ার হয়ে মহানন্দে অবলোকন করতো নির্যাতনের এ দৃশ্য। দম্ভে তার মাথা আসমানে ঠেকাতো আর তার শিরা-উপশিরায় প্রবাহিত হতো শয়তান।

রুগ্ন-পিড়ীত এবং বৃদ্ধদের গ্রুপ ছিলো আলাদা। অবশ্য এদেরকে দৌড় এবং ভারী ব্যাম থেকে অব্যাহতি দেয়া হতো। এদেরকে বলা হতো অক্ষম-দের গ্রুপ। দৌড়াতে দৌড়াতে যারা কোন দুর্ঘটনার শিকার হতো। তাদের-কেও প্রেরণ করা হতো অক্ষমদের দলে। ভীষণ পিটুনীর ফলে যারা অক-র্মণ্য হয়ে যেতো, কেবল তাদেরকেও অচল অধমদের গ্রুপে শামিল করা হতো।

খোদার লীলা-খেলা এমন যে, পাগল বলে খ্যাত এক লোককে করা হয়েছে অচল-অক্ষমদের গ্রুপের ইনচার্জ। তার নাম রশীদ মাফরাজ। আমিও অক্ষমদের গ্রুপে যোগ দেই। কারণ, আমার পায়ে এমন আঘাত করা হয়েছে যে, দৌড় তো দূরের কথা, দাঁড়ানোই মুশকিল। অক্ষমদের গ্রুপকে দৌড়ানো থেকে অব্যাহতি দেয়া হয়েছিলো। কিন্তু রশীদ মাফরাজ এমন এক পাষাণ প্রাণ ব্যক্তি, যে এ অচল-অক্ষম বন্দীদেরকেও দৌড়াতে বাধ্য করে। বরং সুস্থ সবল ব্যক্তিদের চেয়ে বেশীক্ষণ দৌড়ায়। কেউ দৌড়াতে অস্বীকার করলে বা অক্ষম হলে তাকে নির্দয় পেটানো হতো। মারা হতো রীতিমতো পশুর মতো। আর গলাফাটা চিৎকার দিয়ে বলতো বিকলাঙ্গের দল, বেন্ডীর বাচ্চারা। আমি তোমাদেরকে রুই ধুনা করে ছাড়বো। ঠিকই সে আমাদেরকে রুই ধুনা করেই ছেড়েছে। তখন আমার মনে হচ্ছিলো, আমি যদি পায়ে আঘাত পেয়ে অচল-অক্ষমদের গ্রুপে শামিল না হতাম।

বিকেলে আমরা কুঠরীতে ফিরে আসতাম। সারা দিনের ব্যায়ে অব-সন্ন হওয়া ছাড়াও চরম পিটুনীর ফলে সারা দেহ ব্যথিত। আগামী দিনের কথা চিন্তা করে আমাদের শরীর শিহরে উঠতো। আমাদের অবস্থা ছিলো এমন করুন যে, কুঠীতে ফিরে কারো সাথে কথা বলা সম্ভব হতোনা। কথা বলার মতো শক্তিই থাকতোনা।

কারাগারে সুই বরং সুতা রাখাও ছিলো নিষিদ্ধ। ছেড়া কাপড় পরিধান করার জন্য নানা উপায় অবলম্বন করতাম। আমরা কাপড় থেকে সুতা বের করে নিতাম। মাঝে মধ্যে আমাদেরকে যে মাছ দেয়া হতো,

www.pathagar.com

তার কাঁটা দিয়ে সুইয়ের কাজ চালাতাম। এমনি ভাবে ছেড়া কাপড় শেলাই করে পরিধান করতাম। কিন্তু আমাদের মুখে সব সময় অভিযোগ জারী থাকতো :

—হে খোদা! একটা ছেঁড়া হলে তালি দিয়ে নিতাম কোন ভাবে কাপড়, কিন্তু যালেমতো টুকরো টুকরো করে ছিড়েছে মোর বস্ত্র।

হাবিলদার আলী আবুজাওমা সকালের গ্রুপের র‍্যাম, পরিদর্শন কালে যখন শুনতে পেতো যে, কোন বন্দী তার ছেঁড়া কাপড় সেলাই করে নিয়েছে. সে তাকে সারী থেকে বিচ্ছিন্ন করে জিজ্ঞেস করতো যে, ছেঁড়া কাপড় সে কিভাবে সেলাই করেছে। বন্দী তাকে জানাতো যে, ছেঁড়া কাপড় থেকে সুতা বের করে মাছের কাঁটা দিয়ে কোন রকমে তা সেলাই করে নিয়েছে। কিন্তু তার এ কথায় হাবিলদারের বিশ্বাস হতোনা। সে ক্ষিপ্ত হয়ে চাবুক ব্যবহার শুরু করতো। পেটাতে পেটাতে তাকে আধমরা করে ছাড়তো। দৌড়ানোর এ ব্যবস্থাটি ছিলো আমাদের জন্য এক নূতন বোঝা, নূতন বিপদ। এ ব্যবস্থার মাধ্যমে শাস্তি দানের যে নূতন ধারা আমাদের উপর প্রয়োগ করা হয়, তা আমাদের জন্য ছিলো আরও প্রনান্তকর, আরও বিভীষিকা-ময়, তা সহ্য করার এবং তার সামনে টিকে থাকার ক্ষমতাই ছিলোনা আমাদের মধ্যে। অবশ্য কারাগারে আমরা একটা কান্ড করি, সেপাইরা আমাদের সে খাবার চুরি করে নিয়ে যেতো, আমরা সাহস করে তাদের কাছ থেকে তা ছিনিয়ে নিতাম। এতে কোন প্রাকারে আমাদের প্রাণে বেঁচে থাকার ব্যবস্থা হতো। কারাগারের সেপাইরা আমাদের পনীর চুরি করে নিতো, আমরা তা-ও ছিনিয়ে নিতাম তাদের কাছ থেকে। এভাবে অন্যান্য খাদ্য দ্রব্যও আমরা তাদের কাছ থেকে ছিনিয়ে নিয়ে কোন প্রকারে আত্মরক্ষার ব্যবস্থা করতাম। এই ছিনিয়ে নেয়ার কাজে আমাদের কোন কোন বন্ধু ছিলো বেশ দক্ষ, বেশ পটু। অবশ্য যে, যেটুকু অংশ ছিনিয়ে নিতে সক্ষম হতো, সে তার বেশীরভাগ অন্য বন্ধুদের মধ্যে বন্টন করে দিতো। সবচেয়ে বড় অংশটা দেয়া হতো অসুস্থ এবং বৃদ্ধদেরকে। আমি প্রত্যক্ষ করেছি যে, সামরিক কারাগারে ইখওয়ানুল মুসলেমুনের সেবার লোক ছিলো, তাদের মধ্যে সামাজিক সহযোগিতা, পরের সেবা, অসুস্থ, পীড়িত এবং দুর্বলদের

www.pathagar.com

সেবার এমন স্পিরিট বর্তমানছিলো, যা ভাষায় ব্যক্ত করা কঠিন। এ ব্যাপারে তারা মানবতা এবং ইসলামী ভ্রাতৃত্বের এমন উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছে, যা ছাহাবায়ে কেরামদের যুগের কথা স্মরণ করিয়ে দেয়।

ইখওয়ানের উত্তম নীতি

ইখওয়ানুল মুসলেমুনের প্রতিটি ব্যক্তির নীতি ছিল এই যে, তারা নিজের চেয়েও বেশী ভালো বাসতো তাদের বন্ধুদেরকে। বন্ধুদের আরাম আয়েশ আর সুযোগ-সুবিধার কথাই তারা বেশী ভাবতো। তাদের নিষ্ঠা অন্তরিকতা, খোদা প্রীতি আর খোদাভীতির অবস্থা এমন ছিলো যে, প্রয়োজনে তারা বন্ধুদের জন্য নিজেদের জীবন উৎসর্গ করতেও কুণ্ঠাবোধ করতোনা কখনো। এর অনেক দৃষ্টান্ত পেশ করা যায়। এখানে একটা ক্ষুদ্র উদাহরণ পেশ করাই যথেষ্ট মনে করছি।

একদিনের কথা। বন্দীদের ময়দানে দৌড়ানোর শাস্তির পালা চলছে। জনৈক সেপাই এসেছে আমাদের দৌড় পরিদর্শনের জন্য। এ সময় কে একজন ফিস ফিস করে কি যেন বলে। এ ফিস ফিস শব্দ পরিদর্শক সেপাইর কান এড়িয়ে যেতে পারেনি। সেপাই এতে ক্ষিপ্ত হয়। জ্বলে উঠে তেলে বেগুনে। সে নির্দেশ দেয়ঃ যে কথা বলেছে, সে যেন আমার সামনে আসে। কিন্তু সকলেই চুপ। কারোমুখে কোন কথা নেই। কেউ আসেনা তার সামনে। আসলে যিনি কথা বলছেন, তিনি ছিলেন একজন অত্যন্ত বৃদ্ধ বন্দী। বৃদ্ধ ব্যক্তিটি প্রাণের ভয়ে সেপাইর সামনে যায়নি। ফিস ফিস করে কিছু একটা বলার কথাও স্বীকার করেনি। দুর্বল বয়স্ক লোকটা মামুলী পিটুনীও সহ্য করতে পারবেনা। তার নেই সে ক্ষমতা। ভয়ের কারণে বৃদ্ধ নিজেকে চিহ্নিত করেনি, করতে অন্ততঃ সাহস পায়নি। সেপাই হুমকি দিয়ে বলে, কে কথা বলেছে, তা না জানালে সে গোটা গ্রুপকে পাইকারী ধোলাই করবে। সকলেরই বারটা বাজাবে। কে কথা বলছে, তা গ্রুপের অধিকাংশ লোকেই জানতো। কিন্তু কেউ বলেনি। সেপাই এতে আরও ক্ষিপ্ত হয়ে উঠে। প্রায় সারাটা দিনই সে আমাদের রক্ত পান করে। যোহর থেকে শুরু করে মাগরিব পর্যন্ত সে আমাদেরকে চাবুক

www.pathagar.com

পেটা করে। কিন্তু তারপরও কেউ মুখ খোলেনী। ফাঁস করেনি এ তথ্য। এটাই হচ্ছে ইখওয়ানের চরিত্রের শ্রেষ্ঠত্বের নিদর্শন। এমনি ছিলো তাদের মাহাত্ম্য।

ইখওয়ান কর্মীদের সাক্ষাৎ

এমনি ভাবে নানা গ্রুপের যাতায়াত কালে ইখওয়ানের সংগঠনের সাথে সম্পৃক্ত অনেকের সঙ্গেই আমাদের সাক্ষাৎ লাভের সুযোগ ঘটে। এদের সাথে সাক্ষাতের ফলে আমরা অনেক অজানা বিষয় জানতে পারি। আমাদের সাক্ষাৎ হয় আবদুল ফাত্তাহ ইসমাঈলের সাথে। আল্লাহ তাকে আপন রহমতে ধন্য করুন। তিনি ছিলেন নজীর বিহীন মানুষ। মহান মুজাহিদ সাইয়্যেদ কুতুব শহীদের সাথে যাদেরকে ফাঁসীর কাষ্ঠে ঝুলানো হয়, তিনি ছিলেন তাদের অন্যতম। আহম্মদ আবদুল মজীদের সাথেও সাক্ষাৎ হয়। আরও অনেকের সাথে চোখে চোখে মিলন ঘটে। এরা ছিলেন ইখওয়ানের উজ্জ্বল নক্ষত্র, ইসলামী আন্দোলনের চন্দ্র। সত্য বটেঃ

—রক্ত আর মাটিতে আপ্লুত হয়ে সৃষ্টি করেছে তারা এক নূতন ধারা,
খোদা রহমত করুন এ পাক মাটির আশেকদের প্রতি।

www.pathagar.com

দ্বাদশ দৃশ্য

বিচার প্রহসন

ইখওয়ানুল মুসলেমুনের সমস্যার ব্যাপারে অনেক নূতন তথ্য অবগত হই। এসব তথ্য একদিকে যেমন বিরল, অপর দিকে তেমনি চিত্তাকর্ষক। এসব বিরল তথ্যের একটি হচ্ছে এই যে, ১৯৪৪ সালে, সামরিক সরকার ইখওয়ানকে যখন' বেআইনী ঘোষণা করে, তখন এ আইনের বিরুদ্ধাচরণ করার জন্য কোন শাস্তি নির্ধারন করা হয়নি। এতে বুঝা যায়, ১৯৫৪ সালের পর কেউ ইখওয়ানুল মুসলেমুনকে বহাল করার চেষ্টা করলে তা বেআইনী হতো না, হতোনা আইনের দৃষ্টিতে দন্ডনীয় 'অপরাধ' কারণ, আইন এবং ফিকাহ নিন্দাবাদরা বলেন যে, আইনের মূল পাঠে উল্লেখিত বিধানের বিরুদ্ধাচরণকে বলা হয় অপরাধ। কিন্তু এখানে কে মানে কার আইন, কে করে ইনসাফের তোয়াক্কা, এখানেতো চলছে জংলী আইন। সকল আইন আর নীতি এমন ভাবে পালন করা হয়, মেনে চলা হয়, যেমনটি করে জঙ্গলের মানুষ থেকে হিংস্র জন্তু। নাগরীকদেরকে কিছু না জানিয়েই ঘর থেকে হাইজ্যাক করে নিয়ে যাওয়া হয়, যুলুম-নির্যাতনের পর্যায় অতিক্রম করার পর আদালতরূপী নাটকের মাধ্যমে তাদেরকে যা খুশী শাস্তি দেয়া হয়।

জেনারেল মোহাম্মদ ফুয়াদ দাজবীর নেতৃত্বে গঠিত হয় আদালত। এ আদালতের নাম দেয়া হয় ষ্টেট সিকিউরিটি কোর্ট—রাষ্ট্রিয় নিরাপত্তা আদালত। জেনারেল দাজবীকে যারা দেখেছেন তারা বলেন, ইনি ছিলেন নিষ্ঠুর বর্বর। বুদ্ধির ঢেকি, জ্ঞান বিবর্জিত, দাম্ভিক এবং মর্যাদাবোধ হীন ভুয়া আদালতের ষ্টেজে তার যত গুলো অধিবেশন বসেছে, তার সব গুলোই তাঁর হীন ও নীচ প্রবৃত্তির প্রমান বহন করে। আদালতের বিচার পতি সম্পর্কে মানুষের ধারনা এই যে, তাঁরা হয়ে থাকেন ইনসাফ প্রিয় এবং নিরপেক্ষ ব্যক্তি। ধৈর্য ও সহনশীলতার প্রতীক। সকল পরিস্থিতি আর বিবৃতিকেই সত্যের মানদন্ডে যাচাই বাছাই করেন। দন্ড দানে ভুল করা থেকে বাঁচার চেষ্টা করেন। বিপদে তারা হন মানুষের জন্য আশ্রয়

www.pathagar.com

স্থান। স্বৈরাচার আর যুলুম নির্যাতনের সায়লাবের মুখে তাঁরা মানুষের জন্য প্রাচীরের মতো দৃঢ় হয়ে দাঁড়ান। এ হচ্ছে বিচারপতিদের সম্পর্কে মানুষের সাধারণ ধারনা। কিন্তু জেনারেল মুহাম্মদ ফুয়াদ দাজবী ছিলেন এসব গুন বৈশিষ্ট্য থেকে মুক্ত। তিনি ছিলেন অত্যন্ত বাকা প্রকৃতি আর তেড়া স্বভাবের লোক। তিনি তার পূর্বসূরী মিশরের জামাল সালেম। আর ইরাকের কর্ণেল মাহদাবীর (১৯৫৮) অনুকরনের চেষ্টা করেন পুরো পুরী। কিন্তু যেহেতু তার জ্ঞান বুদ্ধি ছিলো স্বল্প ও সীমিত, তাই জামাল সালেম আর কর্ণেল মাহদাবীর মতো নাটক মঞ্চস্থ করার ক্ষমতা যোগ্যতা তার ছিলনা তাই সব ব্যাপারেই তিনি নীচতার পরিচয় দেন। তার মুখের কথা শুনেও কেউ আকৃষ্ট হতোনা। মামলার শুনানী কালে তিনি কোন চটকদার কথা বললেও তাতে কেউ আকৃষ্ট হতোনা, জানাতোনা তাকে স্বাগত। অথচ: আদালতে উপস্থিত প্রায় সকলেই হতেন চামচা শ্রেণীর লোক। আদালতের মন্তব্য করতালী দেয়ার জন্যই তাদেরকে আনা হতো এখানে।

এ ছত্রগুলো লিখতে গিয়ে হঠাৎ আমার মনে পড়ে ইসলামের ইতিহাসের প্রথম যুগে খলীফা হযরত ওমরের শাহাদাতের ঘটনা। খলীফা হযরত ওমরের প্রাণ নাশের চেষ্টার পর এটা প্রমাণিত হয় যে এতে কিছু লোকের হাত ছিলো এবং হামলাকারী গোলাম আবুলুলু' ফিরোজের সাথে তাদের গাটছড়া ছিলো। কিন্তু এতদসত্বেও তাদেরকে এ ঘটনায় জড়ানো হয়নি। তৎক্ষনাৎ নির্দেশ জারী করে মদীনায় বসবাসকারী সকল মজসী নাগরিককে গ্রেফতার করা নূতন খলীফার জন্য অত্যন্ত সহজ ছিলো এদের মধ্যে কেউ কেউ মোনাফেকী করে মুসলমানও হয়েছিলো। কিন্তু যেহেতু দ্বীনও শরীয়তের মানদন্ড এবং সভ্যতাও আইনের দৃষ্টিতে এটা সঠিক ছিলনা, তাই নূতন খলিফা এ পদক্ষেপ পসন্দ করেননি। আধুনিক যুগেই দেখেন, দুনিয়ার সবচেয়ে বড় গণতান্ত্রিক দেশ আমেরিকার প্রেসিডেন্ট জন কেনেডিকে গুলী করে হত্যা করা হয়। কিন্তু যে গুলী করেছে তাকে ছাড়া অন্য কাউকে গ্রেফতার পর্যন্ত করা হয়নি। বলা হয় যে, এ ব্যাপারে প্রেসিডেন্টের জন্য বিশেষ কোন আইন নেই। তিনিও সাধারণ মানুষের মতোই একজন মানুষ। সাধারণ মানুষের ব্যাপারে যে আইন প্রযোজ্য, তাঁর ক্ষেত্রেও তাই।

www.pathagar.com

যাই হোক, জেনারেল দাজবী মামলার কার্যক্রম শুরু করেন। শুরুতেই তিনি অভিযুক্ত ব্যক্তিদেরকে দায়ী করে বসেন। তারা কি কি অপরাধ করেছে তিনি তার ফিরিস্তি দেয়া শুরু করেন। তাঁর উদ্বোধনী বক্তব্য শুনেতো আইনজীবীরা অবাক। তারা আঙ্গুলে কামড় দিয়ে দাঁড়িয়ে আছেন। যেন আদালতে আপীলের কার্যক্রম শুরু হওয়ার আগেই তিনি প্রসিকিউটিং অনুমোদন করেন। সুতারাং পরে যা আলোচনা হয়েছে, তার কোন মূল্যই নেই। অবশিষ্ট ছিলোনা তার কোন গুরুত্ব। স্বয়ং বিচার পতিই অভিযুক্ত করছেন অভিযুক্ত ব্যক্তিদেরকে। অথচঃ আইন আদালতের দাবী হচ্ছে, আদালতের কার্যক্রমে দোষী সাব্যস্ত করার পূর্ব পর্যন্ত অভিযুক্ত ব্যক্তি নির্দোষ।

মামলার কার্যক্রম কি ছিলো, তা আলোচনা করা হবে অর্থহীন পুনরুক্তি। তখনকার পত্র পত্রিকায় এসব কার্যক্রমের বিবরণ ছাপা হয়। পত্রিকার পৃষ্ঠার পর পৃষ্ঠা জুড়ে প্রকাশ পায় এসব বিবরণ। অবশ্য এমন কিছু দিকও ছিলো, প্রচার মাধ্যম গুলো যা প্রচার প্রকাশ করতে পারেনি এখানে তার কিছু দিক নিয়ে আলোচনা ফলপ্রসূ হতে পারে। ইখওয়ানের বিরুদ্ধে মামলার প্রহসন এবং সে সম্পর্কে আমার প্রতিক্রিয়া এখানে ব্যক্ত করা হচ্ছে।

মামলার প্রহসন

দাজবীর সামনে যেসব মামলা পেশ করা হয়, তন্মধ্যে 'খাত্তাব কেস' ছিলো সবচেয়ে প্রসিদ্ধ। মামলাটির সংক্ষিপ্ত সার এই: খাত্তাব ছিলো আলেকজান্দ্রিয়ায় (ইসকান্দরিয়া) ইখওয়ানের একজন সদস্য। ১৯৪৪ সালে ইখওয়ানের উপর যে নির্যাতন চালানো হয়, তার প্রতিশোধ গ্রহণের জন্য সে জামাল নাসেরকে হত্যার পরিকল্পনা গ্রহণ করে। এ পরিকল্পনা বাস্তবায়নের জন্য সে তার কোন কোন বন্ধুর সহযোগিতায় এ জন্য প্রয়োজনীয় অস্ত্র-শস্ত্রও সংগ্রহ করে। খাত্তাব এ ব্যাপারে বন্ধুদের সাথে কয়েক বার মত বিনিময় করে। অবশেষে তারা হত্যার পরিকল্পনা পরিত্যাগ করে এবং এর পরিবর্তে গঠন মূলক কাজ করার সিদ্ধান্ত নেয়- যাতে জনগণের কল্যাণ হয় এবং দেশের মর্যাদা বৃদ্ধি পায়। যেমন, জনগণের মধ্যে ইসলামী চরিত্র

www.pathagar.com

ও মূল্যবোধের ব্যাপক প্রচার-প্রসার করা। তারা এজন্য পন্থা ঠিক করে নেয় যে, প্রত্যেক ব্যক্তি তার সম-পেশার লোক, অফিস কলিক, আত্মীয়-স্বজন, প্রতিবেশী এবং অন্যান্য পরিচিত লোকজনের চরিত্র সংশোধনের চেষ্টা করবে। এজন্য কোন সংগঠন গড়ে তোলার প্রয়োজন নাই। এ সিদ্ধান্তের পর ১৯৬৫ সালে শীতকালের এক রাতে তার বোনকে সঙ্গে নিয়ে জামাল নাসেরের ট্রেন উড়িয়ে দেয়ার জন্য সংগৃহীত সব সরঞ্জাম উপকরণ সাগরে নিক্ষেপ করে আসে। এমনিভাবে গোটা পরিকল্পনাই চাপা দেয়া হয়। সাধারণ আইনের ভাষায় এ কাজকে বলা হয় অপরাধ সংগঠিত করা থেকে ইচ্ছাপূর্বক হাত গুটিয়ে নেয়া। এর অর্থ এই দাঁড়ায় যে, কিছু লোক একজন নির্দিষ্ট ব্যক্তিকে হত্যার ব্যাপারে একমত হয়। কিন্তু পরে তারা এ ঐক্যমত থেকে সরে দাঁড়ায়। বরং তারা এ ঐক্যমত বাতিল করে দেয়। খাত্তাব গংদের মামলাও ছিলো এ ধরণের। তাদেরকে যখন দাজবীর আদালতে হাযির করা হয়, তখন তাদের বিরুদ্ধে এ অভিযোগ ছিলো যে, তারা জামাল নাসেরকে হত্যার পরিকল্পনা শুরু করে ছিলো। সুতরাং দাজবীর আদালতে খাত্তাব এবং সহযোগীদের সকলকে যাবজ্জীবন সশ্রম কারাদন্ডে দন্ডিত করা হয়। অথচ উপরের আলোচনা থেকে এটা প্রমাণিত হয় যে, এরা অপরাধ সংগঠন থেকে ইচ্ছাপূর্বক ভাবে সরে দাঁড়িয়েছে। উপরন্তু খাত্তাবের স্ত্রীর বোন যে রাতে বিস্ফোরক দ্রব্যাদী সমুদ্রে নিক্ষেপ করার জন্য গমন করে, তখন পর্যন্ত সে ছিলো অবিবাহিতা। এ ঘটনার কিছুদিন পর তার বিয়ে হয়। ১৯৬৫ সালে যখন ইখওয়ানকে গ্রেফতার করা শুরু হয়, তখন এ মহিলাকেও গ্রেফতার করা হয়। গ্রেফতার করা হয় তার স্বামীকেও। তাদেরকে প্রেরণ করা হয় ভিন্ন ভিন্ন কারাগারে। তার স্বামী এ ব্যাপারে কিছুই জানেনা। নিজের গ্রেফতারী সম্পর্কে সে রীতিমতো অস্থির। কিন্তু কারাগারে তদন্ত চলাকালে সে বুঝতে পারে, কি জন্য তাকে গ্রেফতার করা হয়েছে, কি জন্য তার উপর চালানো হচ্ছে নির্যাতন। আরও অনেক কিছুই বুঝতে পারে কারাগারে। তার বিরুদ্ধে কোন বিচার কার্যক্রম শুরু হয়নি। দেয়া হয়নি তাকে আপিলের সুযোগ।

www.pathagar.com

জামাল নাসেরকে হত্যার অভিযোগের বিষয়টিই ধরা যাক, অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে যে তদন্ত কার্যক্রম চালানো হয়, তাদের কাছ থেকে সত্য-মিথ্যা যে সব বিবৃতি নেয়া হয়, তাতেও এটা প্রমাণিত হয়না যে, তাঁকে হত্যা করার জন্য কেউ গিয়েছিলো। বড় জোর যেটুকু জানা যায়, তা হচ্ছে এই যে, এক ব্যক্তিকে হত্যা করার ব্যাপারে কেউ চিন্তা করেছিলো মাত্র। এ চিন্তা করার জন্য কাউকে যদি প্রাণদন্ড দেয়া হয়, বরং তা কার্যকর করা হয়, তবে এহেন আইন-আদালতের জন্য বিস্ময় প্রকাশ করা ছাড়া আর কি-ইবা করা যেতে পারে। কিন্তু মিশরে এ অবাক কান্ডটি-ই ঘটছে। মানুষের অন্তরে যেসব চিন্তা উঁকি ঝুঁকি মারে, এখানে তার জন্যও দেয়া হয় কঠোর এবং নিষ্ঠুর শাস্তি।

হোসাইন তাওফীক নামে একজন অভিযুক্ত ব্যক্তি মামলার কার্যক্রম চলাকালে এহেন যুলুমের বিরুদ্ধে তার মনের অভিব্যক্তি প্রকাশ করতে গিয়ে আদলতের চেয়ারম্যানের সামনে প্রকাশ্যেই বলেছেন।

আমরা অপনার বিরুদ্ধে বিপ্লব সাধনের পরিকল্পনা করলে সে আমাদের সাথে এমন আচরণ করতোনা, যা আপনি করছেন আমাদের সাথে।

মামলা সাজানোর জন্য জন নিরাপত্তা বিধায়ক সংস্থাগুলো যে পৈশাচিক ভাবে তদন্ত চালিয়েছে, তার পরিণতিতে পঞ্চাশ জনেরও অধিক ব্যক্তিকে মৃত্যুর মুখে ঠেলে দেয়া হয়। হযরত ঈসা আলাইহিস সালামের ভাষায় এরা হচ্ছেন বিশ্বের সারবস্তু, জঙ্গলের আলোক বর্তিকা! এসব বিশিষ্ট ব্যক্তিদের মধ্যে যাদের সম্পর্কে আমি জানতে পেরেছি, তাঁরা হচ্ছেন ঃ

জাকারিয়া আল-মাশ্নুতলী, বদর আল কাছাবী, আহমদ শো'লান, মুহাম্মদ আওয়াদ, ইসমাঈল আল-ফাইউমী। এদের মধ্যে কিছু বন্ধুর শাহাদাতের দৃশ্য এ অধম স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করেছে, যেমন জাকারিয়া আল মাশ্নুতলী বদর আল কাদাবী ও আহমদ শো'লান। আর অন্যদেরকে দেখেছি শাহাদাতের পথ পরিক্রম করতে, যেমন মুহাম্মদ আওয়াদ ও ইসমাঈল আল ফাইউমী আল্লাহ তাআলা এসব মহা প্রাণ মর্দে মুজাহিদদেরকে তাঁর রহমতের ছায়াতলে স্থানদিন। আদালতে প্রকাশ্যে যাঁদেরকে ফাঁশির কাষ্টে ঝুলানো হয়,

www.pathagar.com

তাঁরা হচ্ছেন সাইয়্যেদ কুতুব, শেখ আব্দুল ফাত্তাহ ইসমাঈল এবং ওস্তাদ মুহাম্মদ ইউসুফ হাওয়াশ।

আদালতের কার্যক্রম ছিলো নিছক একটা নাটক। আদালতের এ নাট্যমঞ্চে উপস্থিত করা হয় নওজোয়ানদেরকে। এরা সেই বীরের দল, ঈমানের নূরে যাদের অন্তর আলোকিত। যাদের অন্তর পাহাড়ের চেয়েও দৃঢ়, যাদের চরিত্র ও কর্মধারা উজ্জ্বল রবির তুল্য। তাঁরা জানতো, তাদের কি পরিণতি হবে, পরীক্ষার কোন্ কোন্ পর্যায় অতিক্রম করতে হবে তাদেরকে। এ সব বীর বাহাদুর নওজোয়ানরা বাতেলের সামনে স্বজনপ্রীতি ও দৃঢ়তার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছে। আন্দোলনের প্রতি নিষ্ঠা আন্তরিকতা এবং সত্যকে বরণ করে নেয়ার অনুপম দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছে তারা। তারা আদালতের নাট্যমঞ্চে হাজির হয়েছে, অতঃপর ভাগ্য লিপিকে বরণ করে নিয়েছে হাসি মুখে সন্তুষ্ট চিত্তে।

সাইয়্যেদ কুতুব দাজবীর সাথে কড়া কড়া কথা বলেন। কিন্তু আমি পূর্বেই উল্লেখ করেছি যে, দাজবীর উদাহরণ হচ্ছে একজন অকর্মন্য এ্যাক্টিংকারী জোকারের মতো। আর তাকে দায়িত্ব দেয়া হয়েছে একজন সূক্ষ্মদর্শী ও ইনসাফ প্রিয় বিচারপতির ভূমিকা পালন করার জন্য। এহেন ভূমিকা পালন করার জন্য কিছু না কিছু প্রজ্ঞা বিচক্ষণতা প্রয়োজন। কিন্তু দাজবী এর সামান্য পরিমান থেকেও মুক্ত ছিলো। কিন্তু শারীরীক দুর্বলতা এবং এবং মানসিক অবসাদ সত্বেও সাইয়্যেদ কুতুব জোকার দাজবীকে কড়া কড়া কথা শুনান। তখন মিনারীর সংবাদ পত্র ও সংবাদ সংস্থার অনেক প্রতিনিধি সেখানে উপস্থিত ছিলেন। অবশ্য তখন মিশরে সংবাদপত্রের স্বাধীনতা বলতে কিছুই ছিলোনা। সংবাদপত্র ছিলো সম্পূর্ণ সরকারী নিয়ন্ত্রনাধীন, যাকে বলা যায় একেবারে হিজ মাষ্টাস ভয়েস। ইখওয়ানুল মুসলেমুনের অভিযুক্ত বন্দীদের প্রতি যে বর্বর পৈশাচিক নির্যাতন চালানো হয়, সাইয়্যেদ কুতুব মিঃ দাজবী এবং সংবাদ পত্রের প্রতি নিধিদের সামনে তার মর্মস্পর্শী বিবরণ তুলে ধরেন। আদালত কক্ষে সাইয়্যেদ কুতুবের সপষ্ট উক্তি এবং দুঃসাহসিক বিবৃতির প্রতিক্রিয়া দেখা দেয় ক্রুর হাসি আর করুণা সুলভ দৃষ্টির আকারে। তথাকথিত আদালতের বিচার

www.pathagar.com

পতি, ইন্টেলিজেন্সের জল্লাদ, অন্যান্য চামচা এবং ভাড়াটিয়া শ্লোগানধারীরাও এ প্রতিক্রিয়ায় শামিল ছিলো। তাদের উদ্দেশ্য আর নিজের পরিণতি ভালোভাবে জানা সত্তেও সাইয়্যেদ কুতুব তাঁর কথা বলে ফেলেন। ভাবতে অবাক লাগে যে, কারাগারে তার নিজের উপর যে অকথ্য নির্যাতন চালানো হয়, তিনি সে দিকে সামান্য ইঙ্গীতও করেননি। অন্য ইখওয়ান কর্মীদের প্রতি যেসব যুলুম নির্যাতন চালানো হয়েছে, তিনি কেবল তারই বিবরন, তুলে ধরেন তার চিত্র।

সাইয়্যেদ কুতুব শাহদাত সম্পর্কে নিশ্চিত ছিলেন :

কারাগারের সেপাইরা একবার আমাকে এবং আমার কয়েকজন বন্ধুকে নিয়ে যায় বাবুর্চিখানা থেকে খাবার আনার জন্য। পথিমধ্যে সাইয়্যেদ কুতুব শহীদকে দেখতে পাই। আমি এটাকে এক দুর্লভ মুহূর্ত মনে করে তাঁর দিকে এগিয়ে যাই। জিজ্ঞেস করি :আপনার কি মনে হয়? তিনি হেসে ধীরে সুস্থে জবাব দেনঃ প্রভু পরওয়ারদেগারের দরবারে হাযির হওয়ার আশা রাখি। কেবল আসা-ই নয়, বরং তাগুতের হাতে শাহাদাতের মর্যাদা লাভ সম্পর্কে তিনি ছিলেন নিশ্চিত। কিন্তু আদালতের সামনে তিনি যা বলেছেন, যে বিবৃতি দিয়েছেন, তা দিয়েছেন এজন্য যাতে ইতিহাসের পাতায় আসল সত্য লিপিবদ্ধ থাকে। তাগুত অনেক চেষ্টা করেছে এ ইতিহাস মুছার জন্য, কিন্তু কয়েক বছর পর হলেও ইতিহাস সত্য ঘটনা আর বাস্তব সত্য প্রকাশ করেছে। দুনিয়ার সামনে এটা স্পষ্ট করে তুলে ধরছে যে, সত্য কি, অবিশ্বাস কি, ? কে জালেম, আর কে মজলুম ? দেশ প্রেমিক কারা, আর কারা দেশের গাদ্দার ? আজ মিশরে সাইয়্যেদ কুতুবের নাম উচ্চারণের সাথে সাথে ভক্তি-শ্রদ্ধায় মাথা নত হয়ে পড়ে। আর অতীত কালের কোন জল্লাদের নাম উচ্চারণের সাথে সাথে শুরু হয় লানত ধ্বনি। সাইয়্যেদ কুতুব আজ অযুত কোটি মানষের অন্তরে বেঁচে আছেন কিন্তু তাঁর প্রতি যারা যুলুম চালিয়েছিলো, আজ তারা নিশ্চিহ্ন। সত্য বটে :

ইশকে যার অন্তর জীবিত, কখনো তার মৃত্যু নেই
আমাদের বিশ্বের স্থায়ী পাতায় লিখিত আছে তাই।

www.pathagar.com

জেনারেল দাজবীকে ট্রাইবনালের চেয়ারম্যান করা হয়েছে। অথচঃ তাঁর উল্লেখযোগ্য ও প্রশংসনীয় কোন পটভূমিকা নেই। ১৯৫৬ সালে মিশরের উপর ত্রী শক্তির হামলার সময় ইহুদীরা গাজা এলাকা অধিকার করে জেনারেল দাজরীকে সেখানে গবর্ণর নিযুক্ত করে। ইহুদীদের উদ্দেশ্য ছিলো যে কোন উপায়ে হোক গাজা এলাকা ছেড়ে যেতে মিশরীয় এবং ফিলিস্তানীদেরকে বাধ্য করা, যাতে গাজা এলাকাকে পরিপূর্ণরূপে ইহুদী এলাকায় পরিণত করা যায়। শেরে গাজা—গাজার বাঘ জেনারেল দাজবী এ ব্যাপারে ইহুদীদের বেশ মদদ যোগয় মিশরী এবং ফিলিস্তীনীদেরকে গাজা এলাকা ছাড়ার জন্য উৎসাহিত ও অনুপ্রাণিত করে। এহেন ঘৃন্য ভূমিকা পালন করার পর জেনারেল দাজবী ইসরাইলী বেতার থেকে জোড়ালো ভাষণ দেয়। মিশর সরকারের নিন্দা ও কুৎসা রটায়। এসব ভাষণ বিবৃতিতে সে নিজেকে এমন সব বিশেষণে ভূষিত করে' যা শুনে বিবেকবান ব্যক্তিরা লজ্জায় অধো বদন হয়ে যায়। জেনারেল দাজবীর এহেন গাদ্দার সুলভ আচরণ দৃষ্টে গাজা হাইকোর্টের বিচারপতি জনাব মুহাম্মদ মামুন আল হোযাইবি সাহস করে গাজার নিষ্ঠাবান আরবদেরকে সঙ্গে নিয়ে জেনারেল দাজবী এবং ইহুদীদের এ ষড়যন্ত্র নস্যাৎ করে দেন। এরপর এমন সময় আসে, যখন জেনারেল দাজবীকে মিশরে আশ্রয় নিতে হয়। জামাল নাসেরের দরবারে ধর্ণা দিয়ে সে ক্ষমা চায়। জামাল নাসের একটা শর্তে তাকে ক্ষমা প্রতি শ্রুতি দেন। শর্তটি হচ্ছে এই যে, তাকে কোন অস্বাভাবিক কীর্তি সাধণ করতে হবে। ইখওয়ানুল মুসলেমুনের মামলায় অস্বাভাবিক কৃতিত্বের পরিচয় দিয়ে মনিবকে খুশী করার সুযোগ এসেছে তার সামনে।

অদৃষ্টের নির্মম পরিহাস যে' গাজা হাইকোর্টের সাবেক জজ জনাব মুহাম্মদ মমিুন আল হোযাইবী এখন মিঃ দাজবীর আদালতে উপস্থিত। একদিকে মামুন হোযাইবীর মতো সাহসী ও সত্যান্বেষী বিচারপতি আদালতে অভিযুক্তরা কাঠগড়ায় দাঁড়িয়ে, আর অন্যদিকে মিঃ দাজবীর মতো কটুভাষী অপাংতেয় ও বুদ্ধি বিবেক বর্জিত ব্যক্তি আদালতে বিচারপতির আসনে সমা-

www.pathagar.com

সীন। আদালতে কোন কথা বলা ছিলো নিস্ফল। মিঃ দাজবী আদালতে আসা-মীর কাঠগড়ায় দন্ডায়মান এককালের বিচারপতি জনাব মামুন হোযাইবীর প্রতি লক্ষ করে টো·ল চাপড়ে বলেঃ আমি যা বলছি, আইন তা-ই বলে। জনাব মামুন হোযাইবী ধীর-শান্ত কণ্ঠে তার জবাবে বলেনঃ আইন এটাই বলে—একথা আপনাকে কে বলেছে? মিঃ দাজবী চিৎকার দিয়ে বলেঃ আমি জজ। আইন কাকে বলে, আমি তা ভালোভাবেই জানি। জনাব মামুন কটু হাসি হেসে বললেনঃ

জজ সাহেব, আপনি যা বললেন, আইনের সাথে তার দূরতম সম্পর্কও নেই। আদালত কক্ষে উপস্থিত আইনজীবীরা মুচকি হাসেন। কিন্তু পর মুহূর্তেই তারা লুফিয়ে নেন এ হাসি। মামুন হোযাইবীর মতো বিজ্ঞ আইনবেত্তা কি ভাবে মিঃ দাজবীর মোকাবিলা করেছেন, তারা তা অবলোকন করেন।

অভিযুক্ত ব্যক্তিদেরকে আদালতে হাযির করা হলে তাদের বাহিক আকার আকৃতির প্রতিও লক্ষ্য করা হতো। আদালতে হাযির করার আগে তাদের ঘর থেকে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন কাপড় চোপড় চেয়ে নিয়ে তা পরিধান করিয়ে আনা হতো। তাদেরকে হুকুম দেয়া হতো ভালোভাবে জুতো পালিশ করে নেয়ার জন্যে। কারা প্রকোষ্ঠে তারা যখন পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতার কাজে নিয়োজিত থাকতো, তখন তাদের এ কৃত্রিম পরিচ্ছন্নতার জন্য আমরা বিদ্রূপ করতাম। তাদের প্রতি আমরা ইর্ষান্বিত হতাম এজন্য যে, তারা আদালতে যাওয়ার পথে কায়রোর সড়ক অতিক্রম করবে, সুযোগ পাবে কায়রোর চাক-চিক্য এক নজর দেখার! অভিযুক্তদের যে কি অবস্থা হচ্ছে, তাদের কি বিপদ, হতভাগা কায়রো তার কি খবর রাখে।

এক কৌতুকপ্রদ ঘটনা

একটা কৌতুপ্রদ ঘটনা শুনুন। মনসুর আবুজ জাহের নামে জনৈক ইখ-ওয়ানী অভিযুক্তকে আদালতে হাযির করা হয়। জেনারেল দাজবীর সামনে তিনি কাপড় খুলে নির্যাতনের চিহ্ন দেখান। কিন্তু পাষাণ প্রাণ দাজবী তাঁর কথায় কর্ণপাতও করেননি। তথাকথিত আদালতের কার্যক্রম সমাপ্ত হলে

www.pathagar.com

অভিযুক্ত ব্যক্তিরা সামরিক কারাগার অভিমুখে রওয়ানা হয়। কারা কর্তৃপক্ষ জেল ফটকে তাদেরকে নির্দেশ দেয় কাপড় খুলে হাতে নেয়ার জন্য। নির্দেশ অনুযায়ী সকলে কাপড় খুলে হাতে নেয়! এরপরই শুরু হয় চাবুক বর্ষণ। কারাগারের প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত কুকুররাও তাদের দায়িত্ব পালন করে। এ অবস্থায় তাদেরকে বড় জেলের আঙ্গিনায়। তাদের আর্তনাদ আর হৈ-চৈ শুনে আমরা আমাদের কুঠরীর দরজা দিয়ে উঁকি মেরে দেখি। সেখানে যে দৃশ্য দেখি, তাতে আমাদের প্রাণ শুকিয়ে যায়। একদল সেপাই তাদের উপর ঝাপিয়ে পড়ে লাঠি পেটা করে তাদেরকে। রীতিমতো শরীরের রস বের করে ছাড়ে। পরে জানতে পেরেছি যে, যিনি আদালতে কাপড় খুলে নির্যাতনের চিহ্ন দেখিয়েছিলেন, তাকে পেটানো, হয়েছে সবচেয়ে বেশী। ঘুনির তীব্রতায় তার চোখ ফুলে রীতিমতো নীল বর্ণ ধারণ করে। চোখ ফুলে এত বড় হয়ে যায় যে, কিছুই দেখা যাচ্ছিলোনা। তার মাথায়ও প্রচন্ড আঘাত হানা হয়।

মামলার কার্যক্রম চালানোর জন্য পরদিন অভিযুক্তদেরকে পুনরায় আদালতে হাযির করা হয়। আদালতে উপস্থিত সকলেই দেখতে পেয়েছে যে অভিযুক্তদের অবস্থা আরও খারাব। তাদের চেহারা পরিবর্তিত। কিন্তু জেনারেল দাজবী কাটা ঘায় নুনের ছিটা দিয়ে উপহাসের সুরে জিজ্ঞেস করে মনসুর আবদুজ জাহের কোথায়?

আদালতের কাঠগড়ার অন্যান্যদের সাথে দাঁড়িয়ে থাকা মনসুর সামনে অগ্রসর হয়। তার চোখ ফুলে রীতিমত তালগাছ হয়ে আছে। কিছুই দেখতে পাচ্ছেনা সে। তবুও মনসুর সামনে এগিয়ে গিয়ে জজের জবাবে বলেঃ হাযির জনাব।

ঃ তোমার চোখে কি হয়েছে মনসুর?

কশাই জজের প্রশ্ন শুনে মনসুরতো অবাক। মনসুর অনেক কষ্টে জজের দিকে তাকায়।

তার চোখ থেকে বিদ্রুপ-উপহাসের ঝনক বেরিয়ে আসছে। সংবাদ পত্রের প্রতিনীধিরাও সেখানে উপস্থিত। মনসুর প্রতিনীধিদের সকলেই সেখানে উপস্থিত ছিলো। মনসুর চাপা স্বরে জজকে জবাব দেয়ঃ

ঃ আমার চোখের কিছুই হয়নি জনাব।

জজের মনে আরও শয়তানি চাপে। আবার জিজ্ঞেস করেঃ

www.pathagar.com

ঃ কিছু হয়নি মানে ? আমি দেখতে পাচ্ছি, তোমার চেহারা পরিবর্তিত। চোখ ফুলে আছে। তোমাকে কি কারাগারে পেটানো হয়েছে

মনসুর কাঁপছে। গতকাল আদালতে সত্য ভাষণের জন্য তাকে শাস্তি ভোগ করতে হয়েছে, তা ভুলে যায়নি সে। সে দ্রুত বলে ঃ

ঃ না, না, কেউ আমাকে পেটায়নি। পেটায়নি কেউ।

কিন্তু আপনার চোখ যে নীল বর্ণ ধারন করেছে। চোখ যে বেশ ফুলে গেছে। আমরা এর এক ব্যাখা দেবো ?

ঃ আসলে এর কারণ আমার কাছে কিছুই জানা নেই।

ঃ তোমার চেহারায় কি বিপদ পড়েছিলো, তা কি তোমার জানা নেই ?

মনসুর মুখে কেনা বের করে জবাব দেয় ঃ

ঃ জ্বি-হাঁ, এর কোন কারণ আমার জানা নেই। ভোরে ঘুম থেকে জেগে দেখি, আমার চেহারার এ দশা।

ঃ সিড়ি দিয়ে উঠতে বা নামতে পড়ে যাননিতো ?

ঃ হতে পারে। এমনটিই হয়ে থাকবে হয়তো। এখন আমার কিছুই মনে নেই।

জজের সাথে মনসুর যখন এসব কথা বলছিলেন, তখন বিবেক বিক্রী করা সাংবাদিক আর কাপুরুষ আইনজীবিরা হাসছিলো। তারা তখন আনন্দে দোলা খাচ্ছিলো। যেমন প্রাচীন কালে রোমান সমাজে নির্যাতিত খৃষ্টানদের উপর বাঘ হামলা করতো, আর তাদেরকে বাঘে খেতে দেখে দর্শকরা আনন্দে নেচে উঠতো।

অপর ট্রাইবুনালের প্রধান ছিলেন লেফট্যানেন্ট জেনারেল আলী জামালুদ্দীন মাহমুদ। তিনি ছিলেন অত্যন্ত শরীফ এবং পূত স্বভাবের মানুষ। নাপাক অভিযান পরিচালনার জন্য এমন ভালো লোককে কেন বাছাই করে আনা হয়েছে, আমি তা বুঝতে পারিনে। ইনি ছিলেন বিবেকবান এবং ব্যক্তিত্ব সম্পন্ন মানুষ। তিনি প্রতিজ্ঞা করেছিলেন যে, সত্য মিথ্যা যাচাই করবেন, প্রকাশ করবেন কোনটা হক, আর কোনটা বাতিল। বিবেকের অনুরোধে আর নীতির ভিত্তিতেই তিনি ফয়সালা করবেন। অত্যন্ত প্রশস্ত-খোলা মন আর হাসি মাখা মুখ নিয়ে তিনি অভিযুক্তদেরকে গ্রহণ করেন।

www.pathagar.com

শুনেন তাদের কথা। শুনেন মনোযোগ দিয়ে এক একজন অভিযুক্ত ব্যক্তিকে তিনি জিজ্ঞেস করেন :

তোমাকে কি শাস্তি দেয়া হয়েছে ? ভয়ের কোন কারণ নেই। সত্য সঠিক কথা নির্দ্বিধায় বলতে পার।

মনসুর আব্দুল জাহেরের পরিণতি দেখার পর কোন অভিযুক্ত ব্যক্তিই সত্য কথা বলার সাহস পাচ্ছিলোনা। কিন্তু আলী জালালুদ্দীন মাহমুদ কোন অভিযুক্ত ব্যক্তির চেহারায় কোন প্রকার চিহ্ন দেখতে পেলে তাকে জিজ্ঞেস করতেন, কি ভাবে আঘাত পেয়েছে, কি হয়েছে। বরং তিনি জোর দিয়ে বলতেন, নিঃসন্দেহে এটা পিটুনীর আঘাত। আর অভিযুক্ত ব্যক্তি জোর দিয়ে বলতো, কারাগারে তার সাথে ভালো ব্যবহার করা হয়েছে।

ইখওয়ানের অভিযুক্ত ব্যক্তিদের বক্তব্য শেষ হওয়ার পর আলী জামালুদ্দীন মাহমুদ তাদের সকলকে নির্দোষ খালাস দেয়ার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। অভিযুক্ত ব্যক্তিরা আদালত থেকে ফিরে এসে আমাদেরকে আলী জামালুদ্দীনের কাহিনী শুনাতো। কিন্তু আমরা তাদের কথায় বিশ্বাস করতামনা। বলতাম, আপনারা আলী জামালুদ্দীন সম্পর্কে অতিরঞ্জিত করছেন।

যে দিন আলী জামালুদ্দীন এর ট্রাইবুনালে ইখওয়ানের মামলার রায় দেয়ার কথা, সে দিন আসার আগেই মিশরের তিনটি শীর্ষ স্থানীয় সংবাদ পত্রে আল আহরাম, আল-জমহুরিয়া ও আখবারুল ইয়াওম—জামালুদ্দীন মাহমুদের ইন্তেকালের খবর ছাপা হয়। তাঁর ট্রাইবুনালে পেশাকৃত ইখওয়ানের সকল অভিযুক্তকে তিনি খালাস করে দেবেন—এটাই ছিলো নিশ্চিত। বলা হয়ে থাকে যে, সিভিল ইন্টেলিজেন্সের ডাইরেক্টর জেনারেল ছালাহ নছর খাদ্যের সাথে বিষ প্রয়োগে জামালুদ্দীন মাহমুদকে হত্যা করিয়েছে। এরপর নুতন করে ট্রাইবুনাল গঠন করা হয়। এ নুতন ট্রাইবনালের চেয়ারম্যান করা হয় মেজর জেনারেল হাসান তানবীকে। নুতন চেয়ারম্যান হচ্ছে মিঃ দাজবীর শিষ্য। এমনিভাবে ইখওয়ানের মামলা উভয় ট্রাইবুনালে সমানরূপ ধারণ করে।

www.pathagar.com

কারপ্রকোষ্ঠে আমার সাথী ছিলো এক তরুন ডাক্তার। যেদিন তাকে ট্রাইবুনালে নেয়া হয় তার আগের রাত ইখওয়ান কর্মীদের সাথে দীর্ঘ আলাপ-আলোচনায় কাটায়। পরদিন সকালে ট্রাইবুনালে কি বলবে তা নিয়ে। এ নিয়ে তার সাথে অনেকের দীর্ঘ আলোচনা হয়। পরিবেশ-পরিস্থিতি আর সম্ভাব্য বিবৃতিই ছিলো আলোচনার মূল বিষয় বস্তু। কেউ বলতো, আদালত এটা বলবে, ওটা বলবে না। আবার কেউ বলেন, ওটা বলবে, এটা বলবেনা। মোটকথা, যত মুখ, তত পরামর্শ। আমি চুপ চাপ বসে এসব পরামর্শ শুনছিলাম। অবশেষে তরুন ডাক্তার আমার কাছে এসে জিজ্ঞেস করে: আমি কাল ট্রাইবুনালের সামনে কি বলবো, আপনতো কিছুই বললেন না। আমি বললামঃ কিছুই বলবেনা। সে বললো: এর মানে? আমি বললামঃ তাদের যা ফয়সালা হওয়ার তা, হয়ে গেছে। কলম শুকিয়ে গেছে। কাগজ ভাজ করে যথাস্থানে রাখা হয়েছে। তুমি কাল আদালতে গিয়ে মুখ বন্ধ করে বসে থাকবে। মনমানসকে আর পীড়া দেবেনা। যে নাটক মঞ্চ হবে আদালতে, শুধু তার দর্শক সেজে বসে থাকবে। তরুন চিকিৎসক বললোঃ খোদার কসম, আপনি ঠিকই বলেছেন। এরপর সে সারারাত নিশ্চিন্তে ঘুমায়।

ইখওয়ানের দামালদের ঈর্ষাযোগ্য বীরত্ব

ইখওয়ানের অভিযুক্ত হাফেজ আইউব আদালত কক্ষে প্রবেশ করেই বড় জামা বিছিয়ে দু'রাকাত নফল নামায আদায় করে। দারওয়ানের শত বাধায়ও কোন কর্ণপাত করেননি। দারওয়ান চিৎকার করে সকলকে সতর্ক করে দিয়ে বলে: এটা আদালত কক্ষ, মসজিদ নয়। আদালতের পক্ষ থেকে হাফেজ আইউবকে গতানুগতিক প্রশ্ন করা হয়; আদালতের গঠন পদ্ধতি সম্পর্কে তোমার কোন আপত্তি আছে কি? হাফেজ আইউব গর্জন করে বলে উঠেঃ

আছে, অবশ্যই। আদালতের গঠন প্রক্রিয়া আর মূলনীতি সম্পর্কেই আমার আপত্তি। মানব রচিত আইনে আমার বিচার কথা হবে—এটা আমি মেনে নিতে পারিনা কিছুতেই। শাসন কর্তৃত্ব আর আইন প্রণয়নের অধিকার একমাত্র আল্লাহরই রয়েছে। অন্য কারুর নেই ইজিয়ার। মানুষের

www.pathagar.com

ফয়সালা হতে পারে একমাত্র আল্লাহর আইনের ভিত্তিতে অন্য আইনের ভিত্তিতে এ ফয়সালা হতে পারেনা কিছুতেই।

সরকার সম্পর্কে তাকে প্রশ্ন করা হলে তিনি ধীর শান্তভাবে জবাব দেন ঃ সরকারতো কুফুরী নীতি অবলম্বন করছে।

তৃতীয় ট্রাইবুনাল যাদেরকে পেশ করা হয়, তাদের অধিকাংশও এ ভূমিকা পালন করে। আদালতের গঠন প্রণালী এবং আইনের মর্যাদা সম্পর্কে তাদের প্রত্যেকেই তীব্র আপত্তি তোলে। তারা বলে, আমরা বর্তমান সরকারের বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিরোধ গড়ে তুলতে সম্পূর্ণ প্রস্তুত। এধরণের বিবৃতি দিয়ে আদালত থেকে কারাগারে ফিরে গেলে তাদেরকে সম্মুখীন হতে হতো নিষ্ঠুর-বর্বর নির্যাতনের। কিন্তু এসব নির্যাতন তাদেরকে বিন্দুমাত্রও বিচলিত করতে পারতোনা, পারতোনা সত্য ও ন্যায়ের পথ থেকে এতটুকু বিচ্যুত পদস্খলিত করতে। বরং এসবের ফলে তাদের ঈমানী দৃঢ়তা আরও তীব্র হতো। নির্যাতনকারী জল্লাদরা স্তম্ভিত হয়ে যেতো। তারা পরাভূত হতো আর বিজয়ী হতো ইখওয়ানের দামাল সন্তানরা। তারা দেখেন, আদালতের সামনে যারা ভালোভাবে বলতে পারেনি, তাদের উপরও কম বিপদ নাযিল হয়নি। বিপদ যখন অসবেই, তখন তাগুতের সামনে সত্য কথা না বলে কি লাভ। এটাতো ঈমানেরও দাবী নয়। এসব দেখে তাদের বীরত্ব আর ঈমানের তেজ আরও বৃদ্ধি পায়।

একবার এক তরুন উকীল আমাদেরকে ক্যামিষ্ট বন্ধুর সাফাইতে কঠোর ভাষায় বলেন ঃ

শ্রদ্ধেয় বিচারক মন্ডলী! এর চেহারারর দিকে একবার তাকিয়ে দেখুন, নির্যাতনের ছাপ তার চেহারায় পরিস্ফুট। অথচঃ জন্মের সময় তার চেহারা তো এমন ছিলনা।..... .....

জজ আপত্তি জানিয়ে নিরপেক্ষতার ভান করে বলে ঃ

উকিল সাহেব! আপনি এটা কেন বলছেন। প্রসিকিউটারকে তা বলতে দিন। কিন্তু উকীল কিছুতেই থামেননা। আদালত মুলতবী হলে ক্যামিষ্ট তার পিতাকে কানে কানে জিজ্ঞেস করে, এ উকীলকে কতো কি দিয়েছেন? পিতা জানান, তিন শ মিশরী পাউন্ড। ক্যামিষ্ট হেসে পিতাকে বলে ঃ আপনি প্রসিকিউটরকে বলে দিতেন, তিনি ফি ছাড়াই একথাগুলো বলতেন।

www.pathagar.com

এক অন্ধ ইখওয়ানীর দুঃসাহসিকতা

শেখ আব্দুল হাসীম সা'ফান দৃষ্টি শক্তি থেকে বঞ্চিত ছিলেন বটে, কিন্তু তাই বলে অন্তঃদৃষ্টি শূন্য ছিলেননা। এই অন্ধ ইখওয়ানীর বিরুদ্ধে অভিযোগ ছিলো, তিনি ইখওয়ানের গরীব পরিবারগুলোকে আর্থিক সাহায্য দিতেন। তার নিজের আর্থিক অনটন সত্বেও তিনি ইখওয়ানদের গরীব পরিবারের সন্তানদেরকে কিছুটা আর্থিক সাহায্য সহায়তা করতেন—এটা ঠিক। আদালতও তার ব্যাপারে বেশ নমনীয় ছিলো। আদালত থেকে এ প্রস্তাবও করা হয় যে, তিনি ভুল স্বীকার করে আদালতের কাছে ক্ষমা ভিক্ষাকরলে আদালত তাঁকে ক্ষমা করে দেবে। কিন্তু শেখ আব্দুল হালীম তার ভূমিকার জন্য গর্ব করে মোমেন সুলভ দৃঢ়তার সাথে জবাব দেন :

'আমি অবিকল দ্বীনের কাজ মনে করে যা করেছি' তার জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করবো—আদালত কি করে আমার কাছে এ দাবী করতে পারবে? যাকাত ইসলামের অন্যতম ভিত্তি। এ যাকাত আদায়ের জন্য কি করে ক্ষমা প্রার্থনা করা যেতে পারে। এটা করলে আমিতো ইসলামের গন্ডী থেকে বেরিয়ে যাবো। আমি এ কাজ করেছি, আগামীতেও করবো।"

এ বক্তব্যের পর শেখ আব্দুল হালীমকে তিন বছর সশ্রম কারাদন্ডে দন্ডিত করা হয়। তিনি সানন্দে এ রায় মেনে নেন।

আদালত নিছক প্রহসন

আকার-আঙ্গিক আর ভেতর-বাহির—সব দিকের বিচারেই আদালত ছিলো নিছক প্রহসন। যালেম সরকার জাতির বিরুদ্ধে যে সব অপরাধমূলক কার্য সাধন করেছে। তাকে প্রলেপ দেয়ার জন্যেই আদালতের এ প্রহসনের ব্যবস্থা করা হয়েছে। আর এসবের দ্বারা বাইরের জগৎকে ধারণা দেয়া হচ্ছে যে, মিশর সরকার সুবিচার আর ন্যায়নীতির অনুসারী। অথচঃ বাস্তব সত্য হচ্ছে এই যে, আদালত কক্ষে যে ফয়সালা শোনানো হয়, মিলিটারী ইন্টেলিজেন্সের দফতরে কর্নেল শামস্ বদরান এবং মেজর জেনারেল সা'আদ গজলুল আব্দুল করীমের নেতৃত্বে মূলতঃ পূর্বাহ্নেই তা প্রস্তুত করে রাখা হয়। কোন ব্যাপারেই কোন বন্দীর সামান্যতম নিরাপত্তাই ছিলনা। কোন

www.pathagar.com

বন্দীর সাথে তার পরিবারের লোকজনকে দেখা সাক্ষাৎ পর্যন্ত করতে দেয়া হয়নি। তাদের জন্য ঘর থেকে যেসব খাবার পাঠানো হতো, তার সামান্যতম অংশও তাদের কাছে পৌছানো হতোনা। কারাগারের সেপাইরা এসব খাবার গ্রহণ করতো এবং বলতো যে, তা সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির কাছে পৌছানো হবে। ব্যাস এ পর্যন্তই শেষ। খাবারতো দূরের কথা, খাবার আসার খবরও তাদের কাছে পৌছতোনা।

এ সব আদালতের সম্মুখে আইন-বিধান আর নিয়ম নীতি বলতে কিছুই ছিলনা। নিছক কতক উল্টা-সিধা কথাকে আইনের রূপ দেয়ার চেষ্টা চালানো হয়। মজার ব্যাপার এই যে, অভিযুক্তকে ১৩ বছর সশ্রম কাপাদন্ডে দন্ডিত করা হয় আর প্রচার করা হয় যে, অনেক বিচার-বিশ্লেষণ আর সুবিচার করেই তাকে এ শাস্তি দেয়া হয়েছে। অথচঃ এটা হচ্ছে বস্তুবের সম্পূর্ণ পরিপন্থি। তখন মিশরে জাস্টিস মিনিষ্টারের দায়িত্বে ছিলেন এহানুদ্দীন হাসুনা। তাঁর উচিৎ ছিলো এহেন নাটক-প্রহসন থেকে নিজেকে মুক্ত রাখা। জামাল নাসেরের যুগ অতিক্রান্ত হওয়ার পর তিনি যা বলেছেন, তার সময়ে কেন তা বলেননি? [মিশরে পুরাতন বিপ্লবী কাউন্সিলের কতিপয় সদস্য এবং বিগত শাসনামলের কয়েকজন মন্ত্রী এহানুদ্দীন হাসুনাও সদস্যের মধ্যে ছিলেন– তারা ১৯৭২ সালের ৪ঠা এপ্রিল প্রেসিডেন্ট আনোয়ার সাহাদাতের নিকট একটা স্মারক লিপি পেশ করেন। জামাল নাসেরের শাসনামলে জাতির প্রতি এক যুলুম অবিচার চালানো হয়েছে, কিভাবে নাগারিক অধিকার পদদলিত করা হয়েছে আর কিভাবে আইন-আদালত আর বিচারের নামে প্রহসণ করা হয়েছে, তার বিস্তারিত বিবরণ তুলে ধরা হয় এ স্মারক লিপিতে। তাঁরা স্মারক লিপিতে এটাও উল্লেখ করেছেন যে, ১৯৬৮ সালে ইসরাঈলের হাতে মিশরকে যে শোচনীয় পরাজয় বরন করতে হয়েছে, তার কারণও ছিলো জাতির প্রতি এ যুলুম-অবিচার। আইন-বিচার এবং গণতান্ত্রিক ঐতিহ্য পূর্নবহালের জন্য তাঁরা আনোয়ার সাহাদাতের নিকট দাবী জানান]। তিনি কি এটা জানতেননা যে, তাঁর স্বাক্ষরেই সব ফয়সালা জারী হচ্ছে? সত্য কথা বললে আমাদেরকে বলতে হয় যে, এহানুদ্দীন হাসুনা জাস্টিস মিনি-

www.pathagar.com

ষ্টার নয়, আসলে তিনি হচ্ছেন ইনজাষ্টিস মিনিষ্টার। জাষ্টিস-সুবিচারের বাতাস পর্যন্ত তার গায়ে লাগেনি।

আদালতের প্রহসন শেষ। সকলেই অধীর আগ্রহে সিদ্ধান্তের প্রতীক্ষা করছে। একদিন হাফওয়াত রাবী কারাগারে প্রবেশ করে। প্রবেশ করেই সে হুইসেল বাজায়। চারিদিকে নীরবতা দেখা যায়। ফিরিস্তি পড়ে শুনানো হয়। যেসব বন্দীকে এখনও আদালতে হাযির করা হয়নি, তাদেরকে অন্যত্র স্থানান্তরের সিদ্ধান্ত করা হয়। আর আমাদেরকে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়; ডাক্তারী রিপোর্টে স্বাক্ষর করার জন্য। সরকারের পক্ষ থেকে বলা হয় যে, যারা অসুস্থ ও আহত, পূর্ণ সুস্থ হওয়া পর্যন্ত তাদেরকে কারাগারে রাখা হবে! এ ঘোষণা শুনার পর প্রত্যেকেই ডাক্তারের সামনে নিজেকে সুস্থ-সমর্থ বলে দাবী করে। উল্লেখ্য যে, কারাগারের ডাক্তাররা ছিলো অতিভীরু কাপুরুষ। বন্দীদের দেহে যুলুম নির্যাতনের স্পষ্ট চিহ্ন দেখেও তার মনে কোন, দাগ কাটেনি, নাড়া দেয়নি তার বিবেককে। উত্থাপন করেনি আপত্তি। রিপোর্টেও উল্লেখ করেনি কিছু। আমার মনে আছে, তদন্তকালে এক তরুনকে পরীক্ষা করার জন্য এ ডাক্তারকে আমাদেব প্রকোষ্টে আনা হয়। এ যুবককে এমন নির্মমভাবে চাবুক পেটা করা হয় যে, সে সঙ্গাহীন হয়ে পড়ে। বেশ দীর্ঘ সময় পরও তার সঙ্গা ফিরে আসেনি। ডাক্তার তাকে পরীক্ষা করে তদন্ত অফিসারের দিকে তাকিয়ে বলেঃ

"তার হৃদযন্ত্র ঠিকই আছে। আরও আঘাত সহা করার ক্ষলতা আছে তখনও।' অবশেষে মিলিটারী ইন্টেলিজেন্স কারাগার থেকে সিভিল ইন্টেলিজেন্স কারাগারে প্রেরণ করা হয়। প্রথমে কেল্লার কারাগারে, সেখান থেকে আবু জে'বল কারাগারে। আবু জে'বল কারাগারে যা কিছু ঘটেছে, এখানে তার উল্লেখ নিষপ্রয়োজন। {সেখানে অ-ইখওয়ানী বন্দীদেরকে আত্মীয়-স্বজনের সাথে সাক্ষাতের অনুমতী দেয়া হয়। কিন্তু ইখওয়ান বন্দীদেরকে এ অনুমতি দেয়া হয়না। এ অন্যায়ও বৈসম্য মূলক সিদ্ধান্তের প্রতি ইখওয়ানের বন্দীরা কারাগারে অনশন ধর্মঘট শুরু করে। ফলে পুলিশ এলোপাথাড়ী গুলী বর্ষণ করলে ঘটনাস্থলেই ৫০জন ইখওয়ান বন্দী সাহাদাত বরন করেন—(খলীল) সেখান থেকে নিয়ে যাওয়া হয় তরবার কারাগারে। অবশ্য

www.pathagar.com

সামরিক কারাগার থেকে স্থানান্তরের পর যুলম নির্যাতনের অবসান ঘটেছে। পরবর্তীতে আর চাবুক প্রয়োগ করা হয়নি, আগুনেও দাগানো হয়নি। কিন্তু এখানে শুরু হয় ভিন্ন ধরনের নির্যাতন। তাই আমাদের মনে পড়ে সামরিক কারাগারের কথা। মনে আকাংখা জাগে আবার যদি আমরা সেখানে ফিরে যেতে পারতাম। কারণ, তরুরার কারাগারে আমরা যে নির্যাতন প্রত্যক্ষ করেছি, তার সামনে চাবুকের ঘা আর আগুনে দাগানোর শাস্তিও ছিলো নেহায়েত তুচ্ছ ব্যাপার। এ এক দীর্ঘ ইতিহাস। ভবিষ্যতে কোন গ্রন্থে এ ইতিহাস তুলে ধরবো ইনশাআল্লাহ। (মিশরে ইখওয়ান কর্মীদের উপর সামরিক জান্তার বর্বর-পৈশাচিক নির্যাতনের লোমহর্ষক কাহিনী এখানেই আপাততঃ শেষ। লেখকের অভিলাস অনুযায়ী এ কাহিনীর পরবর্তী অধ্যায় হস্তগত হলে যথা সময় পাঠক মহলের সামনে উপস্থাপনের চেষ্টা করা হবে, ইনশা আল্লাহ—অনুবাদক)। ১০-১২-৮৬

www.pathagar.com

সমাপ্ত